সাদাত হোসাইন



তোমার নামে সন্ধ্যা নামে

ভূমিকা

এই উপন্যাসটি লেখার পেছনের ঘটনা মজার। পাক্ষিক *অন্যদিন* পত্রিকার ঈদসংখ্যার জন্য গত কবছর ধরে প্রতিবারই একটি উপন্যাস লিখি আমি। সেই উপন্যাসই পরবর্তীসময়ে *অন্যপ্রকাশ* থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এবারও লিখছিলাম। কিন্তু উপন্যাসটি শেষ করা হয় নি। শেষ না করার কারণ মহামারি করোনা। করোনার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এবার *অন্যদিন* ঈদসংখ্যা বের হলো না। কিন্তু এই খবর যতদিনে জেনেছি, ততদিনে উপন্যাসের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লেখা শেষ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় লিখতে হচ্ছিল একটানা। দমবন্ধ পরিস্থিতি। ঠিক সেই মুহূর্তে পত্রিকা বের হচ্ছে না শুনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ল্যাপটপ বন্ধ করে মনের আনন্দে অবসর কাটাতে লাগালাম। তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেল। মাথা থেকে হারিয়ে গেল এই উপন্যাসও। কিন্তু হঠাৎই একদিন অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম বললেন, 'উপন্যাসের কী খবর ?' আমি চমকে উঠে বললাম, 'কোন উপন্যাস ?' তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি ল্যাপটপে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, সেই ফাইল আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কী নামে সেভ করেছিলাম তা-ও মনে নেই। বহু তত্ত্ব-তালাশের পর অবশ্য সেই ফাইল খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু ততদিনে উপন্যাসের অসমাপ্ত অংশের কী গল্প আমি ভেবে রেখেছিলাম, চরিত্রগুলোর পরিণতি কী হবে, সমাপ্তি কী, এসবই আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি! ফলে লেখাটা আবারও পড়তে হলো। একবার, দুবার, বহুবার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বহুবার পড়তে গিয়েই নতুন গল্প মাথায় চলে এল। তবে তা আগের লেখা বাদ দিয়ে নয়। বরং সেই আগের লেখার সঙ্গেই যুক্ত হলো নতুন ঘটনাপ্রবাহ, নতুন সূচনা-সমাপ্তি, সঙ্গে দারুণ কিছু চরিত্রও। কিন্তু এতে কি গল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে ? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক দিতে পারবেন না। কারণ, তারা সেই প্রথম অংশ পড়ার সুযোগ পান নি। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, 'তোমার নামে সন্ধ্যা নামে'র শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

সাদাত হোসাইন
১৭.১১.২০২০
শ্যামলী

কিছুটা মেঘের মতো ছায়া যদি নামে
কিছুটা বিষাদ আসে সন্ধ্যার খামে
সকালের মিহি রোদ রাত হয়ে যায়
জেনে নিও খুঁজে আর পাবে না আমায়।

—সাদাত হোসাইন



হাইওয়ের ওপর দীর্ঘ নির্জন সেতু। সেতুর নিচে কুচকুচে কালো জল। অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টগুলো যতটুকু আলো ছড়াচ্ছে তা অপর্যাপ্ত। সেই অপর্যাপ্ত আলোয় মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছিল মেয়েটা। তার পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি। মাথায় স্কার্ফ। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। সে ত্রস্ত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল। ফুরফুরে হিমেল হাওয়ায় কিসের একটা উৎকট গন্ধ টের পাচ্ছিল যেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ শিসের শব্দটা কানে বাজল তার। মেয়েটা থমকে দাঁড়াল। সেতুর রেলিংয়ের ওপর অন্ধকারে তিনটি ছেলে বসা। তাদের কারও মুখই স্পষ্ট নয়। তবে অন্ধকারে জোনাকপোকার মতো সিগারেটের আলো জ্বলছে। নারীসুলভ সংবেদন থেকেই মেয়েটা হঠাৎ টের পেল, সামনে বিপদ!

সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু লাভ হলো না। সামনের অন্ধকার ফুঁড়ে আরও দুজন বেরিয়ে এল। মেয়েটা হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। কিন্তু শাড়ির আঁচলে হ্যাঁচকা টান পড়তেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। কানের পাশ দিয়ে গাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল উষ্ণ ঘামের সরু প্রস্রবণ। চিবুকের কাছটা তিরতির করে কাঁপছে। পেছনে তাকাতেই আতঙ্কে হিম হয়ে এল শরীর। কতকগুলো কুতকুতে কালো চোখ এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাদের একজনের হাতে তার শাড়ির আঁচল। আঁচলটা ক্রমশই নেমে যাচ্ছে। লোমশ হাতের ছেলেটা আরও তৎপর হয়ে উঠেছে। কঠিন ও দ্রুত। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে আশপাশে তাকাল। কেউ নেই। কেবল রাতের অন্ধকার চিরে সাঁইসাঁই করে চলে যাচ্ছে গাড়ি। তারা কি কেউ থামবে ? সেই সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। শাড়ির আঁচলটা আরও দ্রুত নেমে যাচ্ছে। প্রায় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ঊর্ধ্বাংশ। লোমশ গা-ঘিনঘিনে কুৎসিত হাতটা হঠাৎ খামচে ধরল তার উন্মুক্ত কাঁধ। মেয়েটা তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল...

'কাট!' মেয়েটার চিৎকার ঢেকে গেল আরও একটি চিৎকারে। তরুণ নির্মাতা রায়হান বসে আছে ছোট্ট মনিটরের সামনে। শট শেষ হতে না হতেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে বলল, 'দারুণ হয়েছে নদী। কিন্তু আরেকবার কি দিতে চাও ?'

নদী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'ভালো হয় নি ?'

'হয়েছে। তবে চোখের এক্সপ্রেশনে ভয়টা যত তীব্রভাবে ফুটে ওঠা উচিত ছিল, অতটা উঠেছে বলে মনে হয় নি।' বলল রায়হান।

'একটু দেখি ?' হাতের উল্টো পিঠে গালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল নদী। মনিটরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খানিক আগের শটটা দেখল সে। তারপর আনমনা ভঙ্গিতে বলল, 'ভয়টা

আসলেই আমার চোখেমুখে পুরোপুরি ফুটে ওঠে নি। অথচ ওটাই এখানে সবচেয়ে বেশি জরুরি। কী করি বলুন তো ? এত চেষ্টা করেও কোনোভাবেই হচ্ছে না।'

'কেন হচ্ছে না ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আরেকবার নেই ? লাস্ট ওয়ান ?' বলল রায়হান।

কিছু একটা ভাবল নদী। তারপর বলল, 'এই এক শটই তো কতবার দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তা ছাড়া আমাকে আসলে বাড়ি ফিরতে হবে। বাবার শরীরটা ভালো নেই।'

রায়হান কথা বলল না। সে শুটিং ইউনিটকে জিনিসত্র গোছানোর নির্দেশ দিল। রাত অবশ্য বেশি হয় নি। চাইলে আরও একবার শটটা নেওয়া যেত। কিন্তু বুড়িগঙ্গার মতো সেতুতে এই সময়ে এত দীর্ঘ শুটিং করতে পেরেও সে সন্তুষ্ট। নদী তাড়াহুড়ো করছে। রায়হান বলল, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'গুরুত্বপূর্ণ ?'

'হুম।'

'কে ?'

'তার অনেকগুলো পরিচয়। তবে এখানে তার পরিচয় তিনি এই নাটকের প্রযোজক।'

নদী ভ্রু কোঁচকাল, 'কই ? এর আগে তো কখনো তাকে দেখি নি! এতদিন ধরে শুটিং চলছে কিন্তু একদিনও তো তিনি সেটে আসেন নি!'

'উনি কখনোই শুটিং সেটে আসেন না।'

'তাহলে আজ হঠাৎ ?'

'আজও আসেন নি।'

'তাহলে ? দেখা হবে কী করে ? আমাকে যেতে হবে ?'

রায়হান এই প্রশ্নের জবাব দিল না। সে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'তুমি সেদিন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, মনে আছে ?'

'কী ?'

'গত বেশ কিছু নাটকই কেন আমি মেয়েদের সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট, রেপ এইসব নিয়ে করছি ?'

'ও, হ্যাঁ।'

'আসলে বিষয়টা ওনার ঠিক করে দেওয়া। উনি একদম স্পেসিফিক করে দিয়েছেন নাটকের সাবজেক্ট।'

'এই সবগুলো নাটকই ওনার টাকায় হচ্ছে ?'

'হুম।'

'আচ্ছা। কিন্তু উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন ?'

'তোমার আগের নাটকটা নিয়ে ওনার কিছু অবজারভেশন ছিল। উনি সেটা সরাসরি তোমাকে বলতে চান।'

'ওহ!' যেন কঠিন কোনো মন্তব্য করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল নদী। তারপর বলল, 'কী করেন উনি ?'

রায়হান হাসলেন, 'সচরাচর প্রযোজকেরা যা করেন।'

'বিজনেস ?'

'হুম।'

'কিসের বিজনেস ?'

'মাছের।'

'মাছের ?' ভ্রু কুঁচকে তাকাল নদী।

রায়হান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, 'হুম। সদরঘাটে তার বিশাল বড় মাছের আড়ত আছে।'

নদী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'সদরঘাটের মাছের আড়তদাররাও আজকাল মিডিয়াতে টাকা ইনভেস্ট করছে ?'

রায়হান জবাব দিল না। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল বাতাসে। নদীর ফুরফুরে হাওয়ায় খানিক শীত শীত লাগছে। নদী শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিল শরীরে। তারপর বলল, 'এমন একজন মানুষের নাটকের বিষয় আবার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, রেপ, এক্সপ্লয়টেশন, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, এইসব ? ইন্টারেস্টিং কিন্তু!'

'হুম। ইন্টারেস্টিং।'

নদী হাতের স্ক্রিপ্টটাতে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, 'এই সব গল্পই ওনার ঠিক করে দেওয়া ?'

'অনেকটা। মূলত গল্পগুলো উনি আমাকে মুখে মুখে বলেন। আমি সেই মতো স্ক্রিপ্ট তৈরি করি।'

নদী কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ইন্টারেস্টিং মানুষ মনে হচ্ছে।'

'ভয়ংকরও।'যোগ করল রায়হান।

'ভয়ংকর ?' নদী অবাক হলো।

'হুম।'

'কেন ?'

'সামনে গেলেই বুঝতে পারবে।'

সেদিন অবশ্য লোকটার সঙ্গে আর দেখা করা হলো না নদীর। তাকে বাসায় ফিরতে হবে। সে বাসায় ফিরল রাত বারোটায়। তার মা শায়লা বেগম জেগেই ছিলেন। তিনি টেবিলে ভাত দিতে দিতে বললেন, 'তোর বাবা এখনো ঘুমায় নি।'

'ঘুমের ওষুধ দাও নি ?'

'দিয়েছি।'

নদী আর ভাত খেতে বসল না। সে ভেজা হাত মুছতে মুছতে বাবার ঘরে গেল। তার বাবা আদিবুর রহমানের বয়স পঞ্চান্ন। তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু তার সেই আঘাত আর সারল না। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন তিনি। মাস ছয়েকের চিকিৎসায়ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। বরং শরীরের বড় একটা অংশ অসাড় হয়ে গেল। ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল বাক্‌শক্তিও। ব্যাংকে জমানো অর্থকড়ি যা ছিল, তাও বানের জলের মতো বেরিয়ে গেল চিকিৎসায়। আদিবুর রহমান হাসপাতাল থেকে ফিরেছেনও প্রায় মাস পাঁচেক হবে। নদী তার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছে পরিবারটাকে আগলে রাখতে। মাঝে মাঝে তার খুব ক্লান্তও লাগে। কিন্তু সে জানে, তার ক্লান্ত হলে চলবে না। সামনে দীর্ঘ কঠিন পথ। সেই পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে। মাত্র বছরখানেক সময়েই যে কারও জীবন এমন কঠিন হয়ে যেতে পারে, নদী তা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি।

মেয়ের অভিনয়ের বিষয়টা অবশ্য একদমই পছন্দ করতেন না আদিবুর রহমান। কিন্তু সেই স্কুল-কলেজ থেকেই অভিনয়ের প্রতি তুমুল আগ্রহ নদীর। সে দেখতে শুনতেও ভালো। তার ওপর কলেজের শেষের দিকে এসে থিয়েটারের সঙ্গেও একটু-আধটু যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই যুক্ততাই তাকে টিভিতেও সুযোগ করে দিল। তবে এই জায়গাটা বড় অমসৃণ, কঠিন। এখানে কখনো কখনো অভিনয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অন্যান্য কৌশল। সমস্যা হচ্ছে নদী তাতে দক্ষ নয়। ফলে কিছুতেই বড় কোনো কাজ পাচ্ছিল না সে। তার ওপর বাবার একটা প্রচ্ছন্ন আপত্তি তো ছিলই। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল।

নির্মাতা হিসেবে বয়সে তরুণ হলেও মিডিয়াপাড়ায় বেশ নামডাক আছে রায়হানের। পরপর অনেকগুলো নাটকে সে নদীকে কাস্ট করে ফেলল। আর সেটাও ঠিক আদিবুর রহমানের দুর্ঘটনার পরপরই। ওই ভয়ংকর সময়ে স্রেফ আর্থিক সংস্থানের কথা ভাবলেও এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। নদী তখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারের মাঝামাঝি। পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। কিন্তু তারপরও কোনোভাবেই কাজগুলো ছাড়তে চায় নি সে। সেই শুরু। তারপর একটানা ব্যস্ততা। আরও নানান কাজের অফার। নদী সেসবও যতটা সম্ভব বেছে বেছে করতে লাগল। কে জানে, বাবাও হয়তো এখন মনে মনে কৃতজ্ঞই বোধ করেন। না হলে এই ভয়াবহ বিপদে কার কাছে যেত তারা ?

নদী আলো জ্বালাল। আদিবুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। নদী বলল, 'তুমি ঘুমাও নি কেন বাবা ?'

আদিবুর রহমান অনেক কষ্টে কোনোমতে বললেন, 'ঘুম আসে না, মা।'

নদী বাবার পাশে বসল। তারপর আলতো হাতে বাবার অসাড় হাতখানা কোলে তুলে নিল, 'এমন করলে হবে বাবা ? তোমার সুস্থ হয়ে উঠতে হবে না ?'

আদিবুর রহমানের ঠোঁট জোড়া সামান্য নড়ল। তবে তেমন কিছুই বললেন না তিনি। নদী বলল, 'মাথায় ব্যথা হচ্ছে বাবা ? ব্যথার ওষুধ খাবে ?'

আদিবুর রহমান জবাব দিলেন না। নদী প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা। তুমি দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আদিবুর রহমান জানেন, কিছুই ঠিক হবে না। জীবনের নিজস্ব কিছু হিসেবনিকেশ আছে। সেই হিসেবনিকেশ মানুষ জানে না। আর জানে না বলেই শত সতর্কতায়ও হাতের তালুর মতো চেনা, মসৃণ পথেও তার পা হড়কায়। আবার ঘোর অন্ধকারের দুর্গম অচেনা পথও সে পাড়ি দেয় নিজের অজান্তেই।

নদী বাবার হাত ধরে বসে রইল। তাকে ডাকতে এল তার ছোট বোন নীতু। নীতু নদীর চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। সে এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। তবে তার চেহারা থেকে কিশোরীসুলভ ভাবটা এখনো যায় নি। নীতু বলল, 'মা খেতে ডাকছে আপু।'

নীতুর গলা ভারী। চোখ ফ্যাকাশে। তাকে দেখতে কেমন অন্যরকম লাগছে। কিন্তু সেই অন্যরকমটা কী, নদী তা বুঝল না। সে বলল, 'তোর আবার কী হয়েছে ?'

'কী হবে ?'

'সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'কিছু হয় নি।'

নদী হাসল, 'কিছু না হলে চোখ মুখ অমন কেন ? মা আবার বকেছে ?'

নীতু কথা বলল না। চুপচাপ দরজার চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ ফোলা। সে যে কান্নাকাটি করেছে এটা স্পষ্ট। নদী মৃদু গলায় বলল, 'তুই যা। আমি আসছি।'

নদী অবশ্য গেল না। সে আরও কিছুক্ষণ বাবার পাশে বসে রইল। এভাবে বসে থাকতে তার ভালো লাগে। নিজেকে বড় বড় মনে হয়। এই যে দুম করে এত এত দায়িত্ব তার কাঁধে চেপে গেল, এতে তার কষ্ট হয় ঠিক। কিন্তু কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ভালোলাগাও আছে। মনে হয়, এই সংসারটা প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত এক জাহাজ। আর সেই জাহাজের নাবিক সে। সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

নদীর স্পষ্ট মনে আছে, তার একবার টাইফয়েড হলো। সঙ্গে ভয়াবহ যন্ত্রণা। সারা রাত ঘুমাতে পারত না সে। ছটফট করত। কিন্তু কেউ যদি চুলে বিলি কেটে দিত, তাহলে খানিক ভালো লাগত। নীতু তখন ছোট। মাকে তাই সারাক্ষণ নীতুকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবা রোজ অফিস থেকে ফিরে রাতভর তার পাশে বসে থাকতেন। মাথায় বিলি

কেটে দিতেন। কখনো কখনো ক্লান্তিতে একটু ঢলে পড়লেই নদী অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করে উঠত। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বলতেন, 'এই যে মা, আমি আছি তো।'

ওই শব্দটা নদীর কানে এখনো বাজে। কী যে শান্তি আর স্বস্তি ওই শব্দটুকুতে মিশে ছিল, নদী বোঝাতে পারবে না। আচ্ছা, এই যে সে এখন বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, বাবারও কি এখন অমন লাগছে ? নদী জানে না। তবে সে এটুকু জানে, এভাবে বাবার পাশে বসে থাকতে তার অসম্ভব ভালো লাগছে।

ভাত খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছিল নদী। শায়লা বেগম বললেন, 'তোর ঘরের দরজা খোলা রাখিস।'

'কেন ?'

'আজ রাতে আমি তোর সঙ্গে ঘুমাব।'

'আমার সঙ্গে ঘুমাবে কেন ?' নদী অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল। 'বাবা একা থাকবে ?'

শায়লা জবাব দিলেন না। নদীর আর এত রাতে এসব ভালো লাগছে না। সকালে তার শুটিং আছে। সে বুঝতে পারছে বাসায় কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। যদিও নীতুকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি। তবে এখন মনে হচ্ছে গুরুতর কিছুই হয়েছে। সে চুপচাপ রুমে চলে এল। মা এলেন আরও কিছুক্ষণ পর। তিনি গম্ভীর মুখে মশারি টানালেন। তারপর বিছানার চারধারে মশারি গুঁজে দিতে দিতে আপন মনে গজরাতে লাগলেন, 'আমার কপালে আল্লাহ এই সর্বনাশ লিখে রাখছিল ? এই কপাল নিয়া আমি জন্মাইছিলাম ? এই জিনিস আমি পেটে ধরছিলাম ? আল্লাহ, ও আল্লাহ, আল্লাহ গো...।'

'কী হয়েছে ?' নদী বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

শায়লা জবাব দিলেন না। তবে খানিক থেমে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তোর কাল শুটিং আছে ?'

'আছে।'

'শুটিং ক্যানসেল করতে পারবি না ?'

'এখন ? এখন শুটিং ক্যানসেল করব ? মানে কী মা ? চাইলেই যখন তখন শুটিং ক্যানসেল করা যায় ?'

'যখন তখন তো করতে বলছি না। বিপদে পড়ে বলছি।'

'কিসের বিপদ ?'

'সর্বনাশা বিপদ।' শায়লা বেগমের থমথমে গলায় কান্নার আভাস।

নদী এবার ক্ষীপ্ত হলো, 'কী হয়েছে স্পষ্ট করে বলবে প্লিজ ? তোমার এই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার একদম পছন্দ না মা। আর এমনিতেই আমরা মহাবিপদে আছি, নতুন করে আর কী হবে ?'

শায়লা বেগম হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন, 'এইটা তারচেয়েও বড় বিপদ।'

'মা। তুমি কি আল্লাহরস্তে বলবে কী হয়েছে ?'

শায়লা বেগম ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাগে নদীর গা জ্বলে যাচ্ছে। তারপরও যতটা সম্ভব শান্ত ভঙ্গিতে সে মায়ের গায়ে হাত রাখল। তারপর নরম গলায় বলল, 'কী হয়েছে মা ?'

'নীতুর পরপর দুই মাস ডেট মিস হয়েছে।'

'ডেট মিস হয়েছে মানে ? কিসের ডেট ?' বলেই থমকাল নদী। যেন বুঝতে পেরেছে সে। তারপর বলল, 'মানে কী ? মানে, কী বলতে চাইছ তুমি ?' এবার চিন্তিত, সতর্ক নদী।

'হুম। আর বিষয়টা ও আমার কাছে লুকাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কোনো একটা ঝামেলা। ও একটা সর্বনাশ ঘটিয়েছে।'

'মা!' আঁতকে ওঠা গলায় বলল নদী। 'কী বলছ তুমি ? কী সর্বনাশ ঘটাবে ও ? ও এইটুকু বাচ্চা একটা মেয়ে।'

'ওর দুই মাস ধরে পিরিয়ড মিস হচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিস ? খেয়াল করেছিস কিছু ? ও কোচিংয়েও যায় না। সারা দিন রুমে বসে থাকে। সেদিন দেখি একা একা কাঁদছে।'

নদীর মনে হলো তার পৃথিবীটা ঘুরছে। অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছে মাথায়। কিছু বলতে গিয়েও কথা খুঁজে পেল না সে। শায়লা বেগম একঘেয়ে গলায় গুনগুন করে কাঁদছেন। কিন্তু সেই কান্নার শব্দ নদী শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। সে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। সেখানে অনেকগুলো পোকা উড়ছে। পাশেই ওঁত পেতে বসে আছে একটা টিকটিকি। সে যে-কোনো মুহূর্তে পোকাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পোকাগুলো এখনো জানে না, কী ভয়ংকর বিপদ তাদের সামনে। নদী সেদিকে তাকিয়ে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

নীতু কোনো কথারই জবাব দিচ্ছে না। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে আছে। নদীর ইচ্ছে হচ্ছে কষিয়ে তার গালে একটা চড় বসাতে। কিন্তু অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংবরণ করল। এত অসহায় আর কখনো লাগে নি তার। বাবার এমন ভয়ংকর দুর্ঘটনার পরেও না। কী করবে এখন সে ? শেষরাতের দিকে অবশ্য নীতু কথা বলল। ঘুমে তখন নদীর চোখ প্রায় বুজে আসছিল। এই সময়ে নীতুর চাপা কান্নার শব্দ টের পেল। একটা ছোট্ট শিশুর মতো নদীর বুকের কাছে ঢুকে যেতে চাইছে নীতু। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। নদী হাত বাড়িয়ে নীতুকে কাছে টানল। তারপর বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল। নীতু এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। যেন এতদিন একা একা বুকে চেপে রাখা সব দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ক্লেদ, ভয় সব সে চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছে। নীতু জড়ানো গলায় বলল, 'আমায় তুমি মেরে ফেলো আপু।'

নদী কথা বলল না। তবে নীতুর মাথায় রাখা তার হাতটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। বয়সে ঠিক পাঁচ বছরের ছোট এই বোনটাকে কী স্নেহ আর ভালোবাসায়ই না সে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে! এই সেদিনও তাকে স্কুলে যাওয়ার আগে গোসল করিয়ে দিতে হতো। জামা-জুতো পরিয়ে মাথা আঁচড়ে দিতে হতো। অথচ সেই মেয়েই কিনা...!

নদী আর ভাবতে পারে না। তার মাথা কাজ করে না। সবকিছু এলোমেলো, অসহ্য লাগে। নীতু নাকের জল চোখের জল এক করে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আমি বিষ কিনে এনেছি আপু। তুমি বললে এখনই খেয়ে ফেলব। এখনই...।'

নদী কথা বলল না। তবে উঠে গিয়ে আলো জ্বালাল। নীতুর রোগা শরীরটা অসহায় ভঙ্গিতে বিছানায় পড়ে আছে। মাত্র এ কদিনেই যে সে এতটা বদলে গেছে, এর আগে তা খেয়াল করে নি নদী। করার কথাও না। জীবনের ভয়ংকর এক অধ্যায় পার করছে সে। সেই জীবনে যে আরও ভয়ংকর কিছু অপেক্ষায় থাকতে পারে, তা তার দূরতম কল্পনায়ও ছিল না। নদী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে খাটের পাশে বসল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ছেলেটা কে ?'

নীতু কথা বলল না। তবে উঠে বসল। তার চোখ টকটকে লাল। মুখ রক্তশূন্য। ঠোঁট ফ্যাকাশে। অবিন্যস্ত চুলগুলো মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে। নদী নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে নীতুর দিকে। নীতু অবশ্য বেশিক্ষণ চোখে চোখ রাখতে পারল না। সরিয়ে নিল। নদী বলল, 'কথা বলছিস না কেন ?'

নীতু আবার কাঁদতে শুরু করল। তবে এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না নদী। সপাটে চড় বসাল নীতুর গালে। নীতু বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেও আবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল। তারপর দুহাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে তাকাল। নদী বলল, 'বল। ছেলেটা কে ?'

'অন্তু।'

'কোন অন্তু ?'

নীতু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। তার গাল বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে। সে সেই অশ্রুর ফোঁটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ওকে চেনো আপু। আমার ক্লাসমেট।'

নদীর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না অন্তুর সঙ্গে নীতুর এমন কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তারা দুজন খুবই ভালো বন্ধু। তুই-তোকারি সম্পর্ক। অন্তুর বাবা-মা গ্রামে থাকেন বলে সে প্রায়ই বন্ধুদের বাড়িতে আসে। এ বাসাতেও তার হরদম আসা-যাওয়া। কিন্তু নীতু আর অন্তুর সম্পর্ক দেখে ঘুণাক্ষরেও এমন কিছুর কথা মাথায় আসে নি নদীর। সে বলল, 'ঘটনা খুলে বল।'

নীতু ঘটনা খুলে বলল। তার সঙ্গে অন্তুর সম্পর্কটা বন্ধুসুলভই। তবে সেই বন্ধুত্বের ভেতর কোথায় যেন খানিক অন্যরকম কিছু ছিল। খানিক আলগোছে অনুভব করার মতো কিছু। তারা বন্ধুরা সবাই যখন একসঙ্গে কোচিং থেকে ফিরত, তখন অন্তু আর নীতু যেন

আলাদা হয়ে পড়ত। সবার থেকে একটু পিছে। যখন দলবেঁধে কোথাও রিকশায় ঘুরতে যেত, তখনো নীতুর পাশের জায়গাটা যেন আপনাআপনিই ফাঁকা থাকত। যেন সবাই জানত, ওখানে অন্তই বসবে। ওই ফাঁকা জায়গাটা অন্তর জন্যই রাখা। নীতুর কিছু লাগলে সবার আগে সেটা অন্তই জানবে। সে চট করে সেটার ব্যবস্থা করে দিবে। পথে কোথাও বাথরুম চেপে গেলেও নীতু সেটা তার কোনো বান্ধবীকে না বলে অন্তকে ফিসফিস করে বলবে। এ যেন অলিখিত এক নিয়ম। সেই নিয়মের কোথাও বিশেষ কোনো সম্পর্কের কথা কখনো সোচ্চারে বলা হয় নি। কিন্তু তারা দুজনই যেন টের পেত, কিছু একটা আছে। তবে সেই কিছু একটা কখনোই তারা বুকের গহিন খুঁড়ে বের করে এনে দেখতে চায় নি।

নীতু দেখতে সুশ্রী। এই বয়সের এমন মেয়েদের চারপাশে মনোযোগপ্রত্যাশী পুরুষের অভাব হয় না। তারা তার চেয়ে ধনে-মানে-বয়সে ঢের এগিয়েও থাকে। সেখানে ক্লাসমেট বন্ধুটিকে নেহাত বয়সে ছোট বাচ্চাছেলে বলেই মনে হতে থাকে। তাকে আর প্রেমিক ভাবতে ইচ্ছে হয় না। বরং কোন অগোচরে সে যেন পাশের বাড়ির ছোট ভাইটির মতোই হয়ে যায়।

কিন্তু নীতুর কেন যেন এমন হলো না!

তার চারপাশে অসংখ্য আরাধ্য-সামর্থ্যবান পুরুষ। তারা সবদিক থেকেই অন্তর চেয়ে ঢের ব্যবধানে এগিয়ে। অথচ তারপরও অন্তর সঙ্গই তার ভালো লাগে। তার অমন বোকা বোকা শিশুসুলভ চেহারা, অর্বাচীন কথা, আলটপকা বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা, এসবেই কেমন একটা মায়া মায়া ব্যাপার লেগে থাকে। বড় ভালো লাগে নীতুর। অন্ত যখন হড়বড় করে কথা বলে, সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অন্ত ভাবে, নীতু বুঝি তার সব কথাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ফলে সে আরও বেশি আকর্ষণীয়, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু নীতু তার কিছুই শোনে না। সে কেবল নিষ্পলক অন্তর ওই শিশুসুলভ, নিরীহ, মায়া মায়া মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাদের মধ্যে কখনো ভালোবাসাবাসি হয় নি। অন্ধকারে হুডতোলা রিকশায় লোকের চোখ এড়িয়ে টুপ করে চুমু খাওয়াও হয় নি। যেভাবে হাত ধরলে শরীরে অদ্ভুত অনুরণন তৈরি হয়, সেভাবে হাতও ধরা হয় নি। বরং আর দশজন বন্ধুর মতোই তারা হাত ধরাধরি করে দিনের পর দিন হেঁটে গেছে। সেখানে আলাদা কিংবা বিশেষ হয়ে ওঠা কোনো অনুভবও ছিল না। অথচ তারপরও কোন অগোচরে, খুব আলগোছে গলায় বেঁধা মাছের সূক্ষ্ম কাঁটার মতো কী একটা যেন তাদের বুকের বাঁ পাশে বিঁধে ছিল।

এটা তারা প্রথম টের পেল কালচারাল ক্লাবের এক ট্যুরে। বান্দরবান হয়ে সেন্টমার্টিন যাওয়ার কথা পুরো দলের। কিন্তু নীলগিরিতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল নীতু। হোটেলে ফিরতে ফিরতে সেই অসুস্থতা আরও বাড়ল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো নীতুকে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু কে আসবে তার সঙ্গে ? এমন দুর্দান্ত-রোমাঞ্চকর ট্যুরের মাঝপথে ঢাকায় ফিরতে চাইল না কেউই। অন্তটা তখন ঠিকঠিক নীতুর পাশে এসে বসল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'এত ভাবছিস কেন ? আমি তো আছি!'

ফেরার পথে বাসে অন্তকে বমি করে ভাসিয়ে দিল নীতু। তবু মুহূর্তের জন্য তাকে আড়ষ্ট হতে দিল না অন্ত। কী এক প্রবল মমতায় আগলে রাখল সারাটা রাত। ওইটুকু এক ছেলে হঠাৎ কোথা থেকে যে এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতা পেল, নীতু তা জানে না। তবে তার কেবল মনে হতে লাগল, এই ছেলেটা তার পাশে থাকলে এই জগতে সে আর কিছু চায় না। কিচ্ছু না।

ভোরবেলা যখন তারা বাস থেকে নামবে, তখন নীতু ডাকল, 'অন্ত।'

'হুম ?'

'শোন।'

অন্ত শুনল। সে কেবল উঠে দাঁড়িয়েছিল। নীতু তখনো অলস ভঙ্গিতে সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখ-মুখ ফোলা। অসুস্থ, ফ্যাকাসে মুখজুড়ে কোথায় যেন একটা নিষ্পাপ সৌন্দর্য আভা ছড়াচ্ছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ত বলল, 'বল।'

'এই দিকে আয়।' নীতু নিরীহ, নির্বিকার ভঙ্গিতে কথাটা বলল। কিন্তু তারপরও অন্ত যেন তার আশু কর্তব্য ঠিক করতে পারল না।

সে বলল, 'কই আসব ?'

'এইখানে।' চোখের ইশারায় নিজেকে দেখাল নীতু।

অন্ত চকিতে একবার চারপাশ দেখে নিল। বাসের বেশির ভাগ যাত্রীই তখন নেমে গেছে। ভোরের এই আবছা আলোয় তাদের আশপাশেও আর কেউ নেই। তারপরও সে প্রায় নিঃশব্দে বলল, 'এইখানে কোথায় ?'

'আমার কাছে।'

'কেন ?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার ?'

'না এলে বুঝবি কী করে ?'

অন্ত প্রমাদ গুনল। তারপর বলল, 'কী হয়েছে তোর ?'

'তুই জানিস না কী হয়েছে ?'

'কী ?'

'অসুখ।'

'সে তো জানিই।'

'তাহলে কাছে আসছিস না কেন ?'

'কাছে কেন আসব ?'

'অসুখ সারাবি বলে!'

এইটুকু এক কথায় অন্তর শরীরজুড়ে সেই অদ্ভুত, অনাস্বাদিত অনুরণনটা হঠাৎ প্রবল প্রগাঢ়তায় বয়ে যেতে লাগল। যা তাদের এই এত এতদিনের সম্পর্কে, বন্ধুত্বে কখনো আবিষ্কৃত, আস্বাদিত হয় নি। সে সম্মোহিত এক মানুষের মতো নীতুর দিকে এগুলো। তারপর হঠাৎ করেই যেন সময় স্থির হয়ে গেল। এক অব্যাখ্যেয় অনুভব কী গভীর আশ্লেষে পরস্পরকে শুষে নিতে লাগল পরস্পরের ঠোঁটে!

তারপর তারা বাড়ি ফিরল। নীতু সুস্থও হয়ে উঠল। কিন্তু ওই নতুন অসুখটা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখল। অন্ত অবশ্য এরপর বেশ কিছুদিন আর তার সামনে আসে নি। সেটা লজ্জা না আড়ষ্টতায়, শংকা না সঙ্কোচে নীতু তা জানে না। তবে নীতুর খুব অভিমান হতে লাগল। সে কলেজে গেলেও অন্তর সঙ্গে আর কথা বলল না। খানিক আড়াল কিংবা অগম্য করে রাখল নিজেকে। অন্যদের সঙ্গে তুমুল হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত নীতু অন্তকে দেখলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত। দূরে সরে যেত। অন্ত হঠাৎই একদিন ধরল তাকে, 'তুই সুস্থ হয়ে গেছিস ?'

'কেন ? দেখতে পাচ্ছিস না ?'

'হুম। তা-ই তো দেখছি।'

'তাহলে ?'

অন্ত খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমার ওপর রেগে আছিস ?'

'তোর ওপর রেগে থাকব কেন ?'

'এই যে তোকে দেখতে যাই নি বলে!'

নীতু ঠোঁট উল্টে বলল, 'তুই দেখতে গেলেই কী, আর না গেলেই কী ?'

'কিছুই না ?'

'না।'

অন্তর মন খারাপ করার কথা। কিন্তু সে মন খারাপ করল না। বলল, 'সত্যি সত্যি তোর অসুখ সেরে গেছে ?'

'একই প্রশ্ন বারবার কেন করছিস ? আমাকে দেখে বুঝিস না ? এই যে রোজ কলেজে আসছি, ক্লাস-কোচিং করছি। আমাকে দেখে অসুস্থ মনে হয় ?'

'সব অসুখ কি আর চোখে দেখা যায় ?' অন্ত হঠাৎ বড়দের মতো কথাটা বলল।

'মানে ?'

'মানে তোর ওই অসুখটাও কি সেরে গেছে ? যেটা আমি ছাড়া আর কেউ সারাতে পারত না! কেউ না।'

নীতু হালকা চালে কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। তারপর বলল, 'যত্ন না করলে সুস্থতাও যেমন চিরদিন থাকে না, তেমনি অসুখও না। অসুখ বাঁধিয়ে রাখতে হলেও অসুখের যত্ন করতে হয়।'

নীতুর কথাটা ঠক করে বুকে বিঁধে রইল অন্তর। কেমন এলোমেলো আর অস্থির হয়ে গেল সে। সেদিন গভীর রাতে সে নীতুকে মেসেজ লিখল, 'রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটা পড়েছিস ?'

নীতু লিখল, 'কোন কবিতা ?'

'রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে
মোর যাতনায় হইবি অধীর, আমারই অনলে দহিবে শরীর
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু রহিবে না মনে!'

নীতু কবিতাটা পড়ল। একবার, দুবার, বহুবার। কোনো উত্তর দিল না সে। তবে সেইদিন তার বুকের ভেতর হঠাৎ বাসের সেই আধো আলো অন্ধকারের সেই স্পর্শটুকু উত্তুরে হিম হাওয়ার মতো বয়ে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল কেবল অন্তই তাকে অমন রোগের মতো বেঁধে রাখতে পারে। যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতে পারে। শরীরে দহন জাগাতে পারে।

সেদিনের সেই স্পর্শটুকু দিনের পর দিন ক্রমশই গভীর সংবেদনে তাদের জীবনের আশ্চর্য রহস্যময় সব চোরাগলি একে একে উন্মুক্ত করে দিতে লাগল।



পরপর তিন দিনের শুটিং ক্যানসেল করতে হলো নদীকে। বিষয়টা তার এবং নির্মাতা, উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। তবে মানুষটা রায়হান বলেই তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। বাবার অসুস্থতার কথা বলে অকস্মাৎ এই শুটিং ফাঁসিয়ে দেওয়ার কারণটা অনিবার্য করে তুলল নদী। রায়হান বলল, 'পরের শিডিউলগুলো কিন্তু কনফার্ম কোরো। না হলে বিপদে পড়ে যাব।'

'নিশ্চয়ই ভাইয়া। নিশ্চয়ই।' নদী আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল। ভেতরে ভেতরে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেছে সে। এই মানুষটার কাছে নানাভাবেই ঋণী নদী। তার ওই ভয়াবহ বিপদে মানুষটা ওভাবে এগিয়ে না এলে এতটা পথ সে হাঁটতে পারত না। নদী অবশ্য তার জায়গা থেকে যতটা সম্ভব চেষ্টাও করে। আজকাল প্রচুর কাজের প্রস্তাব আসে তার। তবে সবার আগে সে রায়হানের কাজের শিডিউলগুলোই নিশ্চিত করে। তারপর অন্যদের। কিন্তু নীতুর এমন অভাবিত, ভয়ানক দুর্বিপাকে তার আর কোনো উপায় ছিল না।

রায়হান বলল, 'আরেকটা কথা।'

'জি।'

'তোমাকে ওইদিন বলেছিলাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন ?'

'জি। মনে আছে। আমাদের এই নাটকগুলোর প্রডিউসার।'

'হ্যাঁ। নেক্সট দিন ওনার সাথে কিন্তু দেখাটা করতেই হবে।'

'অবশ্যই। আর সরি ভাইয়া।'

রায়হান মৃদু হাসল, 'সমস্যা নেই। টেক কেয়ার অফ ইওর ফাদার।'

নীতুকে নিয়ে আশঙ্কাটা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছিল নদী। সন্ধ্যায় যখন সে হাসপাতাল থেকে বের হলো, তখন তার সঙ্গে নীতুও। তাদের আশঙ্কার সত্যতা মিলেছে। নীতুর প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। সে ভীত-সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে নদীর পাশে বসে আছে। নদী অবশ্য কোনো কথা বলল না। সে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। তখনো দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের খানিক লাল আভা। সেই আভা মেখে যেন দূরের কোনো মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসছে। আজানটা নদীর বুকের ভেতর অদ্ভুত

এক হিমশীতল অনুভব ছড়িয়ে দিতে লাগল। সেই অনুভব ভয়ের না স্থবিরতার, নদী তা জানে না। সে কেবল জানে তার চিন্তা করার ক্ষমতা হঠাৎ লোপ পেয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না। এই যে গাড়িটা চলছে, এই গাড়িটা যদি অনন্তকাল এমন করেই চলতে থাকত ? যদি আর কখনো কোথাও নামতে না হতো তাকে ? কোনো নৃশংস, রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে না হতো ?

কিন্তু জীবন তো এমন নয়। এখানে না চাইলেও নিজের ওজনের চেয়ে বেশি ভার বইতে হয়। নিজের শক্তির চেয়েও ঢের বেশি শক্তির সঙ্গে যুঝতে হয়। নদীকেও হচ্ছে। রাতে সে নীতুকে নিয়ে বসল। তারপর সরাসরিই বলল, 'এবার তুই-ই বল, কী করব ?'

নীতু কথা বলল না। মুখটা নিচু করে ফেলল কেবল। নদী বলল, 'এখন... এই এখানে মুখ লুকিয়ে লাভ আছে ?'

শায়লা বেগম ঘরে ঢুকলেন। নদী মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর বলল, 'এখন আমার সামনে দয়া করে আর কোনো নাটক করিস না। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গলা টিপে তোকে আমি খুন করে ফেলি।'

নদী থামল। তার শরীর কাঁপছে। চিবুকের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সে ওড়নায় মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'বল, কী করব এখন ?'

নীতু এবারও কথা বলল না। তবে পাশ থেকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন শায়লা বেগম। বললেন, 'ও না বিষ কিনে এনেছে ? সেই বিষ কই ? বিষ দে... আমি বিষ পানিতে গুলে ওকে এখনই খাইয়ে দেই। ল্যাঠা চুকে যাক।'

নীতু তার ভাঁজ করা দুপায়ের ফাঁকে মুখ আড়াল করে বসে আছে। শায়লা বেগম এবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এখন খুব শরম লাগে, না ? শরমে একেবারে মুখ দেখাতে পারছ না! তো যখন পায়জামা খুলছিলা, তখন এই শরম কই ছিল ? তখন কি এই শরম... ।'

একটা ভয়ংকর অশ্রাব্য কথা বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। নীতু মুখ তুলে তাকাল না। যেমন বসে ছিল, তেমন বসেই রইল। তবে ধীরে ধীরে তার শরীর কাঁপতে লাগল। সে কাঁদছে। প্রবল চেষ্টায়ও নিজের সেই কান্না আটকে রাখতে পারল না নীতু। হঠাৎ সশব্দে কেঁদে উঠল সে। নদী মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। তার আগেই শায়লা বেগম এক ঝটকায় নীতুর চুলের গোছা ধরে ফেললেন। তারপর এলোপাথাড়ি চড়-থাপ্পড় বসাতে লাগলেন। সঙ্গে ঝড়ের বেগে চলতে থাকল তার মুখও। নদী ছুটে এসে মাকে থামাল। কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হলো না। এবার শায়লা বেগম লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। তারপর খাটের পায়ার সঙ্গে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বিলাপ করতে লাগলেন। শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন নিজের ভাগ্যকে।

নদীর খুব অসহায় লাগছে। সে জানে না কী করবে! এর আগে কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়ে নি সে। কী করতে হয় বুঝতেও পারছে না। আর এ এমন এক লজ্জা আর সংকোচের বিষয় যে কারও সঙ্গে শেয়ারও করা যায় না। নিজেকে বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত, বিচলিত লাগছে তার। কিন্তু গত বছরখানেক সময় ধরে জীবন তাকে এ-ও শিখিয়েছে, বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। যতটা সম্ভব স্থির আর শান্ত থাকতে হয়। তাকেও তা-ই করতে হবে।

সে আবারও নীতুর মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'অন্তু কই ?'

নীতু চোখ তুলে তাকাল না। তবে ডানে বাঁয়ে মাথা নেড়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'জানি না।'

'জানি না মানে ?'

'ওর ফোন বন্ধ।'

'ফোন বন্ধ মানে ? কবে থেকে ?'

'অনেক দিন।'

'অনেক দিন কত দিন ?'

'পনেরো-কুড়ি দিন।'

'উফফ!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নদী। তারপর বলল, 'শেষ কবে কথা হয়েছে ?'

'ওই সময়েই।'

'ও জানে ঘটনা ?'

'হুম।'

'তার মানে জানার পর থেকেই ওর ফোন অফ ?'

এবার আর কথা বলল না নীতু। স্থির বসে রইল। নির্জীব। নদী বলল, 'এমন একটা স্কাউন্ড্রেলের সাথে এইসব করেছিস, লজ্জা হচ্ছে না তোর ?'

নীতু কথা বলল না। তবে উঠে দাঁড়াল নদী। তারপর অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগল ঘরে। একটু পর আবার এসে বসল নীতুর সামনে। দুহাতে মুখ ঢেকে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল। কী করবে সে ? অ্যাবরশন ছাড়া তো আর কোনো পথ নেই। এর বাইরে একটা মাত্র পথ খোলা আছে। অন্তর সঙ্গে নীতুর বিয়ে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা অসম্ভবের চেয়েও বেশি কিছু। একটা প্রাণ কী করে এমন অবলীলায় ধ্বংস করে ফেলবে সে ? ওই ভ্রূণটাই তো একদিন রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে উঠবে! কিংবা যদি এটা করতে গিয়ে গুরুতর কোনো সমস্যা হয়ে যায় নীতুর ? চিন্তাটা কেমন অশুভ এক বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় উঁকি দিয়ে সরে গেল। কিন্তু তার রেশটুকু লেগে রইল শরীরজুড়ে। নদীর কেমন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কী এক অমঙ্গলের ছায়া ক্রমশই

বিস্তৃত হচ্ছে তাদের মাথার ওপর। সেই ছায়ায় ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে তারা। গলার ভেতর একটা অব্যক্ত কান্না অনুভব করতে পারছে নদী। কিন্তু সে কাঁদলে অন্যদের কান্না রুখবে কে ?

নীতুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। একই সঙ্গে মায়াও। মুহূর্তের ভুলের জন্য ওইটুকু এক মেয়ে কী ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে যাচ্ছে, নদী তাও বুঝতে পারছে। সিদ্ধান্তটা নিশ্চিত জেনেও আরও একদিন সময় নিল নদী। তারপর মাকে বলল, 'আমি কিন্তু অ্যাবরশনের জন্য নীতুকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারব না, মা।'

'কেন ?'

'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না ?'

'কী বুঝতে পারব ?'

'কেউ যদি জেনে ফেলে যে ও আমার বোন, তাহলে কী কেলেঙ্কারীটা ঘটবে তুমি বুঝতে পারছ ?'

শায়লা বেগম বুঝতে পারলেন না। তিনি সচরাচর বাড়ির বাইরে যান না। নদী যে এ কদিনেই মানুষের কাছে একটু-আধটু পরিচিত হয়ে উঠেছে, বিষয়টা এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি তিনি। খানিক দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'কে বুঝতে পারবে ?'

'উফ মা!' বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল নদী। 'এই ধরো ডাক্তার বা হাসপাতালের কেউ যদি জেনে যায় বিষয়টা, তাহলে এ কান থেকে ও কান ছড়াবে। তারপর ধরো, যদি কোনো সাংবাদিক বা এমন কারও কানে চলে যায়, তাহলে আর মুখ দেখাতে হবে না কাউকে!'

এতক্ষণে যেন বুঝলেন শায়লা বেগম। বললেন, 'তাহলে কে নিয়ে যাবে ?'

'কে নিয়ে যাবে মানে ? তুমি নিয়ে যাবে।'

শায়লা বেগম এই বিষয়ে আর কথা বললেন না। পরের দিনটা শুনসান স্তব্ধতায় ছেয়ে রইল পুরো বাড়ি। কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। খেলো না। ঘুমাল না। যেন নিস্তব্ধ এক মৃত্যুপুরী। পরদিন রাতে নীতু হঠাৎ চুপিচুপি নদীর কাছে এল। তারপর দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে রইল। নদী বলল, 'কিছু বলবি ?'

নীতু কিছু বলল না। তার এক হাতের ভেতর অন্য হাতখানি আড়াআড়ি রাখা। জড়সড়ো ভঙ্গি। কালি জমে যাওয়া ক্লান্ত না ঘুমানো চোখ। নদী বলল, 'বল।'

নীতু আরও খানিকটা সময় নিল। তারপর কাঁপা-ফ্যাকাশে গলায় বলল, 'আমার খুব ভয় করছে আপু।'

'ভয় করছে কেন ?'

'জানি না।'

নদী একবার ভাবল নীতুকে কাছে টেনে নিয়ে খানিক অভয় দেয়। একটুখানি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তীব্র এক আক্রোশও অনুভব করছে সে। গত

একটা বছর এই পরিবারটাকে সে কী করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা সবাই জানে। নীতুও। দিনরাত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে যাচ্ছে সে। অথচ তারপরও এমন ভয়ংকর কাণ্ড সে কী করে ঘটাল!

নীতু মৃদু কণ্ঠে আবার ডাকল, 'আপু!'

'হু ?'

কী বলবে ভেবে মুখ খুলতে গিয়েও আবার থেমে গেল নীতু। তার চোখে মুখে ভয়। প্রবল আড়ষ্টতা। নদী বলল, 'বল ?'

'একবার অন্তর সাথে কথা বলে দেখবে তুমি ?'

'কী কথা ?'

'ও যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারে ?'

'কী ব্যবস্থা ?' নদী স্থির চোখে তাকাল।

ঝড়ে পড়া পাখির মতো খানিক ভীত চোখে তাকিয়ে থেকে নীতু বলল, 'ও যদি আমায় নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারে ?'

'কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'দূরে কোথাও।'

'দূরে কোথাও মানে ?'

'যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না...।' নীতুর কণ্ঠে রাজ্যের সঙ্কোচ, দ্বিধা। 'এমন অচেনা কোথাও।'

'মানে ?'

নীতু এবার আর কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। নদী খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই কি বাচ্চাটা নষ্ট করতে চাচ্ছিস না ?'

নীতুর খুব কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যদি সুতীব্র এক চিৎকারে পৃথিবী থেকে নিজের অস্তিত্বটা সে মুছে ফেলতে পারত! যদি সবকিছু শূন্য, বিলীন করে দেওয়া যেত! কিন্তু সে জানে, তার সকল কান্না, সকল যন্ত্রণা আজ অর্থহীন। এখানে সে শুধুই জঘন্য এক অপরাধী। তার কোনো অনুভূতিরই কোনো মূল্য এখানে নেই। এই পৃথিবীর কাছে সে পঙ্কিল-অশুচি এক মানুষ।

নদীর হঠাৎ কী হলো। সে নীতুর হাত ধরে কাছে টানল। তারপর মাথাটা নিজের কাঁধের সঙ্গে চেপে ধরে রইল। দীর্ঘ সময়। তারপর নরম গলায় বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

নীতু ভেবেছিল সে আর কাঁদবে না। কিন্তু নদীর এমন মমতাময় স্পর্শে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না সে। ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই কান্নাজড়ানো গলায়ই সে বলল, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে আপু। আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

মনে হচ্ছে, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে নোংরা, জঘন্য মানুষ আর নেই। আমি কী করব আপু ? কী করব আমি ?'

নদী শক্ত হাতে নীতুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। কাঁদুক সে। এই কান্নাটা তার দরকার! কে জানে, কত দিন ধরে একা একা এই যন্ত্রণাটা বইছে সে! নীতু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপু। খুব কষ্ট হচ্ছে। কী যে মায়া আপু! যদি এমন হতো, আমি নিজে মরে গিয়েও ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম... ওর কী দোষ বলো...!'

কান্নার দমকে গলা বুজে এল নীতুর। তার সারা শরীর কাঁপছে। গলার ভেতর থেকে যেন গলগল করে বেরিয়ে আসছে বুকে জমে থাকা ক্লেদ ও কষ্টের স্রোত। তার সেই কান্নার শব্দে নদীর বুকটাও কেমন ভার হয়ে এল। ঝাপসা হয়ে এল চোখজোড়াও।

নীতুর অগোচরেই ওড়নার খুঁটে চোখ মুছল সে।



ফজলু মিয়া পিচিক করে পানের পিক ফেলল। তার মুখভর্তি বড় বড় গুটিবসন্তের দাগ। হাতে লোহার বালা। আঙুলজুড়ে নানারঙের পাথরের আংটি। গলায় কালো দানার মোটা মালা। পরনে সাদা লুঙ্গি, সাদা শার্ট। শার্টের বুকের কাছটায় ছিটকে আসা রক্তের দাগ। অবশ্য ফজলু মিয়া পান খাচ্ছে বলে বুকের কাছের রক্তের দাগটাকে পানের পিকের দাগ বলেও মনে হচ্ছে। তার ঠোঁটের কোষ গড়িয়ে রক্তের মতো লাল পানের রস ঝরছে। দৃশ্যটা দেখতে এমনিতেই ভয়ংকর। গভীর রাতে রক্তাক্ত দা হাতে দাঁড়ানো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সেই দৃশ্য আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ফজলু মিয়া আবারও পানের পিক ফেলল। বুড়িগঙ্গার পানির রং এমনিতেই কুচকুচে কালো। তাই ভোররাতের অন্ধকারে তাকে আর আলাদা করে রং পাল্টাতে হয় না। ফজলু মিয়াকে অবশ্য হয়। তাকে দিনের আলোয় একরকম থাকতে হয়। রাতের অন্ধকারে অন্যরকম। তার হাতে সরু রামদা। দা'র গা বেয়ে টপটপ রক্ত ঝরছে। তার পাশে সাতাশ-আটাশ বছরের এক যুবক দাঁড়ানো। যুবকের নাম হেলাল। হেলাল বলল, 'লাশ কী করব, মিয়াভাই ?'

'ছয় মণ ইট বানবি লাশের গায়। প্লাস্টিকের দড়িতে বানবি। ইটের গায়ে ফুটা করা আছে তো ?'

'জে মিয়াভাই। আছে।'

'প্রত্যেক ইটের ফুটার মধ্যে দড়ি ঢুকাইয়া বানবি। তাইলে ইট সহজে ছুটবো না। খবরদার, কাম করবি খেয়াল কইরা।'

'জে মিয়াভাই।'

'তারপর মুন্সিগঞ্জের ওইদিকে গিয়া বড় নদীতে লাশ ডুবাই দিয়াসবি।'

হেলাল আর কথা বলল না। সব ব্যবস্থা আগেই করা আছে। ট্রলারভর্তি কাঁচা মাছ। মাঝরাতে এই মাছ এসেছে চাঁদপুর থেকে। তারা এখন মাছের স্তূপের নিচে গলাকাটা লাশ লুকিয়ে রাখবে। তারপর চলে যাবে বড় নদীতে। সেখানে নিরিবিলি জায়গা দেখে ইট বাঁধা লাশ নদীতে ফেলে দিবে। সকাল হতেই ফজলু মিয়ার মাছের আড়ত জমে উঠবে। খুচরা পাইকারি মাছের ক্রেতায় সরগরম হয়ে উঠবে চারপাশ। না ঘুমানো টকটকে লাল চোখে ফজলু মিয়া আড়তের ক্যাশে বসে থাকবে। তার সামনে ক্যাশবাক্সের ওপর ধূমায়িত চায়ের গ্লাস। গ্লাসের অর্ধেক জুড়ে দুধের সর। আগুনগরম চায়ের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে ফজলু মিয়া আঙুলের ডগায় সর তুলে আনবে। তারপর সুরুৎ করে জিভ দিয়ে টেনে

নিবে। ফজলু মিয়ার গায়ের রং কুচকুচে কালো। নাকের নিচে মোটা গোঁফ। কুতকুতে চোখ। আজদাহা শরীর। কানের পাশ দিয়ে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে জুলফি। সে হাতের তালুর উল্টো পিঠে সেই জুলফি ঘষতে ঘষতে বলবে, 'দুই মণ মাছ জামিলবাগের মাদ্রাসার এতিমখানায় দিয়ায়। গিয়া কইবি মিয়াভাই পাঠাইছে।'

ফজলু মিয়ার গা থেকে কাঁচা মাছের একটা উৎকট গন্ধ আসতে থাকে। তার আশপাশে থাকা লোকজনের কাছে অবশ্য সেটা আঁতরের ঘ্রাণের মতো। সে সেই আঁতরের ঘ্রাণ বিলিয়ে বেড়ায়। তার চারপাশের মানুষ তাতে বুঁদ হয়ে থাকে।

আজ ফজলু মিয়ার কাছে চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক ছেলে এসেছে। ছেলেটির নাম খলিফা। ফজলু মিয়া বলল, 'খলিফা মানে জানস ?'

ছেলেটা দাঁত বের করে হাসল। তার ওপরের মাড়ির মাঝখানে একটা দাঁত নেই। সে হাসতে হাসতেই বলল, 'জামা সিলি করে।'

'জামা সিলি কী ?'

'যারা জামা কাপুড় সিলি করে তাগো খলিফা কয়।'

ফজলু মিয়া চায়ের গ্লাস থেকে আঙুলের ডগায় সর তুলে জিভের আগায় দিতে দিতে বলল, 'তাইলে তোর নাম খলিফা রাখছে কেন ? তুই কি জামা কাপুড় সেলাই করস ?'

'আমি কি জানি ? আব্বায় রাখছে।'

'তোর আব্বা কী করে ?'

'তার কোনো খোঁজখবর নাই। সে সোয়ারিঘাটে কুলির কাম করতো। মালসামান আনা নেওয়া করতো। নৌকাও বাইতো।'

'কয়দিন ধইরা খোঁজখবর নাই ?'

'দশ-বারো দিন।'

'অহ। বয়স কত তোর ?'

'জানি না।'

'ভাই বুইন ?'

'বুইন আছে।'

'কী করে ?'

'গার্মিসে চাকরি করে।'

খলিফাকে কাজে নিয়ে নেওয়া হলো। সে রোজ ভোরে এসে ট্রলার থেকে মাছ তোলার কাজ করবে। কঠিন কোনো কাজ না। ট্রলার থেকে দুই হাতে মাছ ছুড়ে ফেলবে পারের চাতালে। এই কাজে খলিফাকে যে দরকার আছে এমনও নয়। কিন্তু ফজলু মিয়ার মন বোঝা ভারি মুশকিল। তার আড়তে কাজ করার লোকের অভাব নেই। শক্ত-সামর্থ্য জোয়ান মরদদের ভিড় লেগেই থাকে। সকলেই জানে ফজলু মিয়া লোক খারাপ। সে

কথায় কথায় রেগে যায়। অশ্রাব্য ভাষায় বাপ-মা তুলে গালাগাল দেয়। মন-মেজাজ বেশি খারাপ থাকলে সটাসট চড়থাপ্পড়ও বসিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও কারও বিকার নেই। সবাই ফজলু মিয়ার সঙ্গেই কাজ করতে চায়। তার গা থেকে ভেসে আসা পচা মাছের উৎকট গন্ধ আঁতরের ঘ্রাণ ভেবে গায়ে মাখতে চায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই যে এত এত লোক থাকতেও ফজলু মিয়া খলিফাকে কাজে নিয়ে নিল। তার বেতন ধরলো ছ হাজার টাকা। আদতে তার কোনো কাজই নেই। এও তার সেই অদ্ভুত হিসেবেরই অংশ। এই হিসেব বোঝে শুধু ফজলু মিয়া একা। তার হিসেব সে ছাড়া আর কারও বোঝার সাধ্য নেই।

মাস শেষ হওয়ার আগেই ফজলু মিয়া হেলালকে ডাকল। হেলাল বলল, 'খলিফার ট্যাকা কি দিয়া দিবো মিয়াভাই ?'

'হুম।' ফজলু মিয়া খাতায় কিছু একটা হিসেব লিখতে লিখতে বললেন।

'কত দিবো ? সে তো নয় দিন হইছে কাজে ঢুকছে।'

'পুরা মাসেরটা দে।'

হেলাল কথা বলল না। সে নিজে গিয়ে খলিফার বাসায় টাকা দিয়ে এল। সঙ্গে একজোড়া ইলিশ মাছ। খলিফার মা রাজিয়ার বয়স বেশি না। তবে অল্পবয়সে বাচ্চাকাচ্চার মা হওয়ার কারণে শরীর যেমন ভেঙে পড়েছে, তেমনি দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম আর অযত্ন অবহেলায় বয়সের আগেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে সে। রাজিয়া বলল, 'আপনেরা মানুষ না ভাই, আপনেরা হইলেন গিয়া ফেরেস্তা। বিপদের দিনে কেউ কাউরে এমনে সাহাইয্য করে শুনি নাই।'

হেলাল বলল, 'আপনের কথা ঠিক না। আমরা লোক ভালো না। তয় ওস্তাদের হিসাবনিকাশ আলাদা। সে কোনো কারণে আপনেগো পছন্দ করছে। বিপদে আপদে পড়লে জানাইয়েন। আর খলিফারে স্কুলে ভর্তি করাই দিয়েন। তার কাম তো খালি সকালে। সারা দিন তো আর কোনো কাম নাই।'

রাজিয়া বিড়বিড় করে কী দোয়া পড়ে মোনাজাত করল। তারপর হেলালের গায়ে ফুঁ দিয়ে বলল, 'আল্লায় আপনেগো ভালো করুক। আর খলিফার বাপে ফির‍্যা আইলে, তারে আপনেগো ধারে পাঠামু। আর কয়দিন এইহানে সেইহানে হাবিজাবি কাম করব ? তার চাইতে আপনেগো মাছের আড়তেই না হয় ঢুইকা যাউক।'

হেলাল বলল, 'সে কই ?'

'আইজ ষোলো দিন হইলো তার কোনো খবর নাই। হের নামে লোকজন কীসব উল্টাপাল্টা কথা কয়। এইগুলা সব মিছা কথা, বুঝলেন ভাই ? হে কিন্তু লোক ভালো। একটু খালি নেশা ভাং করে। এইডা তো আইজকাইল হগলেই করে। কিন্তু ওই ঘটনায় পুলিশের ডরে হে পলাইছে। পুলিশও নাকি তারে খুঁজতাছে। পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হইলেই সে ফির‍্যা আইবো।'

হেলাল আর কোনো কথা বলল না। সে মাছ আর টাকা রেখে ফিরে গেল। রাজিয়া বিড়বিড় করে দোয়া পড়তেই থাকল।

খলিফার বাপের নাম মজনু। মজনু এই ষোলো দিনে একবারও রাজিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে নি। বিষয়টা নিয়ে সে চিন্তিত। এমন তো হওয়ার কথা না। এর আগে এমন কখনো হয় নি। মজনুর চরিত্রের নানা দোষ আছে। সে শুধু নেশাভাঙই করে না, তার মেয়েমানুষের দোষও আছে। খারাপ জায়গায় যায়। চুরি-ছিনতাই করে। এর আগে তার নামে ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছিল। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের বাইরে এক পাগলি ঘুরে বেড়াত। সেই পাগলিকে কারা ধর্ষণ করেছে। লোকে বলাবলি করল, এই কাজ একজন দুজন করে নি। করেছে কয়েকজন মিলে। তারা বেশির ভাগই কুলি। কিন্তু সেবারের ঘটনা খারাপ। পাগলির অবস্থা মরণাপন্ন। পুলিশ পর্যন্ত ঘটনা গড়াল। মজনুর খোঁজে বস্তিতে এল পুলিশ। কিন্তু মজনু ততদিনে গা ঢাকা দিয়েছে। সে চলে গেছে চট্টগ্রাম পোর্টে। বছরখানেক বাদে যখন ফিরে এল, ততদিনে পরিস্থিতি শান্ত। কিন্তু এই পুরোটা সময় সে রাজিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। অথচ এবার কোনো কিছু না বলেই সে উধাও হয়ে গেল।

রাতে আফিয়া ঘরে ফিরলে রাজিয়া ঝলমলে গলায় বলল, 'ও আফিয়া, ঘটনা শুনছস ?'

'কী ঘটনা মা ?'

'খলিফার তো বেতন হইছে।'

'খলিফার আবার বেতন কিয়ের ?'

'সে মাছের আড়তে কাম লইছে না ?'

'সে করব কাম ? তারও আবার বেতন ?' আফিয়া ভেংচি কেটে বলল।

রাজিয়া এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'সেই এইটুক থেইকাই তো খলিফার কথা শোনলেই তোর গায়ে আগুন ধরে! তার ভালো কোনো কিছুই তো তোর সহ্য হয় না। না হোউক। তয় এইবার কান খুইলা শুইনা রাখ, সে নয় দিন কাম কইরা পুরা মাসের বেতন পাইছে।'

'নয়দিন কাম কইরা পুরা মাসের বেতন!' আফিয়া ভারি অবাক হলো।

'হুম।' রাজিয়া এবার মিটিমিটি হাসছে। বিষয়টা খুব উপভোগ করছে সে। খলিফাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না আফিয়া। ফলে তার এই অবাক হওয়াটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাইছে রাজিয়া। আফিয়া বলল, 'এইটা কি খলিফা তোমারে কইছে ? না তুমি নিজ চোখে দেখছো ?'

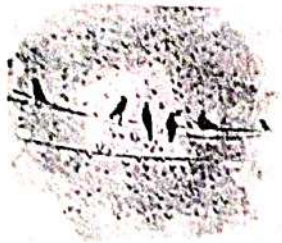
রাজিয়া তার জমানো টাকার গোপন বাক্স থেকে এক তোড়া নোট বের করে দেখাল, 'এই নে, দেখ। নগদ টাকার কারবার করে তারা। ইলিশ মাছও দিয়া গেছে দুইডা।'

রাজিয়ার গলায় উচ্ছ্বাস। আফিয়াও এবার আর তার বিস্ময় লুকাল না। রাজিয়া পানের ডিব্বা খুলে ধীরেসুস্থে একটা পান মুখে দিল। তারপর আঙুলের ডগায় চুন নিয়ে মুখে দিতে দিতে বলল, 'সে খালি তোর কাছেই অকর্মার ঢেঁকি। পুরা দুনিয়ার কাছে না।'

রাজিয়ার মুখজুড়ে সন্তুষ্টির আভা। পুত্রগর্বে গরবিনী মাতার আত্মতৃপ্তি সেখানে ঝলকে যাচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আফিয়ার বিস্ময়টা যেন থিতিয়ে আসতে লাগল। সেখানে বরং উঁকি দিতে লাগল গভীর দুশ্চিন্তার এক রেখা। তবে সে কথা সে মাকে বলল না। বাবার নিখোঁজ চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকা মা যদি খলিফার এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে খানিক আনন্দে থাকে, তাতে ক্ষতি কী!

মাসখানেক আগে ভোররাতে পিরোজপুর থেকে এমভি অস্তাচল নামে এক লঞ্চ এসে থেমেছিল বাদামতলীর ঘাটে। সেই লঞ্চ থেকে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একা এক কিশোরী মেয়েও নেমেছিল। সে নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু দিন দুই বাদে সেই মেয়ের লাশ পাওয়া গেল নদীতে। ওইটুকু বাচ্চা এক মেয়ে!

এই ঘটনার পর থেকেই আফিয়ার বাবা মজনুর খবর নেই। তাদের সবারই প্রতিমুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি মজনু এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে ডাকছে বা কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু আজ এতদিন হয়ে গেল, অথচ মজনু আর এল না।



তিন দিন পর শুটিংয়ে এসেছে নদী। কিন্তু তাকে ঠিক সুস্থির লাগছে না। সারাক্ষণ ফোন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল সে। সঙ্গে অমনোযোগী আর অস্থিরও। বেশ কয়েকবার শটও কাটতে হলো তার কারণে। বিষয়টা নিয়ে বিরক্ত রায়হান। সে নদীকে ডাকল, 'কোনো সমস্যা নদী ?'

'নাহ। আমি ঠিক আছি।'

'উঁহু। ঠিক নেই তুমি। কী হয়েছে আমাকে বলো।'

'কিচ্ছু হয় নি।'

'কিন্তু সারাক্ষণ এভাবে ফোনে কথা বলতে থাকলে শুটিং করবে কখন ?'

'সরি, আসলে বাসায় একটা ঝামেলা হয়েছে তো...।'

এবার গম্ভীর হলো রায়হান, 'একটা কথা বলি নদী ?'

'জি।'

'প্রফেশনাল লাইফ আর পারসোনাল লাইফকে আলাদা রাখতে হবে। নাহলে সবকিছু অনেক কঠিন হয়ে যাবে।'

'জি।'

'তা ছাড়া, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, এই কাজগুলো তোমার জন্য খুব বড় একটা সুযোগ। এত সহজে এত বড় সুযোগ কিন্তু তোমার পাওয়ার কথা ছিল না।'

'জি।' নদী আহত কণ্ঠে বলল। সে নিজেও বুঝতে পারছে, সবকিছু এলোমেলো করে ফেলছে সে। তবে সে এটাও জানে এই মানুষটা তার প্রতি খুব যত্নশীল। সহনশীলও।

রায়হান বলল, 'আমরা পরের সিকুয়েন্সে যাব ?'

'আমার অন্য একটা সমস্যা হচ্ছে।'

'কী সমস্যা ?'

'আমি আসলে স্ক্রিপ্টটা পড়ার সময় পাই নি। আপনি কি আমাকে গল্পটা আরেকবার একটু ব্রিফ করবেন ?'

রায়হান দীর্ঘশ্বাস ফেলে নদীর দিকে তাকাল। তার খুব রেগে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বিষণ্ন সুন্দর এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে রেগে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে বলল, 'চা খাবে ?'

নদী খুবই অবাক হলো। তবে ভালোও লাগল তার। এই মানুষটা যেন কেমন! গম্ভীর, শান্ত, চুপচাপ। তারপরও মানুষটাকে খুব আপন মনে হয়। মনে হয়, যে-কোনো বিপদে চট করে পাশে এসে দাঁড়াবে সে। তারপর শক্ত করে হাত ধরবে। ভেতরে ভেতরে মানুষটার প্রতি বিশেষ একটা অনুভূতি লালন করে সে। কিন্তু সেটা কখনো প্রকাশ করে নি। কাজের জায়গাটাকে আলাদাই রাখতে চায় সে। হয়তো কখনো সময় হলে বলবে। নদী বলল, 'খাব। তবে...।'

'কী ?'

'যদি আপনি আবার বকা না দেন।'

'আমি তোমায় বকেছি ?'

'নয়তো কী ?' খানিক তরল ভঙ্গিতেই বলল নদী।

'উফ!' বলে হাসল রায়হান। 'তুমি তাহলে আমার বকা দেখোই নি!'

'দেখতেও চাই না।' এবার নদীও হাসল। তার হাসিটাও কি বিষণ্ন ? কী এমন বিষাদ এই মেয়েটির ?

রায়হান পরিচালক হিসেবে কাঠখোট্টা ধরনের। শুটিং সেটে কারও সঙ্গে তার হাসি-তামাশা করার অভ্যাস নেই। অযথা আড্ডা বা গল্পও না। তাকে কখনো অপ্রয়োজনে অভিনেত্রীদের মেক-আপ রুমেও বসে থাকতে দেখা যায় না। কিন্তু এই মেয়েটার সঙ্গ তার ভালো লাগে। আর আট-দশজন অভিনেত্রীর চেয়ে এই মেয়েটা কোথায় যেন বেশ খানিকটা আলাদা। হয়তো সাধারণত্বে। নিজেকে প্রদর্শনের প্রবণতা তার একদমই নেই। যেন পাশের বাড়ির খুব সহজ-সাধারণ মেয়েটি সে। যে বুকের ভেতর অজস্র কষ্ট লুকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই কষ্টটা সারাক্ষণ তার চোখে কাজলের মতো লেপ্টে থাকে। ওইটুকু কিছুতেই আড়াল করতে পারে না সে। ওই কষ্টটুকুই তাকে মেঘের মতো মায়াময় করে রাখে।

তারা চা খেতে বসল পাশাপাশি। একটা ফুরফুরে হাওয়া নদীর চুলগুলো বারবার মুখের ওপর এনে ফেলছিল। সে অবচেতন আলস্যে সেই চুলগুলো সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রায়হানের ইচ্ছে হচ্ছিল নদীর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকতে। বিষয়টা নদীও খেয়াল করেছে। কিন্তু সে তেমন কিছুই করল না। বরং গভীর মনোযোগে চা খেতে খেতে বলল, 'এখন আমরা যে অংশটা করছি, সেটা একটা গার্মেন্টসের।'

'জি।'

'মেয়েটার মা একটা বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। সেই সূত্রে ওই বাসার গৃহকর্তার সাথে তার পরিচয়।'

'জি।'

'কথাপ্রসঙ্গে সে গৃহকর্তাকে জানাল যে তার একটা মেয়ে আছে, আঠারো উনিশ বছর বয়স। মেয়েটাকে সে ঝিয়ের কাজ করাতে চায় না। ক্লাস এইট-নাইন অবধি মেয়েটা

পড়েছে। সে চায় মেয়েটা অন্য কোনো কাজ করুক। মানে ঝিয়ের কাজের চেয়ে ভালো কোনো কাজ।'

'হুম। গৃহকর্তা তখন বললেন তিনি মেয়েটিকে গার্মেন্টসে একটা কাজ দিতে পারেন। কারণ গৃহকর্তা নিজে একটা গার্মেন্টসে চাকুরি করেন।' যোগ করল নদী। 'এই পর্যন্ত আমি পড়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। তো মেয়েটার চাকুরি হয়ে গেল। আহামরি না হলেও গার্মেন্টসে যে বেতন সে পাবে, সেটা তাদের বিবেচনায় সন্তোষজনক। সমস্যা হচ্ছে, সেখানে নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হলো মেয়েটি। গৃহকর্তা প্রথমদিকে তার সঙ্গে খুবই ভালো আচরণ করতেন। তিনি মাঝবয়সী মানুষ। ফলে তার আচরণটাও অনেকটা অভিভাবকসুলভ। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ভয়ংকর কুৎসিত একটা দিকও আবিষ্কার করে ফেলল মেয়েটা। নানা ছুঁতোয় সে মেয়েটাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে চাওয়া। বাইরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া। এইসব। মেয়েটার সমুদ্র খুব পছন্দ। সে কখনো সমুদ্র দেখে নি। তো লোকটা একবার তাকে প্রস্তাব দিল যে অফিসের কাজে তাকে বরিশাল যেতে হবে, মেয়েটা চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারে। সদরঘাট থেকে বিলাসবহুল সব লঞ্চ যায় বরিশাল, গৃহকর্তা মেয়েটিকে সেই লঞ্চে করে বরিশাল নিয়ে যাবে। সেখান থেকে অফিসের কাজ সেরে একদিনের জন্য তারা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতেও ঘুরে আসতে পারবে।'

'জি।'

'মেয়েটার আজন্ম স্বপ্ন সমুদ্র দেখা। কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য তো সে জানে। ফলে সরাসরিই তাকে না করে দিল মেয়েটা। বিষয়টা গৃহকর্তা নিতে পারল না। সে নানাভাবে মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। মেয়েটার মাকে তার বাসার কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল। মানে মেয়েটাকে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখা যে সে যদি তার কথা না শোনে, তাহলে তার চাকরিটাও থাকবে না।'

'জি।'

'বুঝতেই পারছ, হুট করেই নতুন একটা রিয়েলিটি ফেস করতে হলো মেয়েটার। লোকটার নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা কিংবা সরাসরি আপত্তিকর আচরণেরও কোনো প্রতিবাদ করতে পারছিল না সে। এমনকি চাকরিটাও ছাড়তে পারছিল না। বরং এই সময়ে তার সামনে আরও কিছু ভয়ংকর ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত হলো।'

'কী ভয়ংকর ব্যাপার ?'

'গার্মেন্টসে আরও কিছু মেয়ের সাথে লোকটার এই ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। সে প্রায়ই নানা উপায়ে বিভিন্ন মেয়েকে নিয়ে সদরঘাট টু বরিশাল কিংবা পটুয়াখালির লঞ্চের কেবিনে যাতায়াত করে। এটা অনেকটা সেফ। যাত্রীর বেশে যে-কেউ লঞ্চের কেবিন ভাড়া করে যেতে পারে। এমনও না যে এখানে কোনো পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। বা পুলিশি কোনো ঝামেলা আছে। ফলে লোকটা এই নিরাপদ ব্যবস্থাটাই বেছে নিল।'

'কী ভয়ংকর!'

'হুম। সাধারণ অথচ ভয়ংকর।'

'তারপর ?'

'এরপরই গল্পটার শুরু। ঘটনাচক্রে একবার লোকটার সঙ্গে লঞ্চে যেতে বাধ্য হয় মেয়েটি। তারপর সেই বিভীষিকাময় রাতের গল্প শুরু হয়...।'

'উফ!' অস্ফুটে শব্দ করল নদী। 'তারপর ?'

'বাকিটুকু আমি আর বলব না। তুমি নিজে পড়বে। ওই অংশটা ফিল করতে হলেও তোমার নিজেরই পড়তে হবে। আপাতত আমরা গার্মেন্টসের অংশের শুটিংগুলো শেষ করব।'

অবচেতনেই গল্পের বাকি অংশটা নদীর মাথায় ঘুরতে লাগল। চারপাশে কত কত গল্প। এই যে নীতু, নীতুর গল্পটাও কী নিদারুণ যন্ত্রণার! বয়সের উচ্ছ্বাস আর ভাবনার অপরিণত উদ্দামতায় হুট করেই জীবনের যে ভয়ংকর চোরাগলিতে এসে সে দাঁড়িয়েছে, এই চোরাগলি থেকে কি কখনো মুক্তি মিলবে তার ? সময় যে বিভীষিকাময় স্মৃতির ক্ষতচিহ্ন গেঁথে দিল তার বুকে, তা থেকে বাকিটা জীবন কি আর কখনো মুক্তি পাবে সে ?

শুটিং শেষ হতে হতে রাত ন'টা। নদী বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে ছিল। বিষয়টা লক্ষ করে রায়হান হঠাৎ বলল, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ ?'

'কী ?'

'আজ একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তোমার।'

'ওহ।' নদী চমকাল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে যে!'

'ভয় পাচ্ছ ?'

'ভয় পাব কেন ?' বললেও রায়হানের প্রশ্নটায় খানিক অবাকই হলো নদী। এই এতদিন ধরে তার সঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু কখনো এই প্রশ্নটি সামনে আসে নি। কিংবা রায়হানই আসতে দেয় নি। তার কথা কিংবা আচরণে সে যথেষ্ট পরিমিত, পরিশীলিত। ফলে অমন ভাবার বিন্দুমাত্র কারণও নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন কথা কেন বলল রায়হান ? বিষয়টি অস্বস্তির এক কাঁটা হয়ে খচখচ করতে লাগল নদীর মাথায়।

যেখানে শুটিং হচ্ছে, সেই গার্মেন্টসটা বুড়িগঙ্গার ওপারে। ফলে সোয়ারিঘাট যেতে খুব একটা সময় লাগল না তাদের। কিন্তু বুড়িগঙ্গার মূল ঘাটের ভিড় থেকে অনেকটা দূরে খানিক শুনসান জায়গাটায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। চারপাশে ময়লা আবর্জনার স্তূপ। গা ঘিনঘিনে নোংরা পরিবেশ। তার ওপর বিকট গন্ধে পেট গুলিয়ে ওঠার যোগাড়। এসব মিলিয়ে নদীর অস্বস্তিটা যেন আরও বাড়ল। এমন কোনো জায়গায়

নাটক বা সিনেমার কোনো প্রযোজক থাকতে পারে, বিষয়টা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। একটা ঘিঞ্জি সরু গলি পেরিয়ে পুরোনো আমলের পলেস্তরা খসা জীর্ণ এক ঘরে এসে ঢুকল তারা। এত রাতেও ঘরে আগরবাতি জ্বালানো। লো ভোল্টেজের হলুদ আলোর বৈদ্যুতিক বাতিতে ঘরটাকে কেমন গা ছমছমে লাগছে। আগরবাতির ধোঁয়ায় খানিক আবছা হয়ে আছে চারপাশ। তবে বাইরের উৎকট গন্ধটা তাতে একটুও কাটে নি।

নদীর গা গোলাচ্ছে। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে পুরোনো একটা ফরাশ পাতা। তার ওপরে পরিষ্কার ধোয়া চাদর। চাদরের গায়ে লাল কটকটে ফুলের ছবি। দুখানা পুরোনো আমলের কাঠের চেয়ার। একখানা গদি আঁটা টুল। সবকিছুতেই নানা রকম রঙের উৎকট ছড়াছড়ি। তবে ঘরটাকে প্রথম দেখায় নোংরা মনে হলেও ধীরে ধীরে চোখ সয়ে আসে। একটা পরিচ্ছন্ন তৈলাক্ত ভাব ফুটে ওঠে। মেঝেটা দেখে যেমন মনে হচ্ছে, এইমাত্র কেউ ডলে ডলে ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো করে রেখে গেছে। তারপর যত্ন করে তেল মালিশ করেছে। চকচক করছে মেঝেটা।

রায়হান বলল, 'ভয় করছে ?'

'ভয় করবে কেন ?'

'নাহ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে।'

'আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি ভয় পাচ্ছি ?'

'হু।'

'আমার কী দেখে মনে হচ্ছে ?'

'চোখ।'

'চোখ দেখে সব বোঝা যায় ?'

'যায়।'

'কখন থেকে আমার চোখে ভয় দেখতে পাচ্ছেন ?'

'এখানে আসার ঠিক আগে থেকে। তবে সেটা ধীরে ধীরে বেড়েছে। এই ঘরে ঢোকার পর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে।'

নদী হাসার চেষ্টা করল, 'আপনি আজ খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছেন রায়হান ভাই।'

'অন্য সময় বলি না ?'

'উঁহু। অন্যসময় কেমন গম্ভীর আর রাগী রাগী মনে হয় আপনাকে।'

'আজ কী মনে হচ্ছে ?'

'বুঝতে পারছি না। তবে খানিক অন্যরকম।'

'তোমাকেও।'

'আমাকেও ?' নদী অবাক হলো।

'হুম।'

'কেমন ?'

'তোমাকে খুব ভীত লাগছে। কিন্তু সেই ভয়টা তুমি কাটানোর চেষ্টা করছ। মনে মনে নিজেকে নানান ধরনের যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছ যে আমাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি মোটেও ভয় পাওয়ার মতো কেউ নই।'

'আপনাকে কেন ভয় পাব আমি ?'

'যে কারণে আর সব নারী পুরুষকে ভয় পায়।' ফট করে কথাটা বলে ফেলল রায়হান।

নদী জানে না কেন, তবে কথাটা শুনে সত্যি সত্যিই তার ভীতিকর এক অনুভূতি হলো। এই নির্জন পুরোনো গা ছমছমে বাড়ি। এখানে সে কাউকে চেনে না, জানে না। এখন অনেক রাত। এমন গা ঘিনঘিনে নোংরা এক গলি পেরিয়ে এই অগম্য অন্ধকারে সে একা কী করে, কী ভেবে এল ? এখন এখানে যদি তার কিছু হয়ে যায় ? যদি রায়হান তাকে... কিংবা অন্য কেউ ?

নদী জানে, অভিনয় করতে এসে প্রযোজকদের সঙ্গে নানান সম্পর্কে যেতে হয় অনেককেই। তার ক্ষেত্রে এমন কিছু এখনো ঘটে নি। কিংবা অমন কিছু দেখলেই সাবধানে সরে এসেছে সে। কিন্তু আজ এই অসহায় মুহূর্তে যদি তেমন কিছু হয়ে যায় ? ভাবতেই হঠাৎ শূন্য হয়ে যেতে লাগল নদীর বুকের ভেতরটা। কী এক অব্যাখ্যেয় আতঙ্ক শিরশির করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরজুড়ে। রায়হানের সতর্ক হাতটা ঠিক সেই মুহূর্তে নদীকে স্পর্শ করল। কোলের ওপর রাখা তার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল সে। ভীত, শঙ্কিত নদী এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিল। সঙ্গে খানিক অস্ফুট চিৎকারও। তারপর আতঙ্কিত চোখে তাকাল রায়হানের দিকে। রায়হান বিব্রত ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করল। কিছু বলতেও চাইল যেন। কিন্তু তার আগেই ঘরে ঢুকল লোকটা।

ঘাড় অবধি লম্বা চুলের লোকটার পরনে ধবধবে সাদা ফতুয়া আর লুঙ্গি। কুচকুচে কালো গায়ের রং। হাতে মোটা বালা। আঙুলে আংটি। গলায় নানান রঙের মালা। তবে এসবকিছুই নদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকটার গভীর কালো চোখ। চোখজোড়া দ্ব্যর্থবোধক। সেখানে একই সঙ্গে স্থৈর্য ও অস্থিরতা। মায়া ও নিষ্ঠুরতা। এমন সাধারণত হয় না। কিন্তু লোকটার গভীর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে নদীর তেমনই মনে হলো।

লোকটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চা দিয়ে যাওয়া হলো। দুধ চায়ের ওপর মোটা সর ভাসছে। কিন্তু সেই চা নদী খেতে পারল না। তার মনে হলো ঘরজুড়ে ভেসে বেড়ানো সেই উৎকট গন্ধটা আরও বেড়েছে। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নদীর আচমকা মনে হলো, সে বুঝতে পারছে গন্ধটা কিসের! সম্ভবত পচা মাছের আঁশটে কোনো গন্ধ টের পাচ্ছে সে। কিন্তু এখানে মাছের গন্ধ আসবে কোত্থেকে ?

'মেয়ের চেহারা-ছবি তো সামনাসামনিও ভালো। কিন্তু সাজগোজ এত কম কেন ? আমার সাজনেওয়ালী মেয়ে পছন্দ।' লোকটা গমগম করে কথা বলে উঠল। উঁচু ছাদের ঘর বলেই কি না কে জানে, তার সেই কণ্ঠ প্রতিধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল

ঘরজুড়ে। কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল নদীর। লোকটার পাশে মূর্তির মতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নদী জানে না কেন, লোকটাকে দেখে ভয়ংকর শিকারি পোষা কুকুরের মতো মনে হলো তার। যেন হুকুম পেলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

রায়হান নরম গলায় সালাম দিয়ে বলল, 'মিয়াভাই, এর নামই নদী। আমাদের নাটকের নায়িকা।'

'হুম।' গম্ভীর গলায় বলল সে। তারপর সামান্য থেমে বলল, 'আমার নাম জানে সে ?'

'জি না।'

'আমার নাম ফজলু মিয়া।' নদীর দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা। 'সবাই অবশ্য মিয়াভাই-ই ডাকে। তোমাগো নাটক বানানোর টাকা আমি দেই। তো তুমি যে এমন সোন্দর মাইয়া, তোমার জানন দরকার আছে না, তুমি কার টাকার নাটকে কাম করতেছো ? লোকটা খারাপ না ভালো ?'

নদী কথা বলল না। লোকটার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভব্যতা জ্ঞান নেই। হুট করেই তাকে তুমি করে বলতে শুরু করেছে। তারচেয়েও বড় ব্যাপার, তার চোখে মুখে একটা প্রচ্ছন্ন ঔদ্ধত্য। সেখানে অন্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা সমীহ নেই। সে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে যেন নদী তার চারপাশে ঘুরঘুর করা আর আট-দশজন লোকের মতোই তুচ্ছ, অনুগত, বশংবদ কেউ। লোকটার প্রতি রাগ হওয়ার কথা ছিল নদীর। কিন্তু সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, রাগ না, তার ভয় হচ্ছে। তীব্র ভয়। লোকটার আচরণে কিছু একটা আছে। যা অজান্তেই ভয়ের একটা শীতল স্রোত ছড়িয়ে দেয়।

সে লোকটার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। পচা মাছের আঁশটে গন্ধটাও অসুস্থ করে ফেলছে তাকে। ফজলু মিয়া বলল, 'আমারে দেখে তোমার কেমন লোক মনে হইতেছে ? আমি লোক খারাপ না ভালো ?'

নদী এবারও কথা বলল না। ফজলু মিয়া হাসল। হো হো শব্দের ভয়ংকর হাসি। সেই হাসি প্রতিধ্বনি তুলে আরও ভীতিকর হয়ে ফিরে আসতে লাগল। সে বলল, 'এই মেয়ে তো আমারে দেইখাই ভয় পাইয়া গেছে। তো বাকি সময়ে কী করব ?'

ফজলু মিয়া থামল। দীর্ঘসময় কেউ কোনো কথা বলল না। খানিক আগের গমগমে শব্দটা মিইয়ে গিয়ে পুরো ঘরটা আবার শুনসান স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। সে গভীর মনোযোগে চায়ের কাপ থেকে আঙুলের ডগায় সর তুলে সুরুৎ করে মুখে পুরে দিল। তারপর ছপছপ শব্দ তুলে খেতে লাগল। খানিক সাদা তরল দুধ তার কালো মোটা ঠোঁটের দুধার বেয়ে দরদর করে নেমে আসতে লাগল। কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্যই করল না। আবারও গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে সর তুলে বিচ্ছিরি শব্দে খেতে লাগল। দৃশ্যটা গা ঘিনঘিনে। ফজলু মিয়া হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে সেই হাত আবার বেড়ালের মতো জিভ দিয়ে চাটতে লাগল। তারপর বলল, 'তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কি কম ?'

এই প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল নদী। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, ফজলু মিয়া তাকে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করছে ? তার বলার ভঙ্গিটা যথেষ্ট আপত্তিকর। তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার, কথাটা বলেই বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে হাসতে লাগল লোকটা। হাসতে হাসতেই বলল, 'শুনছি যেইসব মাইয়ার চেহারা-ছবি ভালো হয়, তাগো নাকি বুদ্ধি কম থাকে। এখন তো দেখি কথা সত্য। তুমি এই রাইতে এইখানে আইছো কার ভরসায় ?'

নদী কথা বলল না। লোকটা বলল, 'রায়হানের ভরসায় আইছো ? হা হা হা। রায়হান কী করব ? তোমারে সিক্যুরিটি দিবো ? হা হা হা।'

নদী এবার ভয়ে জড়সড়ো হয়ে গেল। সে চকিতে একবার রায়হানের দিকে তাকাল। কিন্তু রায়হান তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে একদৃষ্টিতে ফজলু মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ফজলু মিয়া বলল, 'এইখানে এখন তোমার কিছু হইয়া গেলে, ফিরাবে কে ? এইখানে তোমার কী কী হইতে পারে, সেইটা তো বুঝতে পারতেছো ? নাকি সেইটাও বুঝতে পারতেছো না ? হা হা হা।'

লোকটা হাসছে। হাসির দমকে তার শরীর কাঁপছে। খানিক আগেই দুধের সর খাওয়ার কারণে মুখ থেকে সাদা থুথু ছিটছে। ভয়ানক দৃশ্য! নদীর শ্বাসকষ্টের মতো হতে লাগল। তীব্র আতঙ্কে তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। ফজলু মিয়া বলল, 'এইখানে এতগুলা পুরুষমানুষ। আর তুমি একটা মাত্র মাইয়া। এখন তোমার মতোন এমন সুন্দরী যুবতী একটা মাইয়া যদি এইখানে একলা আসে, তাইলে কী কী হইতে পারে বইলা তোমার মনে হয় ? নাকি এখনো কিছুই বুঝতে পারতেছো না ?' বলেই আবারও বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাসল লোকটা।

নদীর বোঝার আর কিছু বাকি নেই। সে তার জীবনের ভয়ংকরতম ভুলটা করে ফেলেছে। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে কী করে করবে ? তার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখান থেকে তার মুক্তি নেই। মুহূর্তের জন্য নীতুর কথাটাও মনে পড়ে গেল তার। শেষ অবধি নীতুর গল্পটা তো তার চেয়ে ঢের বেশি শ্রেয়। ওখানে যে প্রচলিত শরীরী অশুচির ভাবনা, তা পেরিয়েও প্রবল ভালোবাসার স্পর্শের কথাটুকু তো অন্তত ভাবা যায়! কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার সঙ্গে যা হতে যাচ্ছে, এর সঙ্গে তুল্য কী ? এরচেয়ে ভয়াল, জঘন্য কিছু কি আর এই পৃথিবীতে আছে ?

নদীর জল-ছলছলে চোখে যেন পৃথিবীর সমস্ত আতঙ্ক এসে ভর করেছে। কোনো মেয়ের জীবনে এরচেয়ে ভয়ংকর কোনো অনুভূতি আর হয় না। তার শরীর অসাড়। কিছু বলতে চেয়েও পারছে না। কী বলবে সে ?

নদীর অবশ্য কিছু বলতে হলো না। তার আগেই ফ্ল্যাশলাইটের মুহুর্মুহু আলোয় তার চোখ ঝলসে যেতে লাগল। একের পর এক ক্যামেরার শাটারের শব্দে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ঘরের হলুদ ঝাপসা আলোর পরিবর্তে ঝলমলে আলোয় ভরে উঠল চারপাশ। ফজলু মিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায় বলল, 'দাঁড়াই আছো কেন রায়হান ? বসো তোমরা।'

নদীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তখনো কাটে নি। সে হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। কী হচ্ছে এখানে ? তাদের বাঁদিকের দেয়ালে একটা বড় টেলিভিশন মনিটর। মনিটরটা এতক্ষণ চোখে পড়ে নি নদীর। সেটি হঠাৎ সচল হয়ে উঠল। সেখানে সম্প্রতি করা নদীর একটি নাটকের দৃশ্য ভেসে উঠল। নাটকটিতে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয় মেয়েটি। খুবই ভয়ংকর একটি মুহূর্ত। এতদিনের পরিচিত, বিশ্বস্ত বন্ধুদের আচমকা যখন সে ধর্ষক হিসেবে আবিষ্কার করে, ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন অনুভূতি হয়েছিল মেয়টির ? কী অবিশ্বাস্য আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল তার চোখে মুখে ?

ফজলু মিয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যে মেয়ে কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়ে নাই, সে কখনো ওই অবস্থাটা বুঝতে পারবে না। তুমিও না।' বলে থামল ফজলু মিয়া। তারপর বলল, 'আমি তোমার নাটকগুলা সব দেখছি। তোমার চোখে মুখে ওই ভয়টা আমি দেখি নাই। একটাতেও তুমি সেইটা ফুটাই তুলতে পারো নাই। কিন্তু আমি চাই, ওই মুহূর্তের আতঙ্ক, ভয়... ওইটা মানুষ বুঝুক। ওই মেয়েগুলার অবস্থাটা মানুষ বুঝুক। আর সেইটা বোঝানোর জন্য তোমার চোখে মুখে ওই ভয়টা পুরাপুরি ফুটাই তুলতে হইবো। সেইটা তুমি একদমই পারো নাই। ঘটনা পরিষ্কার ?'

নদী বুঝতে পারছে না ঘটনা পরিষ্কার কি না। তবে সে এখনো ধাতস্থ হতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। দরদর করে ঘামছে সে। ফজলু মিয়া বলল, 'এইখানে ভয়ের কিছু নাই। তুমি খুব বেশি ভয় পাইয়া গেছিলা। তোমার ওই ভয়ের কিছু ছবি তোলা হইছে। ছবিগুলা মনোযোগ দিয়া দেখবা। আজ যেই ভয়টা তোমার চোখে-মুখে ছিল, আমি ঠিক ওই ভয়টাই চাই। আমি চাই মানুষ তোমার চোখ-মুখের আতঙ্ক দেইখাই পরিস্থিতিটা বুঝুক। ক্লিয়ার ?'

নদী কী বুঝল কে জানে। তবে সে মাথা নাড়ল। ফজলু মিয়া তার কাছে এগিয়ে এল। পচা মাছের তীব্র গন্ধটা যেন সজোরে ধাক্কা দিল নদীর নাকে। প্রায় বমি হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো তার। বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল সে।

ফজলু মিয়া বলল, 'আর দিনকাল ভালো না। যার তার সাথে যেইখানে সেইখানে হুটহাট যাওন ঠিক না। বুঝলা ?'

নদী কথা বলল না। তবে ফজলু মিয়া হাত বাড়িয়ে আলতো করে তার হাতটা ছুঁয়ে দিয়ে বলল, 'যাও, রাইত অনেক হইছে।'

বলেই ঘুরে হাঁটা দিল সে। তবে নদী নড়ল না। এখনো শরীরে সাড় ফিরে পাচ্ছে না সে। যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে নদীর আচমকা মনে হলো, পুরো ঘরটা অদ্ভুত এক আঁতরের গন্ধে ম ম করছে। খানিক আগের উৎকট, পচা মাছের সেই গন্ধটা যেন আর নেই। কিংবা সেটা হঠাৎ করেই এমন সুবাসিত আঁতরের সৌরভে পরিণত হয়েছে।

তবুও ফজলু মিয়ার ওই স্পর্শটুকু তীব্র এক অস্বস্তি হয়েই রয়ে গেল তার হাতে।



নীতু চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। শায়লা বেগম তাকে ভাত খেতে ডাকলেন। কিন্তু সে শুনল কি না বোঝা গেল না। তার দৃষ্টি নিস্পন্দ, নির্জীব। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিকেলের আকাশে। তবে কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। সারা দিনে কিছুই খায় নি সে। দিন পনেরো আগে হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকেই যেন পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তার চোখ ফ্যাকাশে, মুখ রক্তশূন্য। মাথাজুড়ে এলোমেলো চুল। শায়লা বেগম একটা চিরুনি নিয়ে এসে তার মাথা আঁচড়ে দিতে লাগলেন। নীতু কিছু বলল না। সে যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। যেন প্রাণহীন এক মানুষ।

ভেতর থেকে নদী ডাকল, 'মা।'

শায়লা বেগম বারান্দা থেকেই জবাব দিলেন 'হু।'

'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

'কই যাচ্ছিস ?'

'নতুন একটা কাজের কথা চলছে। ওটা নিয়েই একটা মিটিং আছে।'

'তুই কি সত্যি সত্যিই আর রায়হানের কোনো কাজ করবি না ?'

'ইম্পসিবল। তুমি কি পাগল হয়ে গেছ মা ?'

'পাগল হব কেন ?'

'হি ইজ আ সিক। আর যেই লোকটা উনার নাটকের জন্য টাকা ইনভেস্ট করে সে আরও বড় সিক। সাইকো একটা মানুষ। আমার ধারণা সে মানুষ টানুষও খুন করতে পারে।'

'ধুর, কীসব বলছিস তুই ?'

'আমি ঠিকই বলছি মা। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না, মানসিকভাবে কী পরিমাণ অসুস্থ সে! ভাগ্য ভালো যে ওরকম একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমি অক্ষত বের হয়ে আসতে পেরেছি।'

শায়লা বেগম বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলেন। নদী আয়নার সামনে বসে শেষ মুহূর্তে নিজেকে দেখে নিচ্ছিল। তিনি চিরুনিটা তার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, 'লোকটা যদি সত্যি সত্যিই অত খারাপ হতো, তাহলে কি তোকে এমনি এমনিই ছেড়ে দিত ?'

নদীর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। অনেক ভেবেও এর যুতসই কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় নি। তবে সে রাতের ঘটনার পর রায়হানকে সে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে,

এই প্রজেক্টের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার পর রায়হানের সঙ্গে আর কোনো কাজ সে করবে না। হজমু মিয়ার কোনো কাজ তো নয়ই। রায়হান তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয় নি। নদী তার সিদ্ধান্তে অনড়। শায়লা বেগম বললেন, 'কী, কথা বলছিস না কেন ? দিত ছেড়ে ?'

নদী উঠতে উঠতে বলল, 'জানি না মা। তবে ওই লোকটা একটা সাইকো। মানসিকভাবে ভয়ংকর অসুস্থ। না হলে কেবল এক্সপ্রেশন দেখানোর জন্য কেউ কারও সঙ্গে কখনো এমন কিছু করতে পারে ? কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের কাজ এটা ? আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না মা। মনে হচ্ছে ওটা একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ছিল... বাস্তবে কেউ অমন কিছু করতে পারে...!' নদীর চোখে মুখে যেন এখনো সেই আতঙ্ক লেগে আছে। সে ব্যাগটা কাঁধে নিতে নিতে বলল, 'একবার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এর পরের বার কী করবে কে জানে ? ওই পরিস্থিতিতে কেউ না পড়লে তাকে বোঝানো যাবে না, মা। তুমিও বুঝবে না। ভাবলে এখনো আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।'

শায়লা বেগম আর কথা বললেন না। তবে নদীর চোখে মুখে ফুটে ওঠা ভয়টা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সেই রাতে বাসায় ফেরার পর বেশ কয়েকদিন আর কারও সঙ্গে কথা বলে নি নদী। ঘর থেকেই বের হয় নি সে। শায়লা বেগম তখন নীতুকে নিয়ে হাসপাতালে। অ্যাবরশন করাতে গিয়ে হঠাৎ করেই কিছু জটিলতা দিখা দিয়েছিল নীতুর। ফলে নদীর সঙ্গে ঠিকঠাক কথাও হচ্ছিল না তার। দিন তিনেক পর নীতুকে নিয়ে বাসায় ফিরে তিনি ঘটনা শুনলেন। নীতু ততদিনে পুরোপুরি অন্য এক মানুষ। নির্জীব, নিস্পন্দ। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে।

একই অবস্থা নদীরও। শায়লা বেগম ভেবেছিলেন, নীতুর এই ভয়ানক সময়ে নদী তাকে সর্বস্ব দিয়ে আগলে রাখবে। যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টো। নদীও যেন তার চারপাশে খোলস তুলে দিয়ে শামুকের মতো ভেতরে গুটিয়ে গেল। সেও আর ঘর থেকে বের হলো না। কারও সঙ্গে কথা বলল না। তার ফোনও বন্ধ।

নদীর কাছে সব শুনেও শায়লা বেগম কেন যেন গুরুতর কোনো সমস্যা খুঁজে পেলেন না। লোকটা তো তার কোনো ক্ষতি করে নি! বরং রায়হান তাকে ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। তাহলে এত ভেঙে পড়ার কী আছে ? নদী অনেক চেষ্টা করেও মাকে বোঝাতে পারল না। তবে দিন দুই বাদে সে বুঝল, রায়হানকে শায়লা বেগমের ভারি পছন্দ। তিনি চান রায়হানের সঙ্গে কিছু একটা হোক তার। বিষয়টা নিয়ে খুব একটা দেরিও করতে চান না তিনি। নীতুর ঘটনা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

এবং পুরো ঘটনায় রায়হানের কোনো দোষও দেখেন না শায়লা বেগম। বরং সে নদীর সঙ্গে ছিল বলে অনেকটাই নির্ভার বোধ করছেন তিনি। ছেলেটাকে দেখে কখনোই অন্যরকম কিছু মনে হয় নি। বরং কেমন শান্ত, ভদ্র, স্থির। আজকাল এ ধরনের ছেলে দেখাই যায় না। মিডিয়াতে তো আরও না। কিন্তু নদীর যে কী হলো! সেই রাতের ওই

সময়টুকু যেন তার বুকের ভেতরটা সমূলে নাড়িয়ে দিল। একটা ভয়াল দুঃস্বপ্নের মতো ওই সময়টুকু। যা সে মুহূর্তের জন্যও মাথা থেকে তাড়াতে পারে না।

রায়হান তাকে খুঁজতে বাড়ি অবধি এল। কথা বলতে চাইল। কিন্তু নদী তার সঙ্গে দেখাই করল না। সে কেবল জানিয়ে দিল, তার শরীর খারাপ। আপাতত কিছুদিন কোনো কাজই করতে পারবে না সে। এরপরও বেশ কিছুদিন এল সে। কিন্তু নদী একদম চুপ। তবে সপ্তাহখানেক যেতে নিজ থেকেই রায়হানের সঙ্গে যোগাযোগ করল নদী। দুটি নাটকের শুটিং অসমাপ্ত ছিল। সে সেই অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করে দিয়ে এল। এই পুরোটা সময়ে সেটের কারও সঙ্গেই কথা বলে নি নদী। তবে শেষ দিন শুটিং শেষে রায়হান হঠাৎ বলল, 'তুমি আর আমার সাথে কাজ করবে না, নদী ?'

নদী তার ব্যাগ গোছাচ্ছিল। সে খানিকটা এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আপাতত না।'

'কেন ?'

'তেমন কোনো কারণ নেই।'

'কেমন কারণ আছে ? আমি সেটাই জানতে চাই।'

'আপনার সাথে কাজ করতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে।' নদী এবার সরাসরিই বলল।

খানিক চুপ করে থেকে রায়হান বলল, 'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বাট গড সয়্যার, ওই রাতে ওখানে ওরকম কিছু ঘটতে পারে ওটা আমার ধারণাতেই ছিল না। আগে থেকে কিছুই জানতাম না আমি। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কী করা উচিত! উনি কেবল আমাকে বলছিলেন যে, তোমার অভিনয় নিয়ে তোমার সাথে সরাসরি কথা বলতে চান।'

নদী কিছু বলল না। সে ব্যাগ গুছিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রায়হান আচমকা নদীর হাত চেপে ধরল। তারপর বলল, 'আমি সরি নদী। আমি জানি যা হয়েছে, সেটা কোনোভাবেই আমি রিকভার করতে পারব না। বাট আই ক্যান টেল ইউ সামথিং ভেরি স্পেশাল...।'

নদী কিছু না বললেও ফিরে তাকাল। রায়হান নতমুখে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটা জড়তা, দ্বিধা তার শরীরজুড়ে। যেন কথাটা কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারছে না সে। নদী বলল, 'জি। বলুন।'

রায়হান নদীর দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে ভেঙে পড়া মানুষের প্রতিচ্ছবি। সে সেই প্রতিচ্ছবির ভেতর থেকেই গাঢ় গলায় বলল, 'আমি অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু প্রত্যাখ্যানে আমার খুব ভয়।' বলে ঢোক গিলল সে। তারপর বলল, 'ফলে আর বলা হয় না। কিন্তু আমি জানি তুমি বিষয়টা টের পাও। বুঝতে পারো। পারো না ?'

নদী ব্যাগ রেখে রায়হানের মুখোমুখি দাঁড়াল। ঋজু, কঠিন। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'হু, বুঝি। মানে বুঝতাম। আর বুঝতাম বলেই সেদিনের ওই ঘটনাটা এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারছি না। কিছুতেই না।'

রায়হান কথা না বললেও প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইল। নদী বলল, 'যাকে আপনি ভালোবাসেন, সেই মানুষটাকে আপনার সামনে বসে কেউ ওভাবে অপমান, অপদস্থ করল, আর আপনি তা সিনেমার দর্শকদের মতো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ? টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করলেন না! বিষয়টা অদ্ভুত না ?'

রায়হান যেন কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু নদী তাকে বলতে দিল না। তার আগেই সে বলল, 'কে কাকে কতটুকু ভালোবাসে তার ওপর সম্পর্ক নির্ধারিত হয় না। সম্পর্ক নির্ধারিত হয় কে কাকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে তার ওপর। ভালোবাসাহীন শ্রদ্ধার সম্পর্কও টিকে যেতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসার সম্পর্ক কখনো টেকে না।'

বলে সামান্য থামল নদী। রায়হান চুপ। নদীই আবার বলল, 'মিথ্যে বলব না। মানুষ হিসেবে আপনি কিংবা আপনার আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। একধরনের প্রবল অনুভবও হয়তো দিয়েছিল। কিন্তু ওইদিন, ঠিক ওই ভয়ংকর মুহূর্তে, আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, আমার সম্মানের চেয়েও সম্ভবত অন্য অনেক কিছু আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হতে পারে সেটা আপনার নাটক বা সিনেমার ইনভেস্টমেন্ট। ক্যারিয়ার, অপারচ্যুনিটি। কিংবা অন্যকিছু। কিন্তু যেই মানুষটার কাছে আমার সম্মানের চেয়ে অন্য অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তাকে আমি কী করে শ্রদ্ধা করব ? আর শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসা কখনোই টেকে না।'

রায়হান হয়তো কিছু বলত। হয়তো মনে মনে কিছু একটা গুছিয়ে নিয়েছিল সে। কিন্তু নদী তাকে সেই সুযোগটুকুও দিল না। গাড়িতে উঠে বসল সে।

শায়লা বেগম এখনো এত কিছু জানেন না। তবে তিনি প্রায়ই নদীকে বলেন রায়হানের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক করে নিতে। তিনি চান এই সম্পর্কের একটা পরিণতি হোক। কিন্তু নদী একরোখা এক মানুষ। সে নানা কারণেই রায়হানের কাছে কৃতজ্ঞ। এটা মেনে নিয়েই সে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ওই রাতের ভয়ংকর স্মৃতি সে কখনোই ভুলতে পারবে না।

নদীর অবশ্য মাঝে মাঝেই মনে হয়, সেদিন সে যতটা ভয় পেয়েছিল, তার পেছনে নীতুর ঘটনা কিংবা নীতুকে নিয়ে তার প্রবল দুশ্চিন্তাও হয়তো কোনো না কোনোভাবে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু সেই অন্যকিছুটা কী ? ওই কুতকুতে কালো চোখের, কুৎসিত চেহারার ভয়ংকর মানুষটা ? লোকটার চেহারা এই জীবনে কখনো ভুলবে না নদী। অমন ভয়ালদর্শন একজন মানুষ, তারচেয়েও ভয়ালদর্শন তার বেশভূষা ও আচরণ। ওই মানুষটা তার ভেতরটা ভেঙেচুরে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

এই জীবনে লোকটাকে আর কখনোই দেখতে চায় না সে।

নীতুর অপারেশন হয়েছে আজ বেশ কিছু দিন। এই সময়ে সে খুব প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলে নি। ঘর থেকেও বের হয় নি। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নি। ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষাও দেয় নি। তবে মাঝে মাঝে ছাদ বা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। এই সময়টা খুব অদ্ভুত লাগে। বিশেষ করে ছাদের সময়টা। ছাদের মেঝেটা ঝকঝকে, মসৃণ। সেখানে প্রায়ই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে সে। তার মাথার ওপর থাকে অনন্ত আকাশ। ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে এত ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ মনে হয় নীতুর! মনে হয়, ওই বিশাল, বিপুল, অন্তহীন আকাশের বুকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বিন্দু সে। তারপর হঠাৎই দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকে তার। মনে হতে থাকে একনাগাড়ে কোনো এক মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে সে। কিংবা পড়ে যাচ্ছে অতলান্ত কোনো গভীরে। এই পতনের কোনো শেষ নেই। যেন অনন্তকাল ধরেই পড়তে থাকে সে। পড়তেই থাকে।

ঘুমের ঘোরে একটা স্বপ্নও দেখে নীতু। স্বপ্নে ধু-ধু বিরান এক প্রান্তরে সে দাঁড়িয়ে থাকে। একা। তার আশপাশে কোথাও কেউ নেই। কেবল দূর কোনো অচিনপুর থেকে সকরুণ এক কান্নার স্বর ভেসে আসতে থাকে। ওই কান্নার শব্দটা তার বুকের ভেতর ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো বিঁধে যেতে থাকে। তারপর ফালি ফালি করে চিরে দিতে থাকে বুকের গহিন কোণ। তখন খুব যন্ত্রণা হয় নীতুর। আবার ভালোও লাগে। কান্নার ওই শব্দটুকু শোনার সময় একটা অব্যাখ্যেয় আনন্দ হয় তার। কিন্তু আজ বেশ কিছুদিন হলো ওই শব্দটা আর শুনতে পায় না সে। শব্দটা কি তবে তার মাথা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ?

আচ্ছা, সে কি অসুস্থ ? এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে ? নীতুর হঠাৎ মনে হলো, সে সুস্থ হতে চায় না। কান্নার ওই শব্দটুকু শোনার জন্য হলেও সে অসুস্থ থাকতে চায়।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ ফোন খুলল নীতু। বহুদিন পর। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চমকে দিয়ে ফোনটা বাজল। বেশ খানিকটা সময় স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নামটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। অন্ত ফোন করেছে! প্রথমে মনে হলো ভুল কিছু দেখেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল, ভুল নয়, সত্যি সত্যিই অন্ত ফোন করেছে। তবে একটা বিষয়ে খুব অবাক হলো নীতু। ফোনটা তার ধরতে ইচ্ছে করছে না এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে অন্তর প্রতি কোনো অনুভূতিই অনুভব করছে না সে। না রাগ, ক্রোধ বা ঘৃণা। না অভিমান বা অন্য কিছু। কেবল অদ্ভুত এক নির্লিপ্ততা এসে যেন ছেয়ে রেখেছে তাকে।

ফোনটা কতবার বাজল নীতুর খেয়াল নেই। তবে শব্দটা বন্ধ করে ফোনটা বালিশের তলায় রেখে দিল সে। বাইরে তখন মেঘলা আকাশ। একটা ভেজা শীতল হাওয়া। হয়তো কাছেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। সেই হাওয়া শরীরে মেখে জানালায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে রইল সে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বুঝলই না। নীতুর ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। বৃষ্টির ছাটে প্রায় অর্ধেকটা শরীর ভিজে গেছে তার। নদী এসে তাকে ডেকে তুলল। বলল, 'এ কী, ঘুমাচ্ছিস তুই ? শরীর খারাপ নাকি ?'

নীতু বলল, 'উঁহু। অনেক রাত হয়ে গেছে ?'

নদী জবাব দিল না। তবে শান্ত গলায় বলল, 'এভাবে কেউ ঘুমায় ? জ্বর বাঁধাবি তো!'

নীতু ধীরে উঠল। আসলেই ভিজে একশা হয়ে গেছে সে। বাইরে এমন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল অথচ কেউ তাকে ডাকল না ?

নদী বলল, 'বাবার শরীরটা আবার খারাপ করেছে। মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি বাইরে থেকে ফিরে ঘুমিয়ে গেছিলাম। আর তুই নিজের খেয়ালটুকু নিজে রাখতে পারিস না ?'

নদীর সঙ্গেও কত দিন কথা হয় না নীতুর। হঠাৎ করেই তারা সবাই যেন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ বছরখানেক আগেও এই বাড়িটা কেমন আনন্দে ঝলমল করত। একটা অকপট উচ্ছ্বাস উড়ে বেড়াত চারপাশে। নদী বলল, 'এভাবে আর কত দিন ? অ্যাডমিশন টেস্টগুলোও দিলি না ?'

নীতু কথা বলল না। উঠে বাথরুমে গেল। লম্বা সময় নিয়ে গোসল করল। তারপর সামান্য কিছু খেয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই ফোনটা চোখে পড়ল তার। শব্দহীন ফোনের স্ক্রিনজুড়ে আলো জ্বলছে, নিভছে। নিভছে, জ্বলছে। সে আড়চোখে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল, অন্তর ফোন! অন্ত কি তবে সেই বিকেল থেকেই ফোন করে যাচ্ছে ? নীতু ফোনটা হাতে নিল। ফোনজুড়ে অসংখ্য মিসড কল আর মেসেজ। তার মানে একনাগাড়ে ফোন করে যাচ্ছে অন্ত!

খানিক অবাক হলেও ফোন ধরা কিংবা মেসেজ পড়া কোনোটাতেই আগ্রহ পেল না নীতু। সে ভাবছিল ফোনটা অফ করে রাখবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেসেজটা এল। নীতু ফোনের অফ বাটনটা চাপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল। মেসেজের প্রিভিউতে প্রথম লাইনটা দেখা যাচ্ছে। অন্ত লিখেছে, 'তুই কি প্লিজ একবার বারান্দায় এসে...।'

বাকিটুকু দেখতে হলে মেসেজটা পুরো খুলে দেখতে হবে। কিন্তু নীতু খুলল না। সে বরং ফোনটা বন্ধ করে বালিশের তলায় রেখে দিল। তারপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্তর বিষয়টা মাথা থেকে পুরোপুরি তাড়িয়ে দিতে চাইছে সে। চোখ বন্ধ করে জনমানবহীন সেই বিরান প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে। যেখানে হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। দূর থেকে কোনো অশথের পাতা ভেসে আসবে সেই হাওয়ায়। সঙ্গে ভেসে আসবে সকরুণ এক কান্নার সুর। কার কান্না ?

নীতু জানে না। কিচ্ছু জানে না। এক অসহনীয় সুতীব্র যন্ত্রণা তাকে হঠাৎ এলোমেলো করে দিতে লাগল। ওই কল্পিত কান্নাটুকু তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় বিবশ করে দেয়। অথচ তারপরও কেন যেন ওই কান্নাটুকু শোনার জন্যই সে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু আজ কিছুতেই ওই কান্নার শব্দটুকু ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে, অশথের পাতার সঙ্গে ভেসে এল না। দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও ওই স্বপ্নটাতে ঢুকতে পারল না সে।

শেষরাতের দিকে নীতু বিছানায় উঠে বসল। বাইরে তখন আবারও তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুহুর্মুহু বজ্রপাত হচ্ছে। সে সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামল। তারপর অন্ধকার হাতড়ে বারান্দার দরজাটা খুলল। বাইরে ল্যাম্পপোস্টের ভেজা হলুদ আলো। সেই আলোয় ফুটপাতের বন্ধ চায়ের দোকানের সামনে একটি বেঞ্চি ভিজে যাচ্ছে। সেই বেঞ্চির ওপর ভিজে যাচ্ছে একটা মানুষও। মানুষটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। সে চুপচাপ ভিজে যাচ্ছে। তুমুল বজ্রপাত আর বিদ্যুৎ চমকে শেষরাতের ঘুমন্ত শহরও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু মানুষটা স্থির, নিশ্চুপ। নীতু খোলা দরজা পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল না। দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে, আড়ালে। সেখান থেকেই মানুষটাকে দেখতে লাগল সে। এই জনমে ওই মানুষটার মুখোমুখি আর কখনো হতে চায় না সে। কখনোই না।



নদীর ব্যস্ততা আবার বেড়েছে। সে ভেবেছিল রায়হান হয়তো তার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকবে। নানাভাবে যন্ত্রণা দিবে। কিংবা ফজলু মিয়াও হয়তো ক্ষেপে গিয়ে কিছু করে ফেলতে পারে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। বরং পুরোপুরি চুপ হয়ে গেল রায়হান। প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল সে। তবে তা মোটেও নদীর বিরক্তি বা অস্বস্তি তৈরি করে নয়। বরং সংযতভাবেই। মানুষটার মধ্যে দারুণ পরিমিতিবোধ রয়েছে। একই সঙ্গে যথেষ্ট সংবেদনশীলও সে। হয়তো এসব কারণেই রায়হানের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা ভালোলাগাও তার তৈরি হয়েছিল।

সঙ্গে খানিক ভালোবাসাও কি ?

এই প্রশ্নটা নিজেকে বেশ কয়েকবার করেছে নদী। গত প্রায় ছমাস রায়হানের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই তার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই সময়টায় আলাদা করে কখনো রায়হানের কথা মনেও পড়ে নি। মুহূর্তের জন্যও মিস করে নি তাকে। অথচ একসঙ্গে কত কত সময় তারা কাটিয়েছে! তাহলে ওই ভালোলাগাটুকু আসলে কী ছিল ? ঠিক কী কারণে ভালোলাগার ওই অনুভবটুকুকে ভালোবাসা অবধি নিয়ে যেতে চাইছিল নদী ? যদি সত্যিকার অর্থেই সেখানে গভীর, স্পর্শময় কিছু থেকে থাকত, তাহলে সেটিই আবার কেমন করে এমন আড়ালে-অগোচরে চট করে মিলিয়ে গেল ?

নদী অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই আরও অনেকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেল। ফলে ধীরে ধীরে তার ব্যস্ততা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি পরিচিতিও। সেদিন শুটিংয়ের ফাঁকে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। দুপুরের খাবারের বিরতি চলছিল। সে সময় ইউনিটের এক ছেলে এসে বলল নদীর সঙ্গে দুজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। শুনে খুবই অবাক হলো নদী। এর আগে কখনো এমন হয় নি। মাঝবয়সী ভদ্রলোক দুজন কারা ?

খাওয়া শেষ করে তড়িঘড়ি বাইরের ঘরে এসে অর্ধেক টাক মাথা ভদ্রলোককে দেখে হকচকিয়ে গেল সে। ত্বরিত উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে গেল, 'স্যার আপনি ?'

ভদ্রলোক অবশ্য নদীকে পা ছুঁতে দিলেন না। দুহাতে কাঁধ ধরে টেনে তুললেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে যখন টিভিতে দেখি, খুব ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে। কেমন আছ তুমি ?'

'ভালো স্যার। আপনারা সবাই ভালো ?'

'এই তো, আছি কোনোরকম।' ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ পাল। তিনি নদীদের কলেজের কালচারাল একাডেমির নাটক বিভাগের শিক্ষক। আলাদা করে থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত। কলেজের শেষের দিকে কিছুদিন সেই থিয়েটারে কাজও করেছিল নদী। আশুতোষ পাল বললেন, 'একটা বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।'

'কী বিপদ স্যার ?'

'আমাদের একটা থিয়েটার আছে, তুমি তো জানোই ? কলেজে থাকতে ওখানে বেশ কিছুদিন কাজও করেছিলে তুমি।'

'জি স্যার। স্বপ্নমঙ্গল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' নদী চট করে থিয়েটারের নামটা বলে ফেলায় আশুতোষ পাল খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'বেশ পুরোনো থিয়েটার হলেও নানা কারণে দলটাকে সেভাবে দাঁড় করাতে পারি নি আমরা। তাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যা চলত। কিন্তু এই মোবাইল, ফেসবুক, ইউটিউব, নেটফ্লিক্সের যুগে থিয়েটারের নাটক দেখার সময় কই মানুষের ? এদের যন্ত্রণায় তো টেলিভিশনের অবস্থাই যায় যায়।'

নদী ম্লান হাসল, 'এটা অবশ্য ঠিক স্যার। সবার মধ্যেই একটা অস্থিরতা কাজ করছে। তা ছাড়া অনেক মাধ্যম হলে যা হয় আর কী!' সে বুঝতে পারছে না, আশুতোষ স্যার আসলে কী বলার জন্য তার কাছে এসেছেন।

আশুতোষ স্যার বললেন, 'এতকিছুর মধ্যেও আমাদের বিভূতি বাবু থিয়েটারটাকে আগলে ধরে ছিলেন। আমাদের মতো এত বৈষয়িক তো আর তিনি কখনোই হতে পারেন নি। যা ভালোবাসতেন, কেবল তা-ই আগলে ধরে থাকতেন। ওই এক থিয়েটার থিয়েটার করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। তা লাভ হলো কী তাতে ? না কোনো বড় অভিনেতা তৈরি করতে পারলেন, না থিয়েটারটাকে সেল্ফ সলভেন্ট করতে পারলেন!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আশুতোষ পাল। তারপর বললেন, 'বিভূতি বাবুকে চিনেছ তো ?'

'জি স্যার। স্বপ্নমঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের সময়ে উনিই নাটকের রিহার্সেল করাতেন।'

'হ্যাঁ। সেই মানুষটা এখন মৃত্যুশয্যায়।'

'কী বলছেন স্যার ? কী হয়েছে ওনার ?'

'ক্যানসার। তবে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। হয়তো ভালো চিকিৎসা করাতে পারলে এবারের মতো বেঁচে ফিরতে পারবেন।'

'ওহ!' ম্লান মুখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নদী। সে এখনো বুঝতে পারছে না, এখানে তার করণীয় কী! যদি এমন হয় যে তাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হবে, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সে। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু! আশুতোষ স্যার অবশ্য টাকা-পয়সার কথা কিছু বললেন না। তিনি বললেন অন্য কথা, 'বিভূতিবাবুর চিকিৎসার ফান্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা একটা নতুন নাটক করার কথা ভাবছি। এই নাটকে টিকিটের কোনো

নির্ধারিত মূল্য থাকবে না। যে যত বেশি পরিমাণ টাকা দিয়ে সম্ভব টিকিট কিনবে। মূল উদ্দেশ্য বিভূতিবাবুর চিকিৎসায় কন্ট্রিবিউট করা। বুঝলে ?'

'জি।'

'আইডিয়াটা কেমন ?'

'জি স্যার, ভালো।' নদী এখনো ঘটনা বুঝতে পারছে না। তবে এবার আসল কথাটা বললেন আশুতোষ পাল, 'এখন আমরা চাইছি, নাটকের প্রধান চরিত্রটায় তুমি অভিনয় করো। কেন তোমার কথা বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?'

'কেন ?'

'কারণ তুমি এখন পরিচিত মুখ। খুব পপুলার অ্যাকট্রেস। বুঝতেই পারছ, তোমার ফেসভ্যালুটা আমাদের অনেক হেল্প করবে। ভালো মিডিয়া কভারেজ পাব। দর্শকদের আগ্রহটাও বাড়বে। তা ছাড়া এতদিন পর তুমি আবার থিয়েটারে অভিনয় করবে, বিষয়টা সবার মধ্যে একটা কৌতূহলও তৈরি করবে। কিছু স্পন্সরও হয়তো পেয়ে যাব।' সামান্য থেমে নদীর অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলেন আশুতোষ পাল। তারপর আবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'আমি জানি তুমি অনেক ব্যস্ত, কিন্তু প্লিজ, এই ফেভারটা আমাদের তোমার করতেই হবে।'

নদী না করল না। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল। এর কারণও অবশ্য আছে। প্রথমত, বিষয়টা খুবই মানবিক ও সংবেদনশীল। দ্বিতীয়ত, তার নিজেরও অনেক দিনের ইচ্ছে, থিয়েটারে কোনো একটি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করার। এই সুযোগে সেই ইচ্ছেটাও পূরণ হয়ে যাবে।

সজলের সঙ্গে নদী পরিচয় রিহারসেলে। তবে সেই পরিচয়টা কোনোভাবেই সুখকর কিছু নয়। বরং যথেষ্টই তিক্ত ও বিব্রতকর। এই থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত সে। চারুকলা থেকে পাশ করেছে। দেখতে লম্বা, সুদর্শন। মাথাভর্তি ঘন কালো লম্বা চুল। শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা। কবিতা লেখে। মৃৎশিল্প নিয়ে পড়লেও দুর্দান্ত আঁকার হাত সজলের। জীবন নিয়ে কেমন উদাসীন এক মানুষ! আপাদমস্তক শিল্পী যাকে বলে।

নাটকের সেট ডিজাইনসহ আনুষঙ্গিক আরও অনেক কাজ করছে চারুকলার তরুণ এক দল। তাদের দেখভালের দায়িত্ব পালন করছে সজল। তবে সে কথা বলে কম। রিহারসেলে এসে চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একের পর এক সিগারেট টানে। কারও সঙ্গে খুব একটা কথা না বললেও দলের ছেলেমেয়েরা যে তাকে খুব সমীহ করে, সেটা বোঝা যায়। আশুতোষ পাল কাজটা নিয়ে খুব আন্তরিক। যে-কোনোভাবেই হোক ভালো একটা কাজ করতে চান তিনি। এ কারণেই সজলকে সব সময় আশপাশে চান। তা সজল থাকেও।

এরই মধ্যে কিছু স্পন্সরও জুটে গেছে। পত্রপত্রিকায় নিউজও হচ্ছে। ফলে খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছেন আশুতোষ পাল। নদীর উপস্থিতির কারণে দলের আর সবার

মধ্যে আলাদা একটা উত্তেজনাও তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে বহুদিন পর স্বপ্নমঙ্গল থিয়েটার জুড়ে উৎসব উৎসব ভাব।

কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই নদী আবিষ্কার করল, অন্যরা যেখানে সারাক্ষণ তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, সব আড্ডা-গল্প-পরিকল্পনা তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, সেখানে সজলই একমাত্র ব্যতিক্রম। কেন যেন ছেলেটা তাকে পছন্দ করে না। কিংবা এড়িয়ে চলে। বিষয়টা নিয়ে কেমন অস্বস্তি হতে থাকে নদীর। এতসব প্রাপ্তির মধ্যেও সজলের ওই নির্বিকারত্বটুকু যেন অশান্তির তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়েই বিঁধতে থাকে।

তবে সজল যে চলনে বলনে অন্যদের চেয়ে খানিক আলাদা, তা প্রথম দিনেই বুঝে গিয়েছিল নদী। সে টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ। ফলে প্রথম দিন থেকেই সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে, ছবি তুলতে ছুটে এল। কিন্তু সজল যেন তাকে দেখতেই পেল না। সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বারান্দায় সিগারেট খাচ্ছিল। রিহারসেলের দিনগুলোতে সে নিয়ম করে আসত। কিন্তু কখনোই নদীর সঙ্গে কথা বলে নি সে।

নদী জানে না ঠিক কী কারণে সজল এমন করছে। ফলে সে অবাক যেমন হতো, তেমনি একটা তীব্র কৌতূহলও কাজ করত, সমস্যা কী ছেলেটার ? এমন নয় যে সে নদীর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য। কিন্তু সবাই যখন কথা বলছে তখন সজলের অবস্থা দেখে মনে হতো নদীর সঙ্গে তার কোনো ঝামেলা আছে। অথচ এর আগে কখনো তারা একে অন্যকে চিনতই না। শেষ অবধি নদী নিজে সেধে গিয়েই কথা বলল। সে সরাসরিই প্রশ্নটা করল, 'আপনি কি কোনো কারণে আমার ওপর বিরক্ত ?'

সজল ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমাকে বলছেন ?'

'হু। আপনি ছাড়া তো আর কেউ নেই এখানে।'

'আপনার ওপর আমি বিরক্ত হব কেন ?'

'তা তো জানি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অন্য সবাই ভাবছে উই হ্যাভ সামথিং রং বিটুইন আস...।'

'তা কেন ?'

'এই যে আপনি আমার সাথে কথা বলছেন না। সব সময় কেমন এড়িয়ে চলছেন ?'

'কেন ? আপনার সাথে কথা বলতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে নাকি ?'

নদী থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম যে অন্যরা ভাবছে আপনার সাথে আমার কোনো সমস্যা হয়েছে। না হলে আমরা কেউ কেন কারও সঙ্গে কথা বলছি না ?'

সজল গলগল করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, 'আপনি তো মিডিয়ায় কাজ করেন। সেলিব্রেটি ফেস। আপনাদের মতো কেউ যদি অন্যদের কথাকে এত পাত্তা দেন, তাহলে চলে ?'

'সবারটা তো দেই না।'

পঞ্চম দিন অবশ্য নদীর মন খারাপ হয়ে গেল। সে বের হতে গিয়ে দেখল গেটে কিছু নেই। খানিক থমকে দাঁড়াল সে, একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে নি তো ? তার কি আরও খানিক পরে বের হওয়া উচিত ছিল ? কিন্তু ঘড়ি দেখে নদী নিশ্চিত হলো, প্রতিদিন সে এই সময়েই বের হয়। তাহলে ?

সেই সারাটা দিন আবার অস্থির হয়ে রইল নদী। রইল পরের কয়েকটা দিনও। চাইলেই সজলের নম্বর যোগাড় করে ফোন করা যায়। কিন্তু সে তা চায় না। এই ছেলে বিপজ্জনক। এর থেকে সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু নদী সাবধান থাকতে পারে না। কারণে অকারণে, সময়ে-অসময়ে এই ছেলে তার মাথায় উঁকি দিয়ে যায়। নদীর সন্দেহ, মাথা থেকে সে ক্রমেই মনেও নেমে আসছে। এটা ভয়ংকর। খুবই ভয়ংকর! এই ভুল করতে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু প্রেমে পড়ার ভুল কি কেউ এড়াতে পারে ? জগতের সকল হিসেবনিকেশ সেখানে নিমেষেই নিষ্ফলা হয়ে যায়। নদীরও হলো। অষ্টম দিন সকালে বের হতে গিয়ে সে দেখল একটা ধবধবে সাদা ক্যানভাস। সেখানে কিচ্ছু নেই। কেবল ক্যানভাসের ওপর সুন্দর করে লেখা, 'নিশ্চয়ই মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কী করব বলুন ? টাকা ফুরিয়ে গেছে। আর আজকাল বাজারের যা অবস্থা! রং আর তুলির দাম যেন ছবির শিল্পমূল্যের চেয়েও বেশি!'

নদী জানে না কেন, সেই প্রথম তার মনে হলো এই ছেলেটার সঙ্গে সে কথা বলতে চায়। অনেক অনেক গল্প করতে চায়। খুনসুটি, ঝগড়া করতে চায়। সে তাকে যতই বলুক তার অভিনয় কিচ্ছু হয় না, তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু কীভাবে কথা বলা শুরু করবে সে ? যে ঠোঁটকাটা ছেলে, কখন কী বলে বসে তার ঠিক নেই। নদী তারপরও সজলের নম্বর সংগ্রহ করল। তারপর খুব ভেবেচিন্তে একদিন মেসেজ পাঠাল তাকে, 'আপনি যে আপনার ছবিগুলোর দাম চাইছেন, সেটা স্পষ্ট করে বললেই হতো। অত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার তো কিছু ছিল না। ছবির দাম কত বলুন ? আর কীভাবে টাকা পাঠাতে হবে তাও...'।

মেসেজ পাঠানোর পর থেকে প্রবল অস্থিরতায় সময় কাটতে লাগল তার। কী রিপ্লাই করবে সজল ? সজল অবশ্য সেই রাতে রিপ্লাই করল না। সারা রাত একটা ভয়াবহ অস্বস্তি নিয়ে কাটল নদীর। ভোররাতের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল তার। জানালা গলে ভোরের আলো আসতেই চোখ মেলে তাকাল। ফোনের স্ক্রিনে সজলের মেসেজ। সে মেসেজটা পড়ল। সজল লিখেছে, 'টিভিতে অভিনয় করলেই যে পণ্যমূল্য আর শিল্পমূল্যের পার্থক্য বোঝা যাবে না, এমন তো কোনো কথা নেই! ওখানে ছবির মূল্যের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে ছবির শিল্পমূল্যের কথা। তো শিল্পির শিল্পমূল্য সম্পর্কে ধারণা আছে তো ?'

এবার আর দমে গেল না নদী। সে লিখল, 'যেই শিল্পী মনে করে শিল্পের শিল্পমূল্যের তুলনায় রঙতুলির দাম বেশি, তার সম্পর্কে অন্যরা আর কী ভাববে বলুন ?'

দুজনের এই বার্তাযুদ্ধ চলতেই থাকল। আর তার আড়ালে হয়তো জমতে থাকল সম্প্রীতির গল্পও। নদী একদিন হুট করেই আশুতোষ পালকে ফোন করে বলল, সে আবার রিহারসেলে যাবে। গেলও। পরদিনই সজলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। তবে সজল যথারীতি দূরে বসে রইল। আশুতোষ পাল এসে সজলকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন নদীর সামনে। তারপর বললেন, 'সরি বলো। কোনো তর্ক না, স্ট্রেট সরি বলো। তোমার কারণে নাটকটা এতদিন পিছিয়ে গেল।'

সজলকে অবশ্য সরি বলতে হলো না। তবে সে নিজ থেকেই সেদিন রিহারসেল শেষে নদীর কাছে এল। তারপর দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে রইল। বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। ওই চুপচাপ বৃষ্টিস্নাত দীর্ঘ সময়টুকুতে কী ছিল কে জানে!

নদী হঠাৎ বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি ফিরব কী করে ?'

সজল বলল, 'আমি পৌঁছে দেই ?'

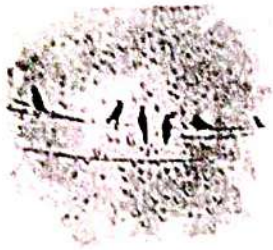
'আপনি কেন পৌঁছে দিবেন ?'

'ওই যে সরিটাও যে বলতে হয় নি তার ঋণ শোধ হিসেবে।'

নদী খানিক চুপ করে বলল, 'আর ছবির মূল্য শোধ ? ওটাও তো ঋণই নাকি ?'

সজল আচমকা বলল, 'সব ঋণ শোধ করতে নেই। কিছু ঋণ ইচ্ছে করেই সারা জীবন রেখে দিতে হয়। বারবার চাওয়া যাবে বলে।'

ওই ছোট্ট একটুকু কথা, 'সব ঋণ শোধ করতে নেই। কিছু ঋণ ইচ্ছে করেই সারা জীবন রেখে দিতে হয়। বারবার চাওয়া যাবে বলে', ওই কথাটুকু মাথায় গেঁথে রইল নদীর। কে জানে, হয়তো কোনো অগোচরে টুপ করে নেমে আসতে লাগল মাথা থেকে মনেও।



খলিফার মা রাজিয়া থমথমে মুখে বসে আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেলাল। হেলালের হাতে বড় বড় রূপচাঁদা। এই মাছ এসেছে খুলনা থেকে। ফজলু মিয়া মাছের নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। রাজিয়া বলল, 'আমরা এই মাছ খাই না।'

'কী মাছ এইটা জানেন ?'

'জানি। রূপচান্দা মাছ।'

'এই মাছ কই থাকে, সেইটা জানেন ?'

'জানি।'

'কই ?'

'সাগরে।'

'তো সাগরের মাছ আগে কখনো খাইছেন ?'

'না।'

'আগে কখনো না খাইলে বুঝবেন কেমনে যে খাইবেন নাকি খাইবেন না ? আগে তো খাইয়া দেখবেন, নাকি ? তারপর না ভালো-মন্দ বুঝবেন।'

'ভালো-মন্দ বোঝন লাগতো না। আমরা এই মাছ খাই না।'

হেলালের খুবই বিরক্ত লাগছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। তাকে পাঠিয়েছে ফজলু মিয়া। ফজলু মিয়ার কথার নড়চড় করার সাধ্য তার নেই। তবে এই মুহূর্তে সে বিরক্ত অন্য কারণে। আজ অনেক দিন পর আফিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কাজের চাপে আফিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগই পায় না সে। আজ যেহেতু পেয়েছে, সেহেতু কোনো ফাঁকে একটু নিরিবিলি কথা বলতে চায়। কিন্তু রাজিয়ার ভাবভঙ্গি সুবিধার না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সেই সুযোগ সে পাবে।

হেলাল বলল, 'খলিফারে কাজে পাঠান নাই কেন ?'

'তার শইল ভালো না।'

'কী হইছে ?'

'জ্বর।'

'জ্বর হইছে কেন ?'

'পানির কাম করতে গিয়া জ্বর হইছে। ডাক্তারে কইছে সে আর পানির কাম করতে পারবো না।'

'তার মানে কী ? সে আর কাজে যাইবো না ?'

'আপনেগো কাম তো সব পানির। এহন পানির কাম না করতে পারলে কী করবো ?'

হেলাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আফিয়া ঘরে ঢুকল। সে সরাসরিই হেলালকে বলল, 'আপনের সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

হেলাল একটু অবাকই হলো। আফিয়ার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের একটা ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক। তবে সেটা কখনোই প্রকাশ্য নয়। বরং অনেক বেশি আড়ালের-আবডালের। হেলালের ধারণা, আফিয়া ভুল জায়গায় ভুল ফুল হয়ে জন্মেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ সে এভাবে তার সামনে এসে দাঁড়াল দেখে খুবই অবাক হলো হেলাল। আফিয়া বলল, 'মা, তুমি একটু ওইদিকে যাও, তার সাথে আমার কথা আছে।'

হেলালকে অবাক করে দিয়ে রাজিয়া চলে গেল। হেলাল বলল, 'ঘটনা কী ?'

আফিয়া শক্ত গলায় বলল, 'ঘটনা কী সেইটা তো আপনে বলবেন।'

'আমি কী বলবো ?'

'খলিফারে কামে নিছেন কেন ?'

'সেইটা আমি কি জানি ? মিয়াভাই নিতে বলছে। আর তাতে অসুবিধা কী ? অসুবিধা তো কিছু হইতেছে না।'

'আপনের মিয়াভাইরে আপনে চেনেন না ? সে অযথা কারও উপকার করে না। সেইটার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণ আছে। সেই কারণটা কী আপনে বলেন ?'

'আমি কী বলব ? মিয়াভাই আমারে বলল, আমি তোমার মায়রে বইলা খলিফারে নিয়া গেলাম। আর তুমি এইখানে রাগের কী দেখতেছো ? খলিফা এই বয়সে কী কাজ করতো ? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো। আর এহন সে মিয়াভাইর সাথে থাকে। কোনো কাজ করুক আর না করুক, মাস শেষে বেতন খাড়া।'

'সেইটাই তো চিন্তার বিষয়। কোনো কাজ না কইরাই সে এত টাকা-পয়সা পাইতেছে। সময়ে-অসময়ে মাছ পাঠাইতেছেন। বেশি ভালো তো ভালো না। ঘটনা খুইলা বলেন। আমার কি আপনের মিয়াভাইর কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়া ভুল হইছিল ?'

'ধুর। ভুল হইবো কেন ? আর ওইটা তো বহু আগের কথা। বছর পার হইয়া আসলো।'

'হোউক বছর। কিন্তু চাইছিলাম তো ?'

'তুমি তো আর তার কাছে চাও নাই। তুমি আমারে বলছিলা, আমি কিছু করতে পারি কি না। তখন আমিই তারে বলছিলাম। সে ব্যবস্থা করছে। কিন্তু খলিফার ঘটনার সাথে তো সেইটার কোনো সম্পর্ক নাই।'

'খলিফার সাথে তাইলে কোনটার সম্পর্ক ? আপনে আমারে খুইলা বলবেন।'

হেলাল খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কি তোমার মায়রে কিছু বলছো ? এর আগেরবার তো সে খুবই খুশি ছিল। কিন্তু এইবার হঠাৎ এমন বদলাই গেল কী কইরা ? কারণ কী ? তুমি তারে কী বলছো ?'

আফিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলল না। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমি মায়রে বলছি যে আমার আব্বায় মনে হয় আর বাঁইচ্যা নাই।'

'এই কথা কেন বলছো ?'

'কারণ সে প্রত্যেকদিন আব্বার অপেক্ষায় থাকে। ওইটা দেখতে আমার ভালো লাগে না।'

'তোমার আব্বায় বাঁইচ্যা নাই, এইটা তোমারে কে বলছে ?'

'আপনারা বলছেন।'

'আমরা বলছি ?' হেলাল যারপরনাই বিস্মিত হলো।

'হুম।'

'কীভাবে ?'

'এই যে, খলিফারে যে আপনেরা নিয়া এত আদর-যত্ন করতেছেন। কাজ না করাইয়াও টাকা-পয়সা দিতেছেন। আপনে আমারে এইরকম বহু ঘটনা আগে বলছেন। হয়তো ভুইলা গেছেন।'

'কী বলছি ?'

'বলছেন যে, আপনের মিয়াভাই যদি কারও বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করে, তাইলে সে চেষ্টা করে তার পরিবার যেন বিপদে না পড়ে। বউ, বাচ্চা যেন ভালো থাকে। আমার ধারণা, আমার বাপরে সে খুন করছে। আর এইজন্যই খলিফারে নিয়া কাজ দিছে।'

আফিয়া থামলেও হেলাল কোনো কথা বলল না। এই মেয়েটিকে সে যতই দেখে, ততই মুগ্ধ হয়। কিন্তু খলিফাকে কাজ দেওয়ার মতো সামান্য এক ঘটনার সঙ্গে এভাবে যোগসূত্র তৈরি করে এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সে পৌঁছে যাবে, এটা হেলাল ভাবে নি। সে বলল, 'এর আগেও তো তোমার আব্বায় অনেক দিনের জন্য নিখোঁজ হইছিলো। তার নামে মামলা হইছিলো। পুলিশ খুঁজলেই তো সে পালায়।'

'সে যেইখানেই থাকুক, আমাগো লগে যোগাযোগ অন্তত করে। কিন্তু এতদিন কখনো যোগাযোগ না কইরা থাকে নাই সে।'

'কিন্তু এইজন্য মিয়াভাই তারে খুন করছে, এই কথা তো তুমি বলতে পারো না।'

আফিয়া হাসল, 'আমরা আসলে কিছুই বলতে পারি না। মিয়াভাই খুন করলেও আমাগো কিছু বলার নাই। না করলেও নাই। সে যদি খলিফারেও খুন করে, আমাগো কী করার আছে ?'

'কী সব বলতেছো তুমি ?'

আফিয়া এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তবে হেলালের হাত থেকে রূপচাঁদা মাছগুলো নিতে নিতে সে বলল, 'আপনে বসেন। আমি বেশি কইরা পেঁয়াইজ দিয়া রূপচান্দা মাছ ভাজি কইরা দেই। খাইয়া যান।'

মাছের বড় চালান এসেছে খুলনা থেকে। ঢাকার বড় বড় রেঁস্তোরাগুলোতে আজকাল সীফুডের বেশ চাহিদা। বিষয়টা চোখ এড়ায় নি ফজলু মিয়ার। ঢাকায় সামুদ্রিক মাছের যে প্রচলিত যোগান, ফজলু মিয়া তার বাইরে নিজস্ব একটা পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করছে। তার এই বিকল্প পদ্ধতি ইতিমধ্যেই মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তারা ফজলু মিয়ার কাছ থেকে বাকিতে পাইকারি মাছ কেনে। তারপর খুচরা বাজারে সেই মাছ বিক্রি করে তাকে টাকা দেয়। ফজলু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে নৌকার গলুইয়ে। তার পাশে হেলাল। হেলাল বলল, 'খলিফার বিষয়টা কী করব মিয়াভাই ?'

'কী করব মানে ?'

'খলিফার মায় বলছে, সে খলিফারে আর কামে দিবো না।'

ফজলু মিয়া ঝট করে তাকাল, 'কেন ? কামে দিবো না কেন ?'

হেলাল কথা বলল না। চুপচাপ মাথা নামিয়ে নিল। ফজলু মিয়া বলল, 'কোনো সমস্যা ?'

'সে মনে হয় কোনোভাবে কিছু সন্দেহ করছে। এইভাবে আমাগো সরাসরি তারে টাকাপয়সা দেওয়া মনে হয় ঠিক হয় নাই। তা ছাড়া এত অল্পবয়সে খলিফারে এইভাবে কামে আইনা এত সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় অন্যরাও কেউ বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নেয় নাই। সেই থেকেই মনে হয় কানাকানি, ফিসফাস।'

'তুই এক কাজ কর। আইজ রাইতে তারে এইহানে নিয়ায়।'

বুড়িগঙ্গায় ভাসমান হোটেল আছে। বজরার মতো বড় নৌকা। নদীতে বিভিন্ন পেশায় কাজ করা লোকজন সেই নৌকায় খায়। বাইরের লোকজনও আসে। রাতে সেই নৌকায় খেতে বসেছে ফজলু মিয়া। তার পাশে রাজিয়া বসা। ভয়ে তার চোখজোড়া প্রায় কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসছে। ফজলু মিয়া ভাতের গ্রাস মুখে পুরতে পুরতে বলল, 'তুমি নাকি খলিফারে আর কাম করতে দিবা না ?'

রাজিয়া কথা বলল না। সে ফজলু মিয়া সম্পর্কে এ কদিনে যা শুনেছে, তাতে তার মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার নেই। এই এলাকায় এতবছর থেকেও যে সে এই লোকের কথা জানত না, এতে ভারি অবাক হয়েছে রাজিয়া। আগে জানলে কোনোভাবেই খলিফাকে এখানে কাজে দিত না সে। প্রয়োজনে এলাকা ছেড়ে পালাত। ফজলু মিয়া বলল, 'কও, ঠিক কী কারণে তুমি তারে কামে দিবা না ? তার মজুরি কম হইতেছে ?'

রাজিয়া চুপ। ফজলু মিয়াই বলল, 'মজুরি কম হইলে সেইটা কও। অন্য কোনো অসুবিধা থাকলে সেইটাও কও। কিছু না কইলে কেমনে হইবো ?'

রাজিয়া আচমকা ফজলু মিয়ার পা জড়িয়ে ধরল। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ফজলু মিয়া গা সরিয়ে নিল না। ভাত খাওয়াও বন্ধ করল না। সে যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে ভাত খেতে লাগল। তার মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা গেল না। রাজিয়া এবার আরও শব্দ করে কান্না শুরু করল। ফজলু মিয়া ভাত খাওয়া শেষ করে ভাতের প্লেটে হাত ধুলো। তারপর লুঙ্গিতে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'খালি কানলে হইবো ? কান্দনের কারণও তো কইতে হইবো। নাকি ?'

'আমার খলিফারে আপনে মাফ কইরা দেন।'

'খলিফারে মাফ করব কেন ? সে অপরাধ কী করছে ?'

'সে অপরাধ করে নাই, অপরাধ করছে তার বাপে। তার বাপের অপরাধের জন্য আপনে তার কোনো ক্ষতি কইরেন না। এই দুনিয়ায় সে ছাড়া আমার আর কেউ নাই। আপনে আমার বাপ লাগেন। আপনে আমার...।'

ফজলু মিয়া চোখের ইশারায় রাজিয়াকে সরিয়ে নিতে বলল। তারপর হেলালকে বলল খলিফাকে নিয়ে আসতে। খলিফা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে ফজলু মিয়ার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। ফজলু মিয়া বলল, 'তুই তোর মার কাছে কী কইছোস ?'

খলিফা কথা বলল না। তবে রাজিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হড়বড় করে বলতে লাগল, 'সে আমারে কিছু কয় নাই। সে এইসব কিছু জানেও না। আপনেরে সে খুবই পছন্দ করে।'

'তাইলে কে কইছে ?'

'আপনে নাকি খলিফার বাপেরে খুন করছেন, এই কথা হগলতে কইতেছে। দুই দিন আগে পুলিশও আইছিল। পুলিশ আইসা আমারে জিগাইছে, খলিফারে আমি আপনের ধারে কামে দিছি ক্যান ? ঘটনা কী ?'

'আর কী কইছে ?'

'আর কিছু কয় নাই।'

ফজলু এবার ধমকে উঠল, 'কী কইছে কও।'

'কইছে আপনের নামে নাকি অনেক মামলা আছে। মাডার কেসও আছে। আপনের এই মাছের ব্যবসা নাকি চোখের ধুলা। আবডালে নাকি আপনে অন্য কিছু করেন ?'

'অন্য কী করি ?'

'হেইডা তো আমি জানি না। আমারে খালি কইলো, তাদের কাছে খবর আছে, খলিফার বাপেরে নাকি আপনেই খুন করছেন। খুন কইরা লাশ বুড়িগঙ্গায় ডুবাই দিছেন। এইজন্যই খলিফারে এইখানে আইন্যা কাম দিছেন। আমার পোলাডারে আপনে কিছু কইয়েন না। আপনের পায়ে ধরি। তার বাপে খারাপ লোক হইতে পারে। কিন্তু সে ভালো মানুষ। এইটুকু পোলা...।'

রাজিয়াকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ফজলু মিয়া। হেলালকে চোখের ইশারায় বলল তাকে সরিয়ে নিতে। তারপর বজরার ছাদে খলিফাকে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল সে। অন্ধকার নদীতে নৌকা চলছে। নৌকা কেউ বাইছে না। কেবল বৈঠা ধরে আছে একজন। নৌকা চলছে স্রোতের গতিতে। আকাশজুড়ে এলোমেলো তারা। তবে জোছনা নেই। দূরে শহরের আলো। সেই আলোর অসংখ্য প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে নদীতে। একটা ফুরফুরে হাওয়া। শহর থেকে যত দূরে যাচ্ছে তারা, হাওয়া তত বিশুদ্ধ লাগছে। ফজলু মিয়া আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'আমারে ভয় পাস ?'

খলিফা কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার গলা শুকিয়ে আসছে। হেলাল তাকে নিঃশব্দে পানির বোতল এগিয়ে দিল। ফজলু মিয়া বলল, 'কী ? কথা কস না কেন ? ডরাস আমারে ?'

'হুম।'

'বেশি না কম ?'

'বেশি।'

'কেন ?'

'আপনে আমার বাপেরে খুন করছেন।'

'কেমনে খুন করছি ?'

'রাম দাও দিয়া কোপাই কল্লা কাইট্টা লাশ গাঙ্গে ডুবাই দিছেন।'

'হুম।' বলে চুপ করে গেল ফজলু মিয়া। তারপর লুঙ্গির কোঁচড় থেকে বের করে একটা পান মুখে দিল। আঙুলের মাথায় একগাদা চুন নিয়ে দাঁতের আগায় নিল সে। তারপর বলল, 'তোর বাপরে আমি কেন খুন করব ?'

খলিফা এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ফজলু বলল, 'আমি কাউরে কিছু জিগাইলে সে যদি উত্তর না দেয়, তাইলে আমার রাগ উইঠা যায় বুঝলি ? আর আমার রাগ খারাপ। ক তোর বাপরে আমি কেন খুন করব ?'

'আমার বাপে খারাপ কাম করছিল।' খলিফার গলা কাঁপছে।

'এইটা তুই দেখছোস ?'

'কী ?'

'তোর বাপে যে খারাপ কাম করছে ?'

'নাহ।'

'তাইলে ?'

'মাইনষের কাছে হুনছি।'

'মাইনষের কাছে হুনলেই নিজের বাপেরে নিয়া খারাপ কথা বিশ্বাস করতে হইবো ? বাপ যতই খারাপ হোক, পোলা মাইয়ার কাছে খারাপ হওনের চাইতে খারাপ আর কিছু নাই।'

খলিফা কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'আমি যে তোর বাপরে খুন করছি, এইটা তুই দেখছোস ?'

'নাহ্।'

'তাইলে ?'

'হুনছি।'

'শোন, যেই জিনিস নিজের চোখে দেখবি না, সেই জিনিসে অন্যের কথা বিশ্বাস করবি না। বুঝলি ?'

'তাইলে কার কথায় বিশ্বাস করব ?' ফট করে প্রশ্নটা করল খলিফা।

ফজলু এই কথার উত্তর দিল না। তারা কেরাণীগঞ্জ ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে এসেছে। মূল নদীর পাশ দিয়ে ভেতরের দিকে সরু একটা শাখা নদী চলে গেছে। সেই নদীতে কিছুদূর গিয়ে থামল তারা। তারপর নৌকা থেকে নামল ফজলু। খলিফাকে হাত ধরে নামাল হেলাল। নদীর পার ধরে কিছুদূর হেঁটে যেতেই উঁচু রাস্তা। খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে বেশ বেগ পেতে হলো সবাইকেই। রাস্তার উল্টোদিকে ফসলি জমি। সেই জমির মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। রাস্তার দুধারে বিজলিবাতি লাগানো। তারা নিঃশব্দে সেই বিজলি বাতির নিচ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকল। সামনেই একটা মাজার। মাজারের ভেতরে লোক আছে কি না বোঝা গেল না। তবে ফজলু মিয়া গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে দু তিনজন লোক বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে মাজারের খাদেমও রয়েছে। ফজলু মিয়া জুতা খুলে মাজারে প্রবেশ করল।

পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হেলাল। তাকে হঠাৎ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। সে শক্ত হাতে খলিফার হাত ধরে আছে। ফজলু মিয়া কয়েক কদম গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। হেলালের হাতটা যেন খলিফার হাতে আরও শক্ত করে এঁটে রইল। ফজলু মিয়া অকস্মাৎ হাতের ইশারায় খলিফাকে ডাকল, 'আয়, ভিতরে আয়।'

খলিফা খানিক বিভ্রান্ত বোধ করছে। বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। তা ছাড়া হেলালকে নয়, ফজলু মিয়া ডেকেছে তাকে। বিষয়টাতে একটু ভয়ও লাগছে তার। একবার পেছন ফিরে হেলালকে দেখে নিল সে। মৃদু হেসে অভয় দিল হেলাল। কিন্তু সেই হাসিতেও যেন কিছু একটা ছিল। খলিফা সেটা বুঝতে পারল না। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তারপর সরু করিডর। খানিকটা হাঁটতেই অন্ধকার এক ঘর। সেই ঘরে ঢুকে ফজলু মিয়া দরজা বন্ধ করে দিল। তারা বের হলো দীর্ঘসময় পর। তারপর আচমকা খলিফাকে বলল, 'নিজেরে।'

খলিফা অবাক গলায় বলল, 'কী নিজেরে ?'

'যেই জিনিস নিজের চোখে দেখবি না, সেই জিনিস অন্যের কাছে শুইনা বিশ্বাস করবি না। বিশ্বাস করবি নিজেরে। নিজের কাছে নিজে জিজ্ঞাস করবি, তোর মন কী বলে ? তোর বিচার-বিবেচনা কী বলে ? তারপর তারা যা বলবো, ওইটাই বিশ্বাস করবি। ঠিকাছে ?'

খলিফা মাথা নাড়ল। ফজলু মিয়া বলল, 'এইবার ক তোর বাপ কেমন মানুষ ? সে কি ওইরকম খারাপ কাজ করনের মতো মানুষ ?'

খলিফা খানিক চুপ থেকে ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়াল, 'সে খারাপ মানুষ। এইডা ঠিক আছে। তার অনেক খারাপ খারাপ দোষও আছে। কিন্তু সে ওই কাজ করনের মতো খারাপ মানুষ না।'

ফজলু মিয়া সামান্য বিরতি নিল। তারপর আবার বলল, 'এইবার ক, তুই কি বিশ্বাস করস, আমি তোর বাপেরে খুন করছি ?'

খলিফা এবারও ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়াল, 'নাহ।'

ফজলু মিয়া হাসল। তারপর খলিফার কাঁধে হাত রাখতে রাখতে বলল, 'এহনোও আমারে ভয় পাস ?'

খলিফা মাথা তুলে ফজলু মিয়ার দিকে তাকাল। তারপর তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'না।'

ফজলু মিয়ার হাসি আরও খানিক বিস্তৃত হলো। তারা নৌকায় ঘাটে ফিরল। এই পুরোটা সময় কেউ কোনো কথা বলল না। তবে খলিফার কেন যেন মনে হতে লাগল, এই লোকের ভেতর কিছু একটা আছে। আলাদা কিছু একটা। সেই কিছু একটা কী তা সে জানে না। কিন্তু সে যেন সেই বুঝতে না পারা বিষয়টাই স্পষ্ট টের পাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে ফজলু মিয়ার গা থেকে আঁতরের গন্ধ আসছে। খানিক আগেও ভকভক করে মাছের গন্ধ আসছিল তার গা থেকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা আসলে পচা মাছের উৎকট গন্ধ নয়। বরং সুগন্ধি আঁতরের গন্ধ। তারা যখন ঘাটে নৌকা ভেড়াল তখন ফজরের আজান হচ্ছে। খলিফা নৌকা থেকে নামতে যেতেই পেছন থেকে খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল ফজলু মিয়া। খলিফা চমকে পেছন ফিরে তাকাল।

ফজলু মিয়া বলল, 'তোর চোখে তো ডর খলিফা।'

খলিফা কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'তোর নামের একটা ভালো অর্থ আছে, জানোস ?'

খলিফা ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়াল। সে জানে না। ফজলু মিয়া বলল, 'খলিফা মানে যে জামা কাপুড় সেলাই করে সেই দর্জি না। খলিফা মানে হইলো গিয়া রাজা-বাদশাহ। যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। খলিফা হারুন অর রশিদের নাম শোনোস নাই ?'

খলিফা মাথা নাড়ল, সে শোনে নাই। ফজলু মিয়া হাসল। তারপর খলিফার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'যাহ, কাজে লাইগা পড়। আরেকদিন খলিফা হারুন অর রশিদের গল্প শোনামুনে। যা।'



পরেরবারই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেল নীতু। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তার সঙ্গে একই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো অন্তও। তবে এই নিয়ে নীতু কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাল না। সে আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত হয়ে রইল। বাইরে থেকে দেখে অবশ্য তার ভেতরটা বোঝার উপায় নেই। সে সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক এক মানুষ। কিন্তু তার খুব কাছের মানুষটাও জানে না, কী ভয়াবহ যন্ত্রণা বুকে পুষে একেকটা দিন সে কাটাচ্ছে। অন্তর সঙ্গে অবশ্য সেদিন সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে কথা হয় নি নীতুর। কথা হয়েছিল পরদিন দুপুরে। সেই পুরোটা রাতজুড়েই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হলো। নীতু দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার দরজার আড়ালে। বাইরে তখন অন্ত ভিজছে। একা অন্ধকারে। কিংবা খানিক আবছা হলুদ আলোয়। অন্তর জন্য কি কোনো অনুভূতি হয়েছিল নীতুর ? খানিক মায়া, ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা ? কিংবা অন্যকিছু ? নীতু জানে না। তার ধারণা, আজকাল আর কারও জন্যই কিছু হয় না তার। পরদিন ভোরে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল নদী। তারপর হড়বড় করে বলেছিল, 'জানিস কী হয়েছে ?'

নীতুর জানার কথা না। কিংবা আগ্রহও নেই। সে কেবল ঘুম থেকে উঠেছে। তারপরও হাই তুলতে তুলতে সে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'বাবা ঠিক আছে ?'

'আরে বাবা না। অন্ত।'

নীতু আর কোনো কথা বলল না। কোনো আগ্রহও দেখাল না। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে গায়ের চাদরটা ভাঁজ করে রাখছিল। নদী বলল, 'তুই বুঝতে পারছিস না, সিরিয়াস ব্যাপার। অন্ত সারা রাত বাইরে বসে ছিল, আমাদের বাসার সামনে।'

নীতু তারপরও কোনো কথা বলল না। সে চাদর ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। নদী আচমকা তার হাত চেপে ধরে বলল, 'শুনছিস তুই ?'

নীতু তাকাল, 'হু। কিন্তু এগুলো আমাকে কেন বলছ ?'

'সারা রাত এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বসে ছিল অন্ত। ফজরের আজানের সময় দারোয়ান চাচা তাকে দেখেছে। তখন প্রায় অচেতন অবস্থা। উনি অন্তকে এনে ওনার ঘরে রেখেছেন। অন্তর তখন প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল সে।'

নীতু তারপরও আগ্রহ দেখাল না। সে প্রসঙ্গ পাল্টাল। বলল, 'মা কই আপু ?'

নদী বলল, 'এখন কী করি বল তো ? অন্ত তো আর আজ প্রথম এ বাসায় আসে নি। আগেও অসংখ্যবার এসেছে। তো দারোয়ান চাচা তো তাকে ভালো করেই চেনে।

তা ছাড়া সে নাকি জ্বরের ঘোরেও তোর কথা কীসব বলছিল! সেটা শুনেই উনি আমাকে জানালেন। একবার ভাব তো, মানুষ জানলে কী বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়ে যেত!'

নীতু এবার আর কথাই বলল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে এল। তবে নদী গিয়ে অন্তকে ঘরে নিয়ে এল। শায়লা বেগম প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু নদী বলল, 'মা, বিষয়টা যদি কোনোভাবে আশপাশের লোকজন পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে কী কাণ্ড ঘটবে, একবার ভাবো তো ? তার চেয়ে ঘরে নিয়ে আসাই কি ভালো না ? ও এখানে কী চায়, কেন এসেছে, সেটা তো আগে শুনি ? আর এখন তো এত রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। ঘটনা যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। নতুন করে আর কী ঘটবে ? বরং দেখি ও কেন এসেছে, কী বলতে চায়।'

নদীর কথায় যুক্তি আছে। শায়লা বেগম শান্ত হলেন। অন্তকে শুইয়ে দেওয়া হলো ড্রইংরুমের ডিভানে। তার পরনে দারোয়ানের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সে সেসব পরেই শুয়ে রইল। নদী তাকে ঘুমের মধ্যেই খানিক তরল খাবার আর ওষুধ খাইয়ে দিল। অন্তর চোখ টকটকে লাল। গায়ে জ্বর। ওষুধ খেয়ে আবারও ঘুমিয়ে গেল সে। তার ঘুম ভাঙল দুপুরের পর। ততক্ষণে জ্বর বেশ খানিকটা কমেছে। ঘুমভাঙা অন্ত প্রথমে বুঝতেই পারল না, সে কোথায় আছে। তবে নদীকে দেখে হকচকিয়ে গেল। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। নদী গম্ভীর গলায় বলল, 'এসব কী অন্ত ?'

অন্ত এই কথার জবাব দিল না। সে মাথা নিচু করে বসে রইল। নদী বলল, 'তুমি এখানে কেন এসেছ ?'

অন্ত কিছু বলতে চাইছে কি না নদী জানে না। তবে তার কোলের ওপর রাখা হাত দুখানা কাঁপছে। ঘামছে সে। সম্ভবত জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। নদী বলল, 'আমার এখন কী করা উচিত অন্ত ? তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কী করেছ ? নীতুর কী ক্ষতিটা তুমি করেছ, কোনো ধারণা আছে তোমার ?'

অন্ত জবাব দিল না। তবে সে বুঝল, ঘটনা বাসায় জানাজানি হয়ে গেছে। সে হঠাৎ চট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল নদীর পায়ের কাছে। হাউমাউ করে কাঁদছে সে। নদী শীতল গলায় বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন ?'

'আমি কাঁদছি না।' অন্ত কান্না চাপার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না।

'তাহলে কী করছ ?'

'আমি জানি না আমি কী করছি!'

'জানো না মানে ?'

অন্ত এবার আর নদীর কথার জবাব দিল না। সে জড়ানো অসহায় কণ্ঠে বলল, 'আমাকে একটু নীতুর সাথে কথা বলতে দিন আপু। একবার আপু। প্লিজ, একবার...।' তীব্র কান্নায় অন্তর কথা জড়িয়ে আসছে। নদী বলল, 'নীতুর সাথে কে কথা বলবে ? তুমি ? কী কথা বলবে ?'

'কিছু বলব না আপু। আমি শুধু ওর সাথে একটু দেখা করব। আপনি একটু দেখা করতে দিন। প্লিজ আপু, প্লিজ। একবার...।' অন্তু হাউমাউ করে আরও কীসব বলল। বলতেই থাকল। কিন্তু তার কান্নার শব্দে সেসবের বেশির ভাগই শোনা গেল না। নদীও অবশ্য শোনার চেষ্টা করল না। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অন্তু একা বসে রইল সেখানে।

নীতু এল দীর্ঘসময় পর। তার পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল অন্তু। অন্তুর চোখে তীব্র আতঙ্ক, প্রবল দ্বিধা। কিন্তু নীতু খুব স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে এসে সোফায় বসল। তারপর মৃদু হেসে অন্তুকে বলল, 'কী খবর তোর ? কেমন আছিস ?'

অন্তু জবাব দিল না। সে হতবুদ্ধির মতো নীতুর দিকে তাকিয়ে রইল। নীতু তার সঙ্গে এমন সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলবে, এটা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। নীতু বলল, 'ওভাবে মেঝেতে বসে আছিস কেন ? সোফায় উঠে বস।'

অন্তু সোফায় উঠে বসল। কিন্তু কথা বলতে পারল না। তার চোখেমুখে ভয়, বিস্ময়। নীতু বলল, 'তোর জ্বর কমেছে ?'

'কী হয়েছে তোর ?' কথা বলল অন্তু। নীতুর আচরণে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে।

'কী হবে ? কিছু হয় নি তো!'

'তুই এভাবে কথা বলছিস কেন ? কিছু একটা হয়েছে তোর।' অন্তুর গলায় অজানা আশঙ্কা।

'কেমন করে কথা বলছি ?'

অন্তু জবাব দিল না। সে শক্ত করে নীতুর হাত দুখানা ধরে ফেলল। তারপর ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'তুই আমার ওপর খুব রেগে আছিস না ?'

নীতু মৃদু হাসল, 'তোর ওপর রেগে থাকব কেন ? কী করেছিস তুই ?' তার কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত। শান্ত ও শীতল।

'নীতু!' চাপা কণ্ঠে ডাকল অন্তু। 'তুই এভাবে কথা বলিস না। প্লিজ।'

নীতু অন্তুর দিকে তাকাল। তারপর নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে ? কীভাবে কথা বলব ?'

অন্তুর এবার অসহায় লাগছে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। এই আশ্চর্য শান্ত, স্থির নীতুকে দেখে কেন যেন খুব ভয় হচ্ছে তার। আতঙ্কে অবশ হয়ে যাচ্ছে ভেতরটা। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাই নি নীতু। তুই বিশ্বাস কর। আমি কোথাও যাই নি।'

নীতু কথা বলল না। অন্তু বলল, 'একটা মুহূর্তের জন্যও আমি তোকে মাথা থেকে তাড়াতে পারি নি। এক মুহূর্তও না। কিন্তু ওই সময়ে হঠাৎ কী যে হলো...! এত ঘাবড়ে গেলাম...।' বলে খানিক থামল সে। তার চোখে মুখে লজ্জা, ভয়, শূন্যতা। 'খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। এত ভয় যে তোকে বোঝাতে পারব না! তুই যখন খবরটা দিলি,

শুনে মাথা কাজ করছিল না। মনে হচ্ছিল, প্রচণ্ড ভূমিকম্প হচ্ছে। মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। কিচ্ছু চিন্তা করতে পারছিলাম না। কেবল ভয় হচ্ছিল। প্রচণ্ড ভয়।' বলে আবারও থামল অন্তু। তারপর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে যেন খানিক সাহস সঞ্চয় করল। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি এও জানি নীতু, আমি মহা অন্যায় করেছি। ভয়ংকর অন্যায়। এরচেয়ে বড় অন্যায় আর হয় না। নীতু... নীতু...।'

নীতু শান্ত ভঙ্গিতে অন্তুর দিকে মুখ ফেরাল। তারপর তার চোখে চোখ রেখে স্থির কণ্ঠে বলল, 'বল, আমি শুনছি।'

'তুই শুনছিস না।' আর্তনাদের স্বরে বলল অন্তু। 'শুনলেও বুঝতে পারছিস না। আমি এইটুকু একটা মানুষ। এই যে দেখ ? তুই আমাকে চিনিস না ? কী ভীতু আর বোকা আমি! তুই তো আমাকে চিনিস। চিনিস না ?'

নীতু কথা বলল না। অন্তু বলল, 'তোর ফোনটা রাখার পর পাগল পাগল লাগছিল। কাউকে কিছু বলতেও পারছিলাম না। কী করব, কোথায় যাব, কিচ্ছু না। আতঙ্কে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে গেলাম...।'

'আমি কি তোকে কিছু বলেছি ?' নীতু শান্ত গলায় বলল।

'কেন বলছিস না ? তুই আমাকে বল। তোর যা ইচ্ছে আমাকে বল।' অন্তুর কণ্ঠে অসহায় আকুতি।

নীতু কিছু বলল না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল। অন্তু বলল, 'পৃথিবীতে আমার মতো খারাপ মানুষ আর হয় না, তাই না নীতু ? না হলে তোকে ওই অবস্থায় একা ফেলে আমি কী করে পালিয়ে গেলাম ? ভয়ে ফোনটা পর্যন্ত বন্ধ করে রাখলাম...।' অন্তু হঠাৎ কাঁদতে লাগল। নীতু তার পাশেই বসে আছে। স্থির, নিষ্কম্প। অন্তু দুহাতে নীতুর গাল চেপে ধরে বলল, 'মানুষই তো ভুল করে, তাই না নীতু ? আবার মানুষই তো শোধরায় ?'

'হুম।'

'আমি তো ফিরে এসেছি, তাই না ? আমি তো আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ!' নীতুর গলায় কি খানিক কম্পন ?

'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কান্না থামলেও অন্তুর গলা ভেজা।

'কী ঠিক হবে ?'

অন্তু প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। যার যা ইচ্ছা বলুক, আমরা বিয়ে করব নীতু। আর...।'

'আর কী ?'

'আর...।' কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন ঠিক জড়তাটা কাটাতে পারছে না অন্তু। তবে খানিক সময় নিয়ে সে বলল, 'আর ওকেও আমরা পৃথিবীতে নিয়ে আসব।'

'কাকে ?'

অন্তু তার ডান হাতটা দিয়ে আলতো করে নীতুর পেটে ছুঁয়ে দিল। তারপর বলল, 'এই যে, তোর পেটের ভেতর যে আছে, ওকে।' অন্তুর গলা খানিক উষ্ণ। গাঢ়।

স্থির, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ নীতু হঠাৎ ভেঙে পড়ল। প্রবল ঝড়ে শেকড়সহ উপড়ে পড়া বৃক্ষের মতো। তার চোখ বেয়ে বানের পানির মতো অবিরাম নেমে আসতে লাগল অশ্রুধারা। অন্তু মুখ তুলে তাকাল। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'নীতু ? নীতু ?'

নীতু সেই ডাকে সাড়া দিল না। সে কেবল দুহাতে তার মুখখানা ঢেকে ফেলল। অন্তু সেই হাত সরিয়ে নীতুর অশ্রু মুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এ যেন এক অন্তহীন দুঃখের সমুদ্র। এই সমুদ্রের কান্নার যেন আর শেষ নেই। অন্তু বলল, 'তুই কাঁদছিস কেন ? আমি তো এসেছি। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব।'

নীতু তার সেই কান্নার ভেতর থেকে এলোমেলো কণ্ঠে বলল, 'কিচ্ছু ঠিক হবে না। আর কখনোই কিচ্ছু ঠিক হবে না।'

অন্তু কী বুঝল কে জানে! সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই জীবনে এই মেয়েটার চোখে যে নোনা জলের সমুদ্র সে এঁকে দিয়েছে, সেই সমুদ্র কি কখনো মুছে দিতে পারবে ?

অন্তু সেই চেষ্টাটা করে যাচ্ছে। কিন্তু নীতুকে তা কতটা স্পর্শ করছে তা সে জানে না। একই ইউনিভার্সিটি হলেও তাদের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। অন্তুর সঙ্গে হুটহাট দেখা হয়ে গেলে নীতু কথা বলে। সেই কথা খুব সহজ, স্বাভাবিক। হয়তো আগেও তারা এভাবেই কথা বলত। কিন্তু অন্তু টের পায়, আগের নীতুর মতোই দেখতে এই নীতু আসলে আগের মানুষটি নয়। সে এখন অন্য এক মানুষ। তার কথাগুলোও। সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি হলো। ফাঁকা ক্যাম্পাসে নীতুর অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে ছিল অন্তু। কিন্তু নীতু আর এল না। ক্লাস শেষ হলেও না। এমন নয় যে নীতু তাকে দাঁড়াতে বলেছে। কিন্তু তারপরও সে দাঁড়ায়। নানান ছুঁতোয় নীতুর কাছাকাছি থাকতে চায়। অন্তু দাঁড়িয়ে ছিল বাসস্ট্যান্ডে। ইউনিভার্সিটির বাসগুলো এখান থেকেই ছাড়ে। কিন্তু দুপুরের শেষ বাসটাও যখন চলে গেল, তখন খানিক চিন্তিত হয়ে পড়ল অন্তু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিকশা খুঁজল সে। পেল না। তার সঙ্গে কোনো ছাতাও নেই। বাস কাউন্টারের পাশের টং দোকান থেকে একটা ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে শুরু করল অন্তু। মিনিট পাঁচেক লাগল নীতুর ডিপার্টমেন্টের সামনে আসতে। কিন্তু নীতু কোথাও নেই।

অন্তু ফোন বের করে ফোন করল। কিন্তু নীতু ধরল না। সে অবশ্য এমনিতেও কারও ফোন খুব একটা ধরে না। অন্তুর খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। সে পরপর বেশ কবার ফোন করল। কিন্তু একনাগাড়ে রিং বেজে ফোন কেটে যাচ্ছে। বিচলিত অন্তু অবশ্য নীতুর দেখা পেল খেলার মাঠে। মাঠের দখিন দিকে বড়সড় একটা বটগাছ। গাছের তলায় বাঁধানো বেদি। সেই বেদিতে চুপচাপ বসে আছে নীতু। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। নীতু সেই বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। মাতাল হাওয়ার মাতমে টুপটাপ ঝরে পড়ছে বটগাছের পাতা।

কিছু পাতা পড়ছে নীতুর গায়েও। কিন্তু নীতু তা খেয়াল করছে বলে মনে হচ্ছে না। সে চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

অন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর নীতুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীতু অবশ্য চোখ মেলে তাকাল না। যেন বন্ধ চোখের ওপারে অন্য কোনো জগতে বুঁদ হয়ে আছে সে। খানিক ইতস্তত করে নীতুকে ডাকল অন্তু। পরপর বেশ কয়েকবার। কিন্তু চোখ মেলল না নীতু। কী হচ্ছে মেয়েটার ? দিনে দিনে এমন হয়ে যাচ্ছে কেন সে ? অন্তু হাত বাড়িয়ে নীতুর কাঁধ ধরল। তারপর নরম গলায় ডাকল, 'নীতু ?'

নীতু চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু তার সেই চোখে ঘোরলাগা দৃষ্টি। যেন চট করে অন্তুকে চিনতে পারে নি সে। অন্তু বলল, 'এখানে এভাবে ভিজছিস কেন ? ঠান্ডা লেগে যাবে তো!'

নীতু সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক তাকাল। যেন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কোথায় আছে সে। তারপর হঠাৎ কান খাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করতে লাগল। অন্তু দ্বিধাগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল। নীতু আচমকা ফিসফিস করে বলল, 'একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?'

'কিসের শব্দ ?'

'কান্নার।'

'কান্নার!' অবাক হলো অন্তু।

'হু।'

'কিসের কান্না ?'

'একটা বাচ্চার। খুব ছোট্ট একটা বাচ্চার কান্না।'

'এখানে ছোট্ট বাচ্চা আসবে কোথা থেকে ?'

'এখানে ছোট বাচ্চা নেই ?'

'নাহ।'

'তাহলে আমি যে একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি ? কী করুণ করেই না সে কাঁদছে!'

'কী আবোল-তাবোল বকছিস ?'

নীতু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। যেন সংবিত ফিরল তার। সে বলল, 'আমায় একটু বাড়ি পৌঁছে দিবি ? শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।'

অন্তু তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। বাসে নীতু হঠাৎ বলল, 'তুই সত্যি সত্যিই কোনো কান্নার শব্দ শুনতে পাস নি ?'

'কান্নার শব্দ শুনতে পাব কেন ?'

'একটা বাচ্চা কাঁদলে সেটা শুনতে পাবি না ?'

'বাচ্চা কাঁদবে কেন ?'

'কারণ সে ভয় পাচ্ছে।'

'কিসের ভয় ?'

'মরে যাওয়ার ভয়। তাকে কেউ খুন করে ফেলবে, এটা সে আগেভাগেই বুঝতে পেরেছে। এইজন্য সে ভয়ে কাঁদছে।'

'কে মেরে ফেলবে ?'

'তার মা।'

'তার মা কেন তাকে মেরে ফেলবে ? পৃথিবীতে কোনো মা কি তার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে ?' প্রশ্নটা করেই থমকে গেল অন্তু। তার হঠাৎ মনে হলো, সে নীতুকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

নীতু বলল, 'হুম, পারে। এই যে আমি, আমি পারি।'

বলেই মৃদু হাসল সে। তার সেই হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। অন্তু এক হাতে নীতুর কাঁধ ছুঁয়ে তার মাথাটা টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর নামিয়ে নিল কাঁধে। নীতু অবশ্য বাধা দিল না। সে বাধ্য মেয়ের মতো অন্তুর কাঁধে মাথা রেখে বসে রইল। তারপর ঘুমিয়েও গেল।

অন্তু বাকি পথটুকু নীতুর ঘুমন্ত মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। তার কেবল মনে হতে লাগল, বাকিটা জীবন এভাবেই নীতুকে বয়ে নিতে চায় সে।



নীতুকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই শায়লা বেগমের। এ কারণে স্বামীর দিকেও খুব একটা মনোযোগ দেওয়া হয় না আজকাল। বিষয়টি নিয়ে আদিবুর রহমান মন খারাপ করেন কি না বোঝা যায় না। তিনি চলৎশক্তিহীন নির্বাক মানুষ। সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকেন। দিন দিন আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। যেন সবার সঙ্গে থেকেও অস্তিত্বহীন এক মানুষ তিনি। এ সংসারে তার আর কোনো উপযোগিতা নেই। যা আছে তার নাম প্রয়োজনহীনতা। নীতুর ঘটনায় শায়লা বেগম অবশ্য একটা বিষয় বুঝতে পেরেছেন। মেয়েরা যত বড়ই হোক, উপার্জনক্ষম হোক, মায়েদের অসতর্ক হলে চলে না। স্বামীর অসুস্থতায় আর সবকিছু থেকে তিনি বড় বেশি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ফলাফল, ওইটুকু এক মেয়ের সারা জীবনের স্থায়ী এক ক্ষতচিহ্ন। এই ক্ষতচিহ্ন মোছার কোনো উপায় তিনি জানেন না। মেয়েটা চোখের সামনে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে এই ঘটনা নদীর প্রতি সতর্ক করে তুলল তাঁকে। যদিও নদী বুদ্ধিমতী, দায়িত্বশীলা মেয়ে। তারপরও সারাক্ষণই বুকের ভেতর চাপা এক ভয় কাজ করে তাঁর। এই ভয় এড়াতেই যত দ্রুত সম্ভব নদীকে বিয়ে দিতে চান তিনি। এমনিতেই নাটক-সিনেমার মেয়েদের নিয়ে নানান কথা রটে। তার ওপর নীতুর ঘটনায় বড় বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি।

সেদিন নদীকে ডেকে তিনি বললেন, 'রায়হানের ফোন নম্বরটা দিস তো।'

'কার ফোন নম্বর ?' কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল নদী।

'রায়হানের।'

'রায়হানের ফোন নম্বর দিয়ে তুমি কী করবে ?'

'বাসায় আসতে বলব।'

'কেন ?'

'কারণ আমি তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে চাই।'

'তার বাবা-মায়ের সাথে তোমার কী কথা ?'

'রায়হানের বিয়ের বিষয়ে।'

'রায়হানের বিয়ের বিষয়ে তুমি কথা বলবে কেন ?'

'কারণ রায়হানের সাথে আমি তোর বিয়ে ঠিক করব।'

'মা!' নদীর গলা এবার শক্ত হলো। 'কী সব আবোল-তাবোল বকছো তুমি ?'

'এখানে আবোল-তাবোলের কী দেখলি ? তোর বিয়ের বয়স হয় নি ?'

'বিয়ের আবার বয়স কী ? রিচার্ড গিয়ার সত্তর বছর বয়সে গিয়েও বিয়ে করেছে।'

'রিচার্ড গিয়ারটা আবার কে ?'

'হলিউডের অভিনেতা।'

'তুই তো হলিউডের অভিনেতা না। পুরুষমানুষও না। তুই মেয়েমানুষ।'

নদী হাসল, 'আজকাল মেয়েরাও বুড়ো বয়সে বিয়ে করে মা। পঞ্চাশের পরে বিয়ে করা মেয়েদের তালিকাও আছে। শুনবে ?'

'আমার এত কিছু শোনার দরকার নাই। আমার দরকার তোর বিয়ে। তুই রায়হানকে পছন্দ করিস না ?'

'করি। করব না কেন ? কিন্তু কাউকে পছন্দ করলেই তাকে বিয়ে করতে হবে ?'

'তাহলে কি অপছন্দের লোককে বিয়ে করবি ?'

'উফ! তা-না মা। আমি তো রায়হান ভাইয়ের মতো আরও অনেককেই পছন্দ করি। তাই বলে তাদের সবাইকেই বিয়ে করব ?'

'কথা ঘুরাবি না। তোর পেটে আমি হই নাই, আমার পেটে তুই হয়েছিস। তুই রায়হানকে পছন্দ করিস না ? না করলে সেটাও বল। আমি অন্য ছেলে দেখি।'

'রায়হান ভাইকে আমি অবশ্যই পছন্দ করি। কিন্তু সেটা বিয়ে করার মতো পছন্দ না মা। আর তোমাকে ছেলে দেখতে হবে না। প্রয়োজনে ছেলেই তোমাকে দেখতে আসবে।'

'ছেলেই আমাকে দেখতে আসবে মানে ?' হতভম্ব গলায় বললেন শায়লা বেগম।

নদী ফিক করে হেসে ফেলল, 'আরে তুমি যা ভাবছ তা না। শাশুড়িরাই কেবল জামাই পছন্দ করবে, এটা কেমন কথা ? জামাইদেরও তো শাশুড়িকে পছন্দ করার একটা ব্যাপার থাকা উচিত ? তাই না ?'

'তোর সমস্যা কী ? এত ফুর্তি লাগছে কেন তোর মনে ?' শায়লা বেগম গজগজ করতে করতে বললেন।

নদী এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে মায়ের দুশ্চিন্তাটা বোঝে। সঙ্গে এটাও বোঝে, এই দুশ্চিন্তা অমূলক নয়। নীতু তাদের সবার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। তবে তার সেই ঘুরে বেড়ানোটা সুখকর কিছু না। যেন মৃত এক মানুষ সে। তারা সবাই মিলে সারাক্ষণ চেষ্টা করে তাকে যতটা সম্ভব ভুলিয়ে রাখতে। কিন্তু কিছু ক্ষত কখনোই শুকায় না। কিছু দুঃসহ স্মৃতি কখনোই মুছে যায় না।

নদীর থিয়েটারের নাটকটা শেষ হয়েছে। তার জন্য অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা ছিল এই নাটক। দর্শক থেকে মিডিয়া, স্পন্সর প্রতিষ্ঠান থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী, সবাই একযোগে এগিয়ে এসেছিল বিভূতি বাবুর সাহায্যার্থে। আর এমন একটা কাজের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে নদীরও একটা আলাদা ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া প্রথমবারের মতো থিয়েটারের কোনো নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে দারুণ

প্রশংসিতও হয়েছে সে। সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টাই অসাধারণ সব প্রাপ্তির। তবে এতসব প্রাপ্তির ভিড়েও নদীর কাছে আলাদা হয়েই ধরা দিল সজল।

এমন নয় যে সজলের সঙ্গে তার তুমুল কোনো প্রেম চলছে। বরং এখনো তারা আপনি আপনি করেই কথা বলে। দেখাও হয় খুব কম। কিন্তু তার পরও নদী টের পায়, এই সম্পর্কটায় আলাদা কিছু আছে। বিশেষ কিছু। যে অনুভবটা সে এর আগে কখনো পায় নি। তবুও আরও খানিকটা সময় নিতে চায় সে। রায়হানের প্রতি তার ভালোলাগার অনুভূতিটাকে যেমন সে প্রেম বলে ভেবেছিল, কিন্তু পরে আর সেই অনুভবটা খুঁজে পায় নি, এখানেও যেন তেমন না হয়। এটা হতে দেওয়া যাবে না। আগে নিশ্চিন্ত হতে হবে। আর এ কারণেই সে সময় নিচ্ছে। সজলকে বোঝার চেয়েও বেশি বুঝতে চাইছে নিজেকে। তবে সেই বোঝাবুঝিটা ঠিকঠাক হচ্ছে বলে নদীর মনে হয় না। তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, সজলের মধ্যে আশ্চর্য জাদুকরী এক ক্ষমতা আছে। একটা মোহ। তা নিমিষেই তাকে তলিয়ে দেয়। সেখানে যুক্তি, বুদ্ধি কিংবা বাস্তবের হিসেবনিকেশ কিছুই কাজ করে না। কাজ করে প্রবল যুক্তিহীন এক আকর্ষণ। এই যুক্তিহীনতাকে ভয়ও পায় নদী।

সে প্রশ্নটা করেছিল সজলকে, 'আচ্ছা, ভালোবাসা কি যুক্তিহীন ?'

সজল বলেছিল, 'কোনোকিছুই যুক্তিহীন না।'

'কোনোকিছুই না ?'

'না। এমনকি মা যে তার সন্তানকে ভালোবাসেন, তাও না। সেখানেও কোথাও না কোথাও যুক্তি বা প্রাপ্তির ব্যাপার থাকে। একজন মা কেন পৃথিবীর সব সন্তানের মা হয়ে উঠতে পারেন না ? কেন তিনি কেবল তার নিজের সন্তানকেই ভালোবাসেন ? কারণ তিনি নিজেকে ভালোবাসেন। আর নিজেকে ভালোবাসেন বলেই তিনি তার নিজের শরীর নিঃসৃত অস্তিত্বটাকে ভালোবাসেন। অন্যের অস্তিত্বকে নয়। অর্থাৎ তিনি তার সন্তানকে সন্তানের জন্য নয়, নিজের জন্যই ভালোবাসেন। সে তার নিজের বলে। তাকে ভালোবাসতে ভালো লাগে বলে। মানুষ আসলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে। সে তার নিজের ভালোলাগার জন্যই সব করে। আর এজন্যই সে ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসা চায়। যত্নের বিনিময়ে যত্ন চায়। অনুভবের বিনিময়ে অনুভব। না হলে কোথায় যেন কিছু একটা ক্রমশই শিথিল হতে থাকে।'

কথাটা মিথ্যে মনে হয় নি নদীর। পৃথিবীতে ভালোবাসাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পারস্পরিক। এটি যত্নে বাড়ে। অবহেলায় ধূসর, ম্লান হয়ে যায়। সে বলল, 'হুম। সন্তানকেও বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। হয়তো সেই দেওয়াটা বস্তুগত কিছু নয়। তারপরও কিছু দিতে হয়।' বলে খানিক থামল নদী। তারপর বলেছিল, 'জগতে নিঃশর্ত কিছু নেই, তাই না ?'

'নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ, কোনোটিই নেই। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু থাকেই। এটাই কার্যকারণ। আর এই থাকাটা জরুরি। না হলে সব ধূসর হয়ে যায়।'

সজলের ভাবনাগুলো সঠিক কি ভুল নদী জানে না। তবে সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। প্রভাবিতও হয়। পরদিন দেখা কিংবা কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকে। সজল অবশ্য তেমন অস্থির হয় না। সে খানিক শান্ত, ধীর। তবে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কথাও বলে সজল।

সেদিন যেমন বলল, 'ভাবছি একটা দোকান দেব।'

'দোকান!' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল নদী।

'হুম।'

'কিসের দোকান ?'

'কবিতার।'

'কবিতার ?' ঠোঁট উল্টে বলল নদী। 'কবিতার আবার দোকান হয় নাকি ?'

'কেন হবে না ? ফুলের দোকান হয়, ফলের দোকান হয়। খাতা, কলম, কাগজের দোকান হয়। কবিতার দোকান হলে ক্ষতি কী ?'

'এগুলো আর কবিতা কি এক হলো ?'

'আলাদাও তো না। ধরুন ফুল। ফুল কী ? দ্যা সাইন অফ বিউটি। এক্সপ্রেশন অফ ফিলিংস। তাই না ? অনুভূতি আর সৌন্দর্য প্রকাশ ছাড়া উপযোগিতা কী ফুলের ? খাওয়া তো আর যায় না! কবিতাও তাই। দ্যা সাইন অফ বিউটি, এক্সপ্রেশন অফ ফিলিংস।'

নদী হাসল, 'শাপলা কিন্তু খাওয়া যায়...।'

সজলও হাসল, 'এটা অবশ্য ভালো বলেছেন। এই এক জায়গায় কবিতা শাপলা ফুলের কাছে হেরে গেল। কবিতা খাওয়া যায় না।'

নদী কথা বলল না। তবে সজলের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য কেউ এমন উদ্ভট কথা বললে কেমন লাগত সে জানে না। তবে সজলের কাছে শুনতে তার ভালো লাগে। মাথাভর্তি বড় বড় চুলগুলো বাঁ হাতে আলগোছে কাঁধের কাছে সরাতে সরাতে সে যখন স্বপ্নালু চোখে এমন উদ্ভট কথাগুলি বলে, নদীর তখনো মনে হয়, বাহ, কী সুন্দর করেই না ভাবা যায়!

সজল বলল, 'কী মনে হয়, মানুষ কবিতা কিনবে না ? সাথে না হয় ফুলও থাকবে। প্রেমিকাকে ফুল দেওয়ার সময় দশ টাকা দিয়ে একটা কবিতাও কিনে নিয়ে যাবে। ফুলের সাথে কবিতা। এরচয়ে ভালো কেমিস্ট্রি আর কিছু হয় ?'

'উঁহু, হয় না।' নদী মুখ টিপে হাসল। 'কী কবিতা থাকবে ফুলের সাথে ?'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। অভিমান ভাঙাতে হলে একরকম কবিতা। প্রপোজ করলে একরকম। আর প্রাক্তনকে দিলে অন্যরকম।'

'প্রাক্তনকেও দেওয়া যাবে ?'

'অফকোর্স যাবে। ওটা বরং আরও বেশি ইন্টারেস্টিং।'

'ইন্টারেস্টিং কেন ?'

'এমন এক কবিতা থাকবে যে প্রাক্তন ভাববে তার বিরহে এখনো কাতর সে। কিন্তু আসল ঘটনা তো অন্য।'

'আসল ঘটনা কী ?'

'আসল ঘটনা হলো সে নতুন প্রেমে হুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ে অন্যকে না খোঁচালে আনন্দটা তো পরিপূর্ণ হয় না!'

নদী হাসল, 'কী কবিতা থাকবে সেখানে ?'

সজল খানিক ভাবল। তারপর বলল, 'যেমন ধরুন, এমন হতে পারে...'। দুহাতে চুলগুলো পেছনে সরাল সে। তারপর সন্ধ্যার আকাশে তাকিয়ে গাঢ় ভরাট গলায় পড়ল,

'আমি যাই,
যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই।
তুমি যে ফুলের মতো ছিলে,
ঝরে যাওয়া তারার মিছিলে।
আমি তা-ই,
তুমি ভেবে সবটা কুড়াই।
কিছুই রাখি না ফেলে পথে,
তুমি নেই, ছিলে না শপথে,
আমি তাই, যতদূরে যাই,
পুরোনো পথের ধুলো খুঁজে,
তোমাকে কুড়াই।'

নদী ভেবেছিল সজল খুব তরল বা হাসির কিছু বলবে। কিন্তু সন্ধ্যার সেই ম্লান আলোয়, নির্জন সেই নদীর ধারে, সজল তার গাঢ় ভরাট কণ্ঠে যখন কবিতাটা পড়ল, নদী তখন ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছিল অতলান্ত কোনো সমুদ্রে। সজল কবিতা শেষ করার পরও কোনো কথা বলতে পারল না সে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সজলের দিকে। সজল বলল, 'এমন কিছু...।'

নদী আচমকা সংবিত ফিরে পেয়ে বলল, 'কেমন কিছু ?'

'এই যে এখন বললাম এমন... কিংবা অন্যরকমও হতে পারে।'

নদী নিজেকে সামলে নিয়ে হাসির ছলে বলল, 'এমন কবিতা পেয়ে প্রাক্তন যদি আবার ফিরে আসতে চায়, তখন ?'

সজলও হাসল, 'ওই যে বললাম, ডিপেন্ডস অন সিচ্যুয়েশন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে না হয় আমার নাম বলে দিবে যে ওটা তার না, আমার লেখা।'

'তখন তো আপনার কাছে চলে আসবে ?'

'সঙ্গে এলে আর কী করা! আমি না হয় তখন দুহাত বাড়িয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইব, 'এসো এসো আমার ঘরে এসো...।'

সজল হাসল। সঙ্গে নদীও।

সজলে ডুবে থাকা নদীর দ্বিধা যেন তবু কাটে না। তার এই দ্বিধার পেছনে হয়তো নীতুর ব্যাপারটাও রয়েছে। রয়েছে বাবার ওই অসুস্থতা, অসাড়ত্ব। মায়ের সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তাও। সে এমন কোনো সম্পর্কে জড়াতে চায় না, যে সম্পর্ক তার বোঝাগুলোকে হালকা করার বদলে আরও বেশি ভারী করে তুলবে। তাকে ঋজু করার বদলে আরও বেশি কুঁজো করে ফেলবে। যে পথটুকু সে একা একা হেঁটে এসেছে, সেই পথটা মসৃণ নয়, বরং বন্ধুর। ফলে সে জানে, জীবনের পথে কীভাবে একা হাঁটতে হয়। কিন্তু তারপরও জীবন কখনো না কখনো খানিক বিরাম চায়। একটু অবসর কিংবা বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রামটুকুর জন্য নির্ভার একটা আশ্রয় খুব দরকার তার। খরতাপ দহনের দীর্ঘ মরুপথ হেঁটে এসে টলমলে স্বচ্ছ জলের এক সরোবরের পাশে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। আকণ্ঠ শুষে নিতে ইচ্ছে হয় প্রশান্তি। ওই প্রশান্তিটুকু কি সজল তাকে দিতে পারবে না ? সে তো এর বেশি আর কিছু চায় না। কিন্তু একটুকরো দ্বিধার মেঘ যেন কোথা থেকে এসে ছায়া ফেলে রাখে। ওই ছায়াটুকুই দূর করতে পারে না নদী।

তবে নদীর দ্বিধাটুকু টুপ করে কেটে গেল ঘোরলাগা এক দিনে। শীত নেমেছে। নদীর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, শহরের বাইরে গাঁয়ের শিশিরভেজা কোনো মেঠো পথের ঘাসে পা ভোবাতে। ঘন কুয়াশার মাঠ, হলুদ সর্ষেখেত আর হাঁটুজলের নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকতে। চারপাশে পাতা ঝরার মন কেমনের গান। একটা দোয়েল, শালিক কিংবা মাছরাঙার হঠাৎ স্পন্দন। নদীর জলে টুপ করে জেগে ওঠা নাম-না-জানা কোনো মাছের হঠাৎ কম্পন। এইসব একদিন খুব করে বুক ভরে শুষে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

সজল বলল, 'এমন একটা জায়গা আমার চেনা।'

'কিন্তু কত দূর ? রাতের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে যে!'

সজল হাসল, 'আমাদের তো দিনই দেখার কথা, রাত নয়। আমরা রাতের আগেই ঘরে ফিরব।'

নদী ভেবেছিল অনেক দূরের পথ। কিন্তু ঢাকা পেরিয়ে গাড়ি যখন মানিকগঞ্জের দিকে মুখ ঘোরাল, ঘোর লেগে গেল নদীর। ঘন কুয়াশার দিন। সেই কুয়াশার ভেতর থেকে হঠাৎ উঁকি দিল হলুদ ফুলের মাঠ। মাঠের ওপাশে নদী। নদীর ওপাশে কী ? নদী জানে না। তার কেবল ওই নদীর ধারে নদীর মতোই শান্ত, চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে হতে লাগল। সজলের সঙ্গে সে-ই তার দূরে কোথাও প্রথম যাওয়া। তারা সেই মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে এল। একটা বিশাল শিমুলগাছ রিক্ত ডাল ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা। কী শূন্য আর বিশাল! নদীর হঠাৎ মনে হলো, যে যত বেশি বিশাল, সে তত বেশি শূন্য। আকাশের মতো। অন্তহীন শূন্যতা।

নদীর ধারে বাঁশের মাচার মতো একটা বসার জায়গা। সেখানে চুপচাপ বসে রইল তারা। একটা ফিঙে উড়ে গেল। একটা মাছরাঙা। হলুদ কাঠঠোকরা। একটা মন কেমন করা হাওয়া। সজল সেই প্রথম অন্য রকম স্পর্শে আলতো করে হাত ছুঁয়ে দিল নদীর। রোজ রোজ কত পুরুষের হাতের স্পর্শে অভ্যস্ত নদীর হাতটা সজলের ওইটুকু স্পর্শে কেন অমন কেঁপে উঠেছিল কে জানে!

রোদ ওঠার চেষ্টায় ঘন কুয়াশা তখন ক্রমশই মিহি কুয়াশার আস্তরণ হয়ে চোখের সামনে সম্মোহন ছড়াতে লাগল। দিগন্তবিস্তৃত হলুদ সর্ষেখেত। তার ওপর সারি সারি বক উড়ে যাচ্ছে দূরে। সর্ষেখেতের ভেতর ছোটাছুটি করছে লাল নীল চাদর পরা শিশুরা।

তারা প্রায় বিকেল অবধি বসে রইল সেখানে। নিঃশব্দ অথচ বাঙ্ময়। পরস্পরের সঙ্গে শব্দের প্রাচুর্যে কোনো কথা না বললেও অনুভূতির প্রগাঢ়তায় যেন অবিরাম কথা বলে যেতে লাগল। নদীর কেবল মনে হচ্ছিল, এই সময়টা কখনো না ফুরাক। হয়ে যাক অন্তহীন অনুভবের অন্দরমহল।

বিকেলে হঠাৎ হাড়কাঁপানো হাওয়া দিতে থাকল। নদীর পরনে অফ হোয়াইট শাড়ি। গাঢ় কাজল চোখে। কপালে ছোট্ট এক টিপ। তাকে দেখতে লাগছিল শুভ্র ফুলের মতো। কিন্তু বিকেলের ওই হিম হাওয়ায় খুব জড়সড় হয়ে গেল সে। সজল হঠাৎ বলল, 'আমি যদি কিছু দিতে চাই, নেবেন ?'

নদী তাকাল। তার কাজলকালো গভীর চোখে তখন ভেসে উঠেছে অসীম এক আকাশ। সে সেই আকাশে ঝলমলে রোদ মেখে বলল, 'উঁহু।'

'কেন ?'

'যদি তাতে ঋণ শোধ হয়ে যায় ?'

'সব ঋণ কি শোধ হয় ?'

'নয় তো কী ?'

সজল হাসল, 'কিছু ঋণ কেবল বাড়তেই থাকে। শোধ করতে গেলে আরও বাড়ে।'

কথাটা কী যে ভালো লাগল নদীর। সে অস্ফুটে বলল, 'কী ?'

'কবিতা।'

'কবিতা ?' ভারি অবাক হলো নদী।

'হুম।'

'কই, দেখি ?'

নদী হাত বাড়াল। সজল তার হাতে একটা চাদর তুলে দিল। তারপর বলল, 'অনেক ঠান্ডা, তাই না ?'

নদী জবাব দিল না। সে চাদরটা খুলল। তারপর তাকিয়ে রইল অপলক। চাদরটার এক রঙা শরীরে নিজ হাতে কারুকাজ করেছে সজল। সেই কারুকাজের ভেতর লেখা—

'আমায় দিয়ো একটুখানি ছুঁয়ে, আমায় দিয়ো একটুখানি মন,
এই জনমের জন্ম মৃত্যু জানে, তুমি মানেই আমার সমর্পণ!'

লাইন দুটি গড়ে গা শিউরে উঠল নদীর। কী অদ্ভুত এক শিহরণ! সে মনে মনে আওড়াতে লাগল কথাগুলো। '...এই জনমের জন্ম মৃত্যু জানে, তুমি মানেই আমার সমর্পণ!'

দীর্ঘ সময় কথা বলল না নদী। চাদরটা শরীরে জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার চোখ বন্ধ। যেন শরীরে জড়ানো ওই চাদরে লেখা শব্দগুলো সে তার শরীরে মেখে নিতে লাগল। শুষে নিতে লাগল অনুভব।

সজল বলল,'আমাদের ফিরতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

নদী তাকাল, 'হু।' কিন্তু উঠল না সে। যেমন বসে ছিল, তেমন বসেই রইল। তার চোখ স্থির। ঠোঁট কাঁপছে। সজল হঠাৎ এগিয়ে এল কাছে। নদীও। তারা তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। স্পর্শ করতে পারছে গাঢ় থেকে প্রগাঢ় অনুভব। নদী হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সজলের ঘাড়ের কাছে নেমে আসা চুলগুলো মুঠি করে ধরল। তারপর ডুবে গেল ঠোঁটে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল তাদের। পুরো গাড়িতে কেউ আর কোনো কথা বলে নি। কেবল হাতের ভেতর হাত রেখে চুপচাপ বসে রইল তারা। কথা বলে যেতে লাগল নৈঃশব্দ্যে। নদীর কেবল মনে হতে লাগল, নৈঃশব্দ্যের চেয়ে এমন গভীর, এমন তীব্র শব্দ কি আর কোথাও আছে ?

বাড়ির গেটে নামার সময় সজলকে ডাকল সে, 'সজল!'

সজল তাকিয়ে বলল, 'হু।'

নদী অনেক কিছুই বলতে চাইছিল। কিন্তু কিছুই বলা হলো না। তবে তার সেই না বলা কথা ল্যাম্পপোস্টের ওই হলদে আবছা আলোয় আলতো করে ঢুকে গেল সজলের বুকের ভেতর।



নদী না করে দেওয়ার বেশ কিছুদিন পরে রায়হান এসেছিল ফজলু মিয়ার কাছে। সব শুনে ফজলু মিয়া বলেছিল, 'সে সত্যিই আর কাজ করবে না ?'

রায়হান মাথা নাড়াল 'নাহ।'

'তুমি তারে রাজি করানোর চেষ্টা করছো ?'

'জি।'

'তারপরও করবে না ?'

'নাহ। সেই রাতের ঘটনায় সে আপনাকে খুব ভুল বুঝেছে। আমাকেও। ভয়ানক বাজেভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা।'

ফজলু মিয়া আফসোসের স্বরে বলল, 'আহা, তোমার তো ক্ষতি হয়ে গেল।'

'কী ক্ষতি ?'

'তুমি তো তারে পছন্দ করতা। আর সে কি না তোমারে এমন খারাপ লোক ভাবলো!'

'আপনাকেও তো ভেবেছে।'

ফজলু মিয়া শব্দ করে হাসল। দীর্ঘ সময়। তারপর বলল, 'আমি তো লোক ভালো না। খারাপ লোক। আমার নামে মামলাই আছে এক কুড়ি। মাডার কেসও আছে।' বলে আবার হাসল ফজলু মিয়া। তারপর বলল, 'এমন লোকরে খারাপ ভাবায় দোষ নাই। আমারটা ঠিকই আছে। দোষ হইছে তোমারটায়। তোমারে খারাপ ভাবা ঠিক নাই।'

রায়হান কথা বলল না। চুপ করে রইল। ফজলু মিয়া বলল, 'আর কী খবর ?'

রায়হান বলল, 'বাকি কাজগুলো কী করব ?'

'বাদ দিয়া দাও।'

'বাদ দিয়ে দিব ?'

'হুম।'

'কী বলেন ? এতগুলো কাজ ?'

'আমি তো আর তোমাদের এই মিডিয়া বা নাটক ফাটকের লোক না। এইগুলা নিয়া আমার বিশেষ আগ্রহও নাই। তোমার ইচ্ছা হইলে করো।'

রায়হান আর কথা বলল না। এই লোকটাকে যে সে খুব পছন্দ করে, তা নয়। আবার অপছন্দও করে না। তবে রহস্যময় এই মানুষটার প্রতি সে একধরনের প্রবল সমীহ অনুভব করে। কে জানে, হয়তো সেটা তার এই রহস্যময়তার কারণেই। তাকে পড়া যায় না, ধরা যায় না বলেই। মানুষকে পড়ে ফেললে, পুরোপুরি বুঝে ফেললে তার সম্পর্কে আগ্রহ যেমন কমে যায়, ভালো লাগাও। ফজলু মিয়ার চারপাশে অদ্ভুত রহস্যময় এক বিভ্রমের চাদর। সেই চাদর সে কাউকে ভেদ করতে দেয় না। ফজলু মিয়া বলল, 'যাও। আমারে আর বিরক্ত করবা না। আমি এমনিতেই নানান ঝামেলায় আছি।'

রায়হান বলল, 'আচ্ছা।'

সে ঘুরে হাঁটতে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল। তারপর বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে আসল ঘটনাটা জানিয়ে দেই। এটা তার জানা উচিত।'

'কারে ?'

'নদীকে।'

ফজলু মিয়া খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'সবকিছু সবার জানার দরকার নাই। কিছু জিনিস না জানাই ভালো।' বলে সামান্য হাসল সে। তার সেই হাসি রহস্যময়। রায়হান তার অর্থ উদ্ধার করতে পারল না।

খলিফা আর হেলাল বসে আছে পাশাপাশি। হেলাল বলল, 'মিয়াভাইরে চিনছস ?'

'কীভাবে চিনবো ?'

'তোরে না মাজারের ভিতরে নিয়া গেছিলো ?'

'মাজারের ভিতরে নিয়া গেলেই তারে চেনন যায় ?'

'সে তো আর সবাইরে তার লগে মাজারের ভিতরে নেয় না। কাউরে খুব পছন্দ হইলে নেয়। তার মনে হয় তোরে পছন্দ হইছে।'

'তার পছন্দ হইলে কী হয় ?'

'অনেক কিছুই হয়।'

'অনেক কিছু কী ?'

'এত অস্থির হইস না, আইছস যহন, তখন আস্তে-ধীরে সবই বুঝবি।'

'আপনে বললেই তো হয়। আপনে যদি আগেই বলতে পারেন, তাইলে আমার আর আস্তে-ধীরে বোঝনের দরকারটা কী ?'

হেলাল হাসল, 'সে বিরাট মানুষ।'

'কত বড় ?'

'অনেক বড়।'

'রাজা-বাদশাহর সমান ?'

'রাজা-বাদশাহ না, তয় কমও না। বাইরে থেকে দেইখা তারে বোঝা যায় না। সে আড়ালের লোক।'

'তার কি খালি মাছেরই ব্যবসা ? মানুষ তো নানান কথা বলে। তার নাকি আরও নানান কিসিমের গোপন ব্যবসা-বাণিজ্য আছে ? তারে সবাই ডরও পায়। এমনকি পুলিশও...'

হেলাল খলিফাকে থামিয়ে দিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'তুই কিন্তু লোক সুবিধার না খলিফা।'

'কেন ? কী করছি ?'

'তোর চোখ আর কানের সাথে মুখও খোলা। মিয়াভাইর সাথে কাম করতে হইলে খালি চোখ আর কান খোলা রাখতে হয়। মুখ রাখতে হয় বন্ধ।'

খলিফা চুপ করে রইল। হেলাল বলল, 'এই কয়দিনে মিয়াভাইরে কেমন চিনলি ?'

খলিফা দাঁত বের করে হাসল, 'মানুষ কি এত সহজে চিনন যায় ?'

হেলাল বাঁ হাতের উল্টোপিঠে খলিফার মাথায় চাটি মেরে বলল, 'খুব সেয়ানা হইছস না ?'

'সেয়ানা কী ?'

'পাকনা। পাকনা হইছস খুব, না ?'

'মিয়াভাই যেমনে বন চটকানা মারছে, পাকনা না হইয়া উপায় কী ?'

'ওইদিন মাজারের ভিতরে নিয়া চটকানা মারছে ?' কৌতূহলী চোখে বলল হেলাল।

'হ।'

'বেশি জোরে মারছে ?'

'হ। কানে তব্দা লাইগা গেছিলো।'

'পইড়া যাস নাই মাটিতে ?'

'নাহ। আপনেরেও কি মারছিলো নি হেলাল ভাই ?'

হেলাল এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। খলিফা বলল, 'তয় ঘটনা কী জানেন ? চটকানা খাওনের আগ পর্যন্ত খুব ডর লাগতেছিল। মাথায় কিছুই ঢুকতেছিল না। কত কিছু যে জিগাইতেছিল সে, কিন্তু কোনো কিছুরই উত্তর দিতে পারতেছিলাম না। কিন্তু যেই চটকানাটা দিল, সাথে সাথে মনে হইলো মাথা পরিষ্কার হইয়া গেছে। সব কিলিয়ার। তার আগে সব ঝাপসা আর ধুঁয়া ধুঁয়া লাগতেছিলো।'

'ওইখানে তো ধুঁয়াই আছিলো।'

'হ। মাজারের ভিতরের ঘরটাতে যখন মিয়াভাই আমারে নিয়া ঢুকাইলো, দেহি ধুঁয়া উড়তেছে। আন্ধারের মইধ্যেই ধুঁয়া দেহা যাইতেছিলো। কী আশ্চর্য কাণ্ড কন তো! ধূপ নাকি ?'

'আমি কেমনে কমু ?'

'কেন, আপনারে কোনো দিন ওইহানে নেয় নাই ?'

হেলাল এবারও জবাব দিল না। খলিল বলল, 'সে তাজ্জব মানুষ। ভয়ও লাগে, আবার ভালোও লাগে।'

হেলাল মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'তারে বোঝা বড় দায়।'

'একটা সত্য কথা কন তো হেলাল ভাই।'

'কী কথা ?'

'আমার আব্বায় গেল কই ?'

'সেইটা আমি কেমনে বলবো ?'

'আপনে তো মিয়াভাইর লগে সব সময় থাহেন। সে জানলে তো আপনেরও জাননের কথা।'

'তোর আব্বায় কই সেইটা মিয়াভাই জানব কেমনে ?'

হেলালের এই কথায় খলিফা আবার বিভ্রান্ত হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি সিওর, আমার আব্বার কথা খালি সে-ই জানে।'

হেলাল কথা বলল না। খলিফা এদিক-সেদিক তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বলল, 'সবাই কিন্তু কইতেছে আব্বারে সে-ই খুন করছে। পুলিশে পর্যন্ত কইতেছে। আপনে সত্য কইরা কন তো হেলাল ভাই, আব্বারে সে খুন করে নাই ?'

'খুন করলে পুলিশ তারে ধরে না কেন ? পুলিশ অন্য মাইনষেরে বইলা বেড়ায়, আর তারে ধরে না। এইটা কী কথা ?'

'আপনেই তো কইলেন, পুলিশও তারে ভয় পায়।'

'পুলিশ তারে ভয় পাইবো কেন ? সে কি আর্মি নাকি ?'

'সেইটাই তো চিন্তার বিষয়। সে ডেনজারাস মানুষ। তার আসল বিষয়টা তো আমার বুঝতে হইবো। আমি সিওর, সে-ই আমার বাপরে খুন করছে...।'

হেলাল সপাটে চড় বসাল খলিফার গালে। খলিফা টিনটিনে কিশোর। সে ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হেলালের দিকে। হেলাল বলল, 'তোর তো ঝামেলা আছে। এত ঝামেলা নিয়া তো মিয়াভাইর এত কাছে কেউ যাইতে পারে না। তুই গেলি কেমনে ?'

এটা খলিফার কাছেও আশ্চর্যের বিষয়। ফজলু মিয়া লোকটা রহস্যজনক। তার আশপাশের লোকেরা তাকে ভালো যেমন বাসে, তেমনি ভয়ও পায়। সে এ কদিনে ফজলু মিয়া সম্পর্কে টুকটাক কিছু তথ্য পেয়েছে। ফজলু মিয়ার লোকজনের ধারণা, তার মধ্যে বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতার কারণেই সবাই তাকে ভয় পায়। কেউ কিছু

বলে না। পুলিশ-প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত। সদরঘাট থেকে সোয়ারিঘাট, কেরানীগঞ্জ থেকে জুরাইন, এই পুরো এলাকা জুড়েই তার একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু তার সেই আধিপত্য বাইরে থেকে দেখা যায় না। দেখা যায় ভেতর থেকে। তবে সেই ভেতরে কেউ ঢুকতে পারে না। ভেতরে ঢোকার দরজা ফজলু মিয়া বন্ধ করে রাখে। আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, ফজলু মিয়া নিজে সেই দরজা খুলে খলিফাকে ভেতরে টেনে নিয়েছে। এই নিয়ে সবার মধ্যেই একটা ফিসফাস-কানাকানি। তবে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলছে না।

এর কারণও অবশ্য আছে। ফজলু মিয়ার কিছু অলিখিত নিয়ম আছে। তার আশপাশের লোকজন কেবল চোখ দিয়ে দেখবে আর কান দিয়ে শুনবে। কখনোই মুখ দিয়ে কিছু বলবে না। তাদের মুখ থাকবে বন্ধ। ফলে ফিসফাস চললেও তারা সেই মুখে কিছু বলে না।

সন্ধ্যায় খলিফাকে ডাকল ফজলু মিয়া। তার সঙ্গে এল হেলালও। ফজলু মিয়া বলল, 'খলিফার সাথে আমার কথা আছে। তুই বাইরে যা।'

বহু বছর ধরেই ফজলু মিয়ার ছায়াসঙ্গী হেলাল। সে তার সব গোপন খবরই জানে। কিন্তু এই ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। খানিক অবাক হলেও কিছু বলল না সে। ফজলু মিয়া নিশ্চয়ই তার চেয়ে ভালো বোঝে। ফজলু মিয়া খলিফাকে বলল, 'তোর মা কেমন আছে ?'

'জে ভালো।'

'তোর বইন ?'

'ভালো।'

'তারা দুইজন নাকি আমারে নিয়ে আজেবাজে কথা ছড়াইতেছে ?'

খলিফা চুপ করে রইল। ফজলু মিয়া বলল, 'শুনছি পুলিশের কাছেও নাকি গেছিলো ?'

'জে। তয় আপনের নামে কিছু বলতে যায় নাই। গেছিলো আব্বার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে।'

'তারা নাকি পুলিশরে বলছে, আমার কাছে তোর আব্বার খোঁজ থাকতে পারে ? পুলিশ জানি আমারে জিজ্ঞাসাবাদ করে ?'

খলিফা খানিক চুপ করে কী ভাবল। তারপর ফট করে কথাটা বলল, 'পুলিশের কাছে গেলেই কী আর না গেলেই কী ? পুলিশও তো আপনেরে ভয় পায়...।'

'তুই পাস ?'

খলিফা জবাব দিল না। ফজলু মিয়া বলল, 'কথা বল। কিছু জিজ্ঞাস করলে, চুপ থাকা আমার পছন্দ না। তোর ভয়ের খবর কী ? তোর ভয় গেছে, না আছে ?'

খলিফা মাথা নিচু করে বলল, 'আছে।'

'কম না বেশি ?'

'বেশি।'

'শোন, এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের মইধ্যে আনন্দ সহজে ছড়ানো যায় না। সহজে ছড়ানো যায় ভয়। বুঝলি ?'

'জে।'

'তুই একটা কাজ করবি।'

'কী কাজ ?'

'এই যে তুই আমারে ভয় পাস, এই ভয়টা তুই তোর মা আর বইনেরেও পাওয়াবি। পারবি না ?'

খলিফা কথা বলল না। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। ফজলু মিয়া আচমকা ঘুরে বসল। খলিফার মুখোমুখি। তার চোখ টকটকে লাল। কপালের শিরাটা দপদপ করছে। সে তার মোটা সাদাটে জিভ দিয়ে কালো ঠোঁট জোড়া ভেজাল। তারপর গা হিম করা হিসহিসে গলায় বলল, 'আমি লোক ভালো না খলিফা। আমি খারাপ লোক। খুব খারাপ লোক।'

খলিফা সেই কথা শুনল কি না বোঝা গেল না। তবে তার সারা শরীর তীব্র আতঙ্কে শিরশির করে উঠল।



সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। শায়লা বেগমের দুশ্চিন্তা বাড়ছে তার চেয়েও দ্রুত। ক্রমশই কেমন রুক্ষ আর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন তিনি। সেদিন রাতে হঠাৎ ঘটনাটা ঘটল। শায়লা বেগম রান্নাবান্না শেষে টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে বাথরুমে গেছেন। গোসল করে খেতে বসবেন। রাতে গোসল করা তার অভ্যাস। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও বাথরুম থেকে আর বেরুলেন না তিনি। নদী বার কয়েক ডাকল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া মিলল না। চিন্তিত নদী দরজায় ধাক্কাধাক্কিও করল। লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালাকে খবর দেওয়া হলো। বাড়িওয়ালা লোক নিয়ে এসে দরজা ভেঙে শায়লা বেগমকে বের করলেন। তিনি তখন বাথরুমের মেঝেতে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্ত মিশে যাচ্ছে বাথরুমের মেঝেতে জমা পানিতে। দৃশ্যটা ভয়ংকর। তড়িঘড়ি করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার অবশ্য আশ্বস্ত করলেন যে তেমন গুরুতর কিছু নয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তবে সামনের দিনগুলোতে সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে। ক্রমাগত অনিয়ম আর দুশ্চিন্তায় উচ্চ রক্তচাপসহ নানা ধরনের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। দীর্ঘ বিশ্রাম আর যত্ন দরকার তাঁর।

বিষয়টা যেন একটা অশনি সংকেতের মতো হয়ে গেল। নানাবিধ ঝড়ঝাপ্টায় বিধ্বস্ত এই পরিবারটা এবার সত্যি সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠল। বিশেষত নদী। এই ঘটনায় দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে। হঠাৎ যদি মায়ের কিছু হয়ে যায়, তাহলে কী করবে সে ? এতদিনে নদী একটা ব্যাপার বুঝেছে, ওই যে বাবা মৃতপ্রায় মানুষ হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। কোনো সাড়া-শব্দ নেই, ওজর-আপত্তি নেই। কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না। তারপরও তিনি যেন একটা ছায়ার মতো। তারা ওই পরিচয়টা ধারণ করে। চারপাশের মানুষ, বন্ধু, স্বজন, প্রতিবেশী, এমনকি বাইরের জগতেও ওই মানুষটার উপস্থিতিই যেন তাদের অস্তিত্বকে নির্ভার, সুসংহত রাখে। আর মা ? মা যদি না থাকেন ? নদী আর ভাবতে পারে না। নীতুর ওই অবস্থা। বাবার মৃতপ্রায় জীবন। এ সবকিছু এক পাশে সরিয়ে রেখেও সে তার কাজটা করে যেতে পারছে। সংসারের হালটা শক্ত করে ধরে রাখতে পারছে। কিন্তু মায়ের কিছু হয়ে গেলে কী করবে সে ?

একমুহূর্তে হাল ভাঙা এক জাহাজ হয়ে যাবে এই সংসার। আর যে জাহাজের হালই নেই, সেখানে নাবিক যত দক্ষই হোক না কেন, তাকে নিরুদ্দেশ ভেসে যেতে হয় ঢেউয়ের টানেই। এতদিনে এসে নদীর মনে হলো, যত যুদ্ধই সে করুক না কেন, মা

যত চুপচাপ, শান্ত কিংবা আটপৌরে চিন্তার পুরোনো মানুষই হয়েই থাকুন না কেন, শেষ অবধি সবার অগোচরে, নিভৃতে, অনুচ্চারে এই সংসারের হালটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন তিনিই। তাঁর কিছু হয়ে গেলে তারা কেউ আর পায়ের তলায় দাঁড়াবার শক্ত জায়গাটুকুও পাবে না।

সেদিন রাতে সে শায়লা বেগমকে বলল, 'মা।'

'হু।' শায়লা বেগম নামাজ পড়ে অন্ধকারে শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথাটা একটু ভার ভার লাগছে। গায়ে সামান্য জ্বর।

নদী বলল, 'খুব খারাপ লাগছে ?'

'উঁহু।'

নদী শায়লা বেগমের গালে হাত ছোঁয়াল। তারপর বলল, 'তুমি ভালো হয়ে ওঠো মা। তুমি এমন থাকলে আমার ভালো লাগে না।'

শায়লা বেগম তাঁর গালের সঙ্গে নদীর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'আমি তো ভালোই আছি।'

'উঁহু। তুমি ভালো নেই।'

শায়লা বেগম খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'তোরা ভালো না থাকলে আমি কী করে ভালো থাকব ?'

'আমরা তো ভালো আছি মা।'

'মা রে...।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শায়লা বেগম। তারপর বললেন, 'মা হলে আর ভালো থাকা যায় না। সব সময় খারাপ থাকতে হয়।'

'কেন ?'

'কারণ মন ছোট হয়ে যায়। সারাক্ষণ ছেলেমেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। এই দুশ্চিন্তার কোনো শেষ নেই। গাছের পাতাটা একটু জোরে শব্দ করে পড়লেও বুক কেঁপে ওঠে, এই বুঝি আমার সন্তানের কিছু হলো। এই ভয় আর বাকি জীবনে কাটে না।' বলে একটু থামলেন শায়লা বেগম। নদী হঠাৎ আবিষ্কার করল মায়ের গালে রাখা তার হাতটা ভিজে যাচ্ছে। সে অস্ফুটে বলল, 'মা! তুমি কাঁদছ ?'

শায়লা বেগম কথা বললেন না। নিঃশব্দ অন্ধকারে তাঁর গাল বেয়ে নেমে যেতে লাগল উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। নদী দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরল। গালের সঙ্গে গাল চেপে ধরে শুয়ে রইল। শায়লা বেগম ভেজা গলায় বললেন, 'নীতুর কথা ভাবলে বুকটা ছিঁড়ে যায়। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে। তোর বাবার ওই অবস্থা। তোর চিন্তায় একটু স্থির হতে পারি না। আমি কী করে ভালো থাকব ?'

নদী কথা বলল না। সে মায়ের দুশ্চিন্তাটা বোঝে। অসুস্থতাটাও। ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে রোজ যুদ্ধ করতে হয় তাকে। এই যুদ্ধ থেকে কী করে সে মুক্তি দেবে তাকে ?

নদী ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। কেউ একজন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। একটু পরপর ফুঁ দিয়ে দিচ্ছে মাথায়। নদী চোখ খুলল না। এই স্পর্শ সে চেনে। এই ঘ্রাণও। মাঝরাতের গাঢ় অন্ধকারে নদী হঠাৎ একজোড়া রুক্ষ ঠোঁটের স্পর্শ পেল তার কপালে। তারপর গালে। তার আচমকা কেমন কান্না পেয়ে গেল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে মাকে জড়িয়ে ধরতে। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে। কিন্তু সে তার কিছুই করল না। গুটিসুটি মেরে শুয়েই রইল। শায়লা বেগম আবার জায়নামাজে ফিরে গেলেন। তারপর মোনাজাত ধরলেন। নদী চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকারেও সাদা শাড়ি পরা প্রার্থনারত মায়ের অবয়বটা দেখতে পেল সে। শায়লা বেগম মোনাজাতে কাঁদছেন। সেই কান্নায় স্বামী-সন্তানের জন্য কী করুণ আকুতি ঝরে পড়ছে স্রষ্টার কাছে! কী আকুল হয়ে কেঁদে যাচ্ছেন তিনি। নদীর বুকের ভেতরটা অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

শায়লা বেগম মোনাজাত শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঢুকে গেলেন নীতুর ঘরে। বিষয়টা প্রথম বুঝতে পারল না নদী। সেও পা টিপে টিপে নীতুর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। শায়লা বেগম বেশ কিছুক্ষণ নীতুর মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর একইভাবে দোয়া পড়ে ফুঁ দিতে লাগলেন তার ঘুমন্ত চোখে-মুখে। নিচু হয়ে আলতো করে চুমুও খেলেন। ঘুমে অচেতন নীতু কি তা টের পেল ? সে কি জানল, এই পৃথিবীর অসংখ্য নিদ্রিত মানুষের মাঝে একজন মাত্র মানুষ তার জন্য বিনিদ্র রাত কাটায় ? প্রার্থনায় সমর্পণ করে নিজেকে। কেবল তার জন্য।

নদীর হঠাৎ মনে হলো, তাতে শায়লা বেগমের কিছু যায় আসে না। এই ভালোবাসা প্রকাশ্যে বা অগোচরে, নিভৃতে বা সরবে একই রকম। কিংবা প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনে আরও বেশি সোচ্চার। আরও বেশি তীব্র। সজলের কথাটা হয়তো সত্য নয়। জগতের সব ভালোবাসাই প্রাপ্তির কথা ভাবে না। এই একটি মাত্র ভালোবাসা, এই একটি মাত্র অনুভব যা নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ। এই গভীর রাতের অন্ধকারে, এই নীরব-নিভৃত ঘরের কোণে, সকলের অগোচরে শুভ্রবসনা ওই নারীর যে স্পর্শ, যে প্রার্থনা, তা জগতের আর কিছুর সঙ্গেই তুল্য নয়।

পরপর আরও কটা দিন কেটে গেলেও ওই রাতটা নদীর ভেতরটা এলোমেলো করে দিল। তাদের দুবোনকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তাটা সে বুঝত। কিন্তু সেটা যে এত প্রবল, এত তীব্র তা সে পুরোপুরি অনুভব করল সেই রাতে। এবং সে এও জানত, মায়ের এই দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় উপশমটা তার কাছেই আছে। এই নিয়ে আরও বেশ কিছুদিন ভাবল সে। তারপর হঠাৎই মনে হলো, দেরি করার তো আর কোনো কারণ নেই! যে দ্বিধাটুকু তার ছিল, তা তো কেটেই গেছে। তাহলে আর কেন দেরি করছে সে ?

সজল অবশ্য সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'মানে!' রীতিমতো চমকে উঠল নদী।

'রেগে যেয়ো না প্লিজ।' সজল হাতজোড় করে বলল। 'ঠিক... এই মুহূর্তে... মানে... বিয়ে করার মতো অবস্থা আমার নেই।' ইতস্তত করছে সে।

'বিয়ে করার জন্য কী অবস্থা থাকতে হয় ?'

'আমি চাকরিবাকরি কিছু করি না। নিজের মতো থাকি। একটা বোহেমিয়ান লাইফ। কোনো কিছুর কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। হ্যাঁ, নিজের কিছু স্বপ্ন আছে। ওগুলো নিয়েও দিনরাত পড়ে আছি। কিন্তু এটা অনেকটা লটারি বা বাজি ধরার মতো ব্যাপার। জেতার চেয়ে যেখানে হারার চান্সই সব সময় বেশি থাকে, তারপরও আমরা আশায় আশায় ধরতেই থাকি।'

'কী বাজী শুনি ?'

'তুমি তো জানো আমি পড়েছি মৃৎশিল্পে।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল সজল। 'পেইন্টিংয়েও ভালো ছিলাম। কিন্তু আগ্রহটা ছিল পটারি। সব সময়ই মনে হতো, এটা নিয়ে দারুণ কিছু করতে চাই আমি। মাটির নানান উপকরণ দিয়ে এমন সব জিনিস তৈরি করা যায় যে দেশীয় শিল্পে একটা হইচই ফেলে দিবে। তুমি দেখো, মানুষ আজকাল মাটির গহনা থেকে শুরু করে ঘরের শোপিস, ফ্লাওয়ার ভাস, এমনকি রান্নার বাসনকোসন অবধি মাটির খুঁজছে। এটা ফ্যাশনের একটা ট্রেন্ড বা সাইকেল বলতে পারো। চক্রের মতো ব্যাপার। মানুষ তার শেকড় থেকে শিখরে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আবার শেকড়ে ফিরে আসে। এখন সবকিছু এত বেশি প্রযুক্তিক, আর্টিফিশিয়াল যে মানুষ আবার প্রকৃতির স্পর্শ পেতে চায়। এই জায়গাটাতে জাস্ট কিছু ফিউশান, এডাপ্টেশন করতে পারলে...।' সজলের চোখ চকচক করছে। 'জানো, আমি একটা নামও ঠিক করে ফেলেছি, আমার দোকানের নাম হবে, মৃত্তিকা মায়া। মাটির চেয়ে এমন মায়াময় কিছু আর আছে ?'

'উঁহু।'

'নামট সুন্দর না ?'

'হু।'

'ধরো, প্রথমেই তো আর বড় কোনো শোরুম টোরুম নিতে পারব না। নিজেরাই বানাব। প্ল্যান ছিল কোনো একটা ফুটপাত টুটপাতেই বসে যাব। তারপর ধীরে ধীরে...'

'তাহলে শুরু করছ না কেন ?' সজলকে থামিয়ে দিয়ে খুব নির্বিকার ভঙ্গিতেই কথাটা বলল নদী। সজলের কিছু করা না-করা নিয়ে সে মোটেই ভাবিত নয়। সজল যা-ই করুক না কেন, তাতেই তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। শুধু সে তাকে একটু আগলে রাখলেই হবে। খানিক যত্ন করলেই হবে। এর বেশি কিছু চায় না সে। বাকিটা সে নিজেই করবে। সজল যে খুব উপার্জনশীল সংসারী স্বামী হবে, এটা নদী আশাও করে না।

'করব। আমরা আসলে একজন ইনভেস্টর খুঁজছি। ছোট আকারে শুরু করতেও একটা ইনভেস্টমেন্ট তো লাগবে। ওটা ম্যানেজ করার চেষ্টা চলছে। হয়ে গেলেই শুরু করে ফেলব।'

'আমরা কারা ?'

'আমরা কয়েকজন বন্ধু।'

'বন্ধুরা মিলে নয়। কাজটা করবে তুমি একা।'

'একা! কীভাবে ?' সজল প্রায় আঁতকে উঠল। 'এত টাকা আমি কোথায় পাব ?'

'আমি দেব।'

'তুমি দেবে মানে ?'

'আমি দেব মানে আমি দেব।'

'কেন ? আর তোমার টাকাই বা আমি কেন নেব ?'

'কারণ... আমি তোমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী মানে ?'

'ওয়াইফও বলতে পারো। মানে বিয়ের পর তো তা-ই হয়, নাকি ? আর তখন তুমি আর আমি বলে আলাদা কিছু তো থাকছে না। ওটা আমরা হয়ে যাচ্ছে। সো, এই নিয়ে আর কথা নয়।'

সজল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই নদী তাকে থামিয়ে দিল। তারপর বলল, 'একটা সময় পর জীবন ভাগাভাগি করে নিতে হয়। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, যুদ্ধ সব। আমরা সেই জীবনটা শুরু করতে যাচ্ছি। এখন এমন করলে চলে সজল ?'

সজল কথা বলল না। তবে নদীর প্রস্তাবটা যেন সে মেনেও নিতে পারছে না। নদী বলল, 'আমাদের সামনের জীবনটা হতে হবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার। সমর্থন আর সহযোগিতার। এই যে আমি দিনরাত শুটিংয়ে থাকি, এটা নিয়ে তোমাকে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হবে না ? হয়তো আমি তোমাকে ঠিকঠাক সময় দিতে পারব না। হয়তো রাত করে বাড়ি ফিরব। হয়তো আরও অনেক কিছুই হবে। সেগুলো তুমি মেনে নেবে না ?'

'কেন নেব না ? ওটা তোমার প্রফেশন। তোমার ভালো লাগার জায়গা।'

'হুম। এটাই। এই বোঝাপড়াটাই দরকার। সম্পর্কে সবাই সবচেয়ে বড় কী ভুলটা করে জানো ?'

সজল তাকাল। নদী বলল, 'সবাই ভাবে সম্পর্কে সবক্ষেত্রে দুজনের সমান কন্ট্রিবিউশান থাকতে হবে। আমি যেমন তার জন্য এটা করেছি, ওটা করেছি, সে কেন করবে না ? সবকিছু সমান সমান হতে হবে। সবাই মনে করে এতেই বুঝি সম্পর্কটা ভালো থাকে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। দুজনের পক্ষে কখনোই সবকিছুতে সমান কন্ট্রিবিউশান সম্ভব নয়। হয়তো কোথাও একজন ষাট ভাগ করল, অন্যজন চল্লিশ।

আবার অন্য কোথাও হয়তো একজন মাত্র দশ, অন্যজন নব্বুই। কিন্তু এই দুজনেরটা মিলেই শতভাগ সম্পর্ক। এখানে ফিফটি-ফিফটি কোনো কিছুই হয় না। মানুষ তো আর প্রোগ্রামড কোনো সফটওয়ার বা যন্ত্র নয়। ফলে একদম একই জায়গায় দুজনের সমান সক্ষমতা কিংবা সহনশীলতাও হবে না, আর এটাই স্বাভাবিক। তাই না ?'

নদী থামলেও সজল কথা বলল না। এই নদীকে যেন সে নতুন করে দেখছে। শান্ত, গভীর। নদী বলল, 'আমি আমার সাধ্যমতো সবটুকু করব। তুমি কেবল যেখানে আমার ক্ষমতি থাকবে, অক্ষমতা থাকবে, সেটুকু তোমার সক্ষমতায় পূরণ করে নিয়ো।'

এমন মায়াময় ভঙ্গিতে কথাটা বলল নদী যে সজল আলতো হাতে তার গাল ছুঁয়ে দিল। তারপর বলল, 'তুমি আজ কেমন অন্যরকম।'

'অন্যরকম কেমন ?'

'নদীর মতোন।'

'আমি তো নদীই।'

'উঁহু। সত্যিকারের নদী।'

'আমি কি তবে মিথ্যেকারের নদী ?' নদী গাল ফোলাল।

'আহ, তা না। নদী যেমন শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর এবং গভীর। আজকের তুমি তেমন।'

নদীর হঠাৎ মন ভালো হয়ে গেল। সজল মাঝে মাঝে এত সুন্দর করে কথা বলে! তখন সকলের চোখ এড়িয়ে টুক করে তাকে চুমু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এখনো করছে। কিন্তু তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে শাহবাগের মাঝখানের সড়কদ্বীপে। চারপাশে অজস্র মানুষ। সন্ধ্যার অফিসফেরত মানুষের ভিড়। ব্যস্ত শহর। এখানে সে সজলকে চুমু খাবে কী করে ?

নদীর হঠাৎ মনে হলো, যখন তখন সজলকে চুমু খেতে হলেও তাকে দ্রুত বিয়ে করতে হবে।



সংগঠনটির নাম 'পথপুষ্প'। ছিন্নমূল শিশুদের নিয়ে কাজ করে। কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশে তাদের একটা স্কুলও আছে। সেই স্কুলে নীতু বাচ্চাদের পড়ানোর একটা কাজ পেয়ে গেল। এমন নয় যে সেখানে সে অনেক পয়সা-কড়ি পাবে। তবে তার নিস্তরঙ্গ জীবনে এ যেন খানিক ছন্দময় স্পন্দন। দমবন্ধ অন্ধকার ঘরের ঘুলঘুলিতে এক চিলতে আলো। খানিক ফুরফুরে সতেজ হাওয়া। প্রথম দিন গিয়েই মন ভালো হয়ে গেল নীতুর। সত্যি সত্যিই স্কুলঘর জুড়ে যেন ফুলের মেলা বসেছে। টুকটুকে লাল জামা পরা শিশুগুলো প্রজাপতির মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। স্কুলের পরিচালকের নাম আকিব। আকিব নীতুর সমবয়সীই। তবে তাদের পরিচয়টা বেশ আগের। স্কুল স্কাউটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল দুজনই। সেবার ঢাকার আন্তঃস্কুল স্কাউট সম্মেলনে নিজ নিজ স্কুল থেকে অংশ নিয়েছিল তারা। সেখানেই পরিচয়। পরিচয় বলতে খানিক কথা। পরস্পরকে জানা। এরপর ফোনে খোঁজখবর নেওয়া। মেসেজ আদান-প্রদান। এর বেশি কিছু নয়। পরে অবশ্য যোগাযোগটা কমে এসেছিল। এসএসসি পরীক্ষা, কলেজে ভর্তি, নতুন বন্ধুবান্ধব, নানাবিধ সম্পর্ক-সংযোগে ধীরে ধীরে সেই যোগাযোগটা একদম নাই হয়ে গিয়েছিল। নীতু বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিল আকিবের কথা।

সেই আকিব হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো কে জানে! সে সেদিন ফোন করে বলল, 'নীতু বলছেন ?'

নীতু নিরাসক্ত গলায় বলল, 'কে ?'

'আকিব।'

'আকিব ?' পাল্টা প্রশ্ন করল নীতু। এই এতদিন পরে আকিবকে তার চেনার কথা নয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই আকিবকে চিনতে পারল সে। খানিক কৌতূহলী গলায়ই বলল, 'স্কাউটের আকিব। রাইট ?'

আকিব হাসল। তার হাসি সুন্দর। জলের কলরোলের মতো। সে বলল, 'আই অ্যাম সারপ্রাইজড!'

'আমিও! কত দিন পর! আই জাস্ট কান্ট বিলিভ ইট। কী মনে করে এতদিন পর ?'

'আরে শোনো কী হয়েছে। সেবার স্কাউটের ওই কনফারেন্স থেকে সবাইকে নোটবুক দিয়েছিল মনে আছে ?'

'হু।'

'সেখানেই সবার নম্বর লিখে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু পরে নোটবুকটা হারিয়ে ফেলি। কত যে খুঁজেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ হঠাৎই পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে একনাগাড়ে সবাইকে ফোন করে যাচ্ছি। তবে মজার ব্যাপার কী জানো ?'

'কী ?'

'একমাত্র তুমিই সাথে সাথেই চিনতে পেরেছ। আর কেউ পারল না।'

'আহারে!' বলে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করল নীতু।

'তোমার পাখিটা এখনো আছে ?' প্রসঙ্গ পাল্টাল আকিব।

নীতু কপাল কোঁচকাল, 'কোন পাখি ?'

'ময়না। তোমার বাবা কোথা থেকে যেন এনেছিল। মনে নেই ? কথা বলতে পারত। তোমাকে বলত লিচু।'

নীতু হঠাৎ হাসল। তার মনে পড়েছে। সে বলল, 'হেইই! ও নীতুই বলত। কিন্তু পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারত না বলে মনে হতো লিচু বলছে।'

'তোমাকে আমরা এটা নিয়ে খুব ক্ষ্যাপাতাম, মনে আছে ?'

'থাকবে না আবার ? কোন কুক্ষণে যে সবাইকে ওই গল্প বলতে গেছিলাম!'

'একবার আমাদের টিম লিডার শফি স্যার বলল, উই শ্যাল ওভারকাম গানটা তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভালো গাইতে পারে ? এক ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, লিচু স্যার। লিচু সবচাইতে ভালো গায়। মনে আছে ? স্যার বুঝতে না পেরে ফের জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তখন একযোগে বলতে লাগল, লিচু লিচু লিচু। মনে আছে ?'

'উফ! ভয়াবহ...।' বলে হাসতে লাগল নীতু। 'স্যার তো হতভম্ব। হচ্ছেটা কী এসব। আমি তখন দাঁড়িয়ে খুব নিরীহ গলায় বললাম, না মানে স্যার, এখন তো লিচুর সিজন... বাজারে নতুন লিচু এসেছে, তো সবাই বলছে সেটা না খাওয়ানো অবধি কেউ গান গাইবে না। হা হা হা। কী সব দিন যে ছিল। তাই না ? দৌজ কালারফুল ডেইজ।'

কত দিন পরে এভাবে হাসল নীতু ? সে জানে না। তবে তার বুকের ভেতর বন্ধ থাকা দরজা-জানালাগুলো যেন এক এক করে খুলে যেতে লাগল। খানিক আলো হাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে ভাবটা দূর হতে লাগল।

আকিব বলল, 'একদম।' তারপর নীতুকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ভরাট গলায় গাইল 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি...।'

নীতু অবাক হয়ে গেল। আকিব গান গায় সে জানত, কিন্তু সেটা যে এত ভালো, তা সে জানত না। আকিব থামতেই বলল, 'থামলে কেন ?'

'অন্য কোনোদিন গাইব বলে।'

'আর অন্য কোনোদিন! তোমার সাথে আবার কবে কথা হয় কে জানে ?'

আকিব কী ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল, 'তুমি চাইলে রোজই দেখা হতে পারে।'

'রোজ ? কীভাবে ?' অবাক হলো নীতু।

আকিব তখনই স্কুলে পড়ানোর প্রস্তাবটা দিল। নীতু খানিক ভাবল। আর ভাবতে গিয়ে মনে হলো, এই সময়ে তার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো সুযোগ আর হয় না। সে দুদিন বাদেই স্কুলে যেতে শুরু করল। বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেকের ক্লাস। সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু দিন কয়েক যেতেই নীতুর মনে হতে লাগল, যদি রোজ আসা যেত! আকিব মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। অসম্ভব প্রাণশক্তি তার। মন খারাপ করে থাকা কাছের মানুষ কিংবা থমথমে চারপাশটা মুহূর্তেই ঝলমল করে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। নীতু যতক্ষণ আকিবের কাছাকাছি থাকে, ততক্ষণই তার মনে হয়, এই বুঝি চড়ুই পাখির ডানায় ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল সময়। অথচ এতদিন কী ভয়ংকর স্থির, স্থবির এক সময়ই না সে কাটিয়েছে!

শুধু আকিবই নয়, এই স্কুলটাকেই এত বেশি প্রাণবন্ত আর উচ্ছল মনে হয় নীতুর! চারপাশে যেন ফুল-পাখিদের মেলা। শিশুগুলো যখন সীমাহীন উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে তখন কী যে ভালো লাগে তার! এ যেন এক রঙিন ফুলের বাগান। এখানে পাখিদের অবিরাম কলকাকলিতে মুখরিত জীবন-জগৎ।

নীতুর আজকাল ইউনিভার্সিটির ক্লাস করতে ভালো লাগে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। সে সারাক্ষণ অপেক্ষায় থাকে, কখন স্কুলের সময় হবে ? আর রোজ সন্ধের দিকে মন খারাপ হতে থাকে। কেন এমন টুক করে সন্ধে নেমে আসে ? সময়টা চলে যায়!

মাসখানেক পর নীতুর মনে হতে লাগল, ক্লাসগুলো যদি আরও লম্বা হতো। কিংবা আরও বেশি সময় ধরে ওখানে থাকতে পারত সে! বাচ্চাগুলো যখন ক্লাস জুড়ে হইহল্লা করে, খিলখিল করে হাসে, খুনসুটি করে, নীতু তখন অদ্ভুত ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে থাকে। সেদিনও এমন তাকিয়ে ছিল। সেই মুহূর্তে আকিব এল। সে এল নীতুকে চমকে দিয়ে। নীতুর চোখের সামনে হাত নাড়িয়ে হঠাৎ বলল, 'হেই! কী হয়েছে ?'

নীতু প্রায় কেঁপে উঠে ফিরে তাকাল, 'কী হবে ?'

'কখন থেকে ডাকছি তোমাকে!'

'কখন ?' নীতু নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

'অনেক্ষণ! কিন্তু তুমি শুনছিলেই না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। কী হয়েছে তোমার ? শরীর খারাপ ?'

'নাহ!'

'মন খারাপ ?'

'আরে নাহ।'

'তাহলে কাঁদছ যে ?'

'কাঁদছি ?' ভারি অবাক হলো নীতু।

'হুম। তোমার চোখে পানি।' আকিব মৃদু গলায় বলল।

নীতু হতমত খেয়ে যাওয়া ভঙ্গিতে ওড়নায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোমাদের এখানকার চকগুলো যেন কেমন। খুব ভঙ্গুর। বোর্ডে একটু লিখতে গেলেই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। তারপর বাতাসে ভাসতে থাকে। চোখে লাগলে খুব জ্বালা করে চোখ। দেখছ না কেমন লাল হয়ে আছে ?'

আকিব দেখেছে। কিংবা দেখে নি। সে নীতুর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'বাসায় যাবে না ?'

'হু।'

'চলো আমি পৌঁছে দেই।'

'কেন ? আমি একা যেতে পারব তো!'

'তাতে কী ?'

নীতু আর আকিব সেদিন একসঙ্গে বাড়ি ফিরল। আকিব অবশ্য ঘর অবধি এল না। নিচ থেকেই চলে গেল। তবে বহুদিন পর ওই সন্ধ্যাটা কী যে ভালো লাগল নীতুর! আকিব কবিতার মতো করে কথা বলে। সে বলল, 'মন খারাপ হলে কী করতে হয় জানো ?'

'কী ?'

'হিজলগাছের তলায় বসে থাকতে হয়।'

'মানে ?'

'মানে ছোটবেলায় আমার খুব প্রিয় একটা হিজল ফুলের গাছ ছিল। পুকুরপারে। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে আধবোজা চোখে আমি সেই হিজল তলায় গিয়ে বসে থাকতাম। রেশমের মতন ফুলে গাছের নিচটা কারপেটের মতো হয়ে যেত। পায়ের তালুতে লাগতেই শিরশির করে উঠত শরীর। তারপর পুকুরের পানিতে যখন মুখ ধুতে যেতাম, দেখতাম পুরো পুকুর ছেয়ে আছে ফুলে ফুলে। কী যে সুন্দর! কী যে সুন্দর! মনে হতো আস্ত একটা ফুলের পুকুর ওটা। আমি দুহাতে সেই ফুল সরাতেই তার নিচ থেকে যেন শিশুর হাসির মতো খিলখিল করে হেসে উঁকি দিত টলটলা স্বচ্ছ জল। সেই জলের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতাম আমি।'

'কেন ?'

'কারণ ওই জলে আমার মুখ দেখা যেত। আমি ওটাকে বলতাম জলের আয়না। তো সেই জলের আয়নায় ভেসে ওঠা আমার মুখের চারপাশজুড়ে ভেসে থাকত অজস্র হিজল ফুল। কী অপার্থিব সুন্দর যে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। এরচেয়ে সুন্দর কিছু আর কখনো দেখি নি আমি। এখনো যখন মন খারাপ হয়, কিচ্ছু ভালো লাগে না, আমি তখন চুপিচুপি সেই হিজল ফুলের গাছ, সেই পুষ্প-পুকুর, সেই স্বচ্ছ জলের আয়নার কাছে ফিরে যাই। তারপর আর সব ভুলে সেখানে ডুবে থাকি।'

'এখনো সব আছে আগের মতোই ?'

'উঁহু। কিছুই নেই। গাছটা কবেই কেটে ফেলা হয়েছে। পুকুরটাও ভরাট হয়ে গেছে।'

'তাহলে ? তুমি যে বললে এখনো মন খারাপ হলে সেখানে গিয়ে বসে থাকো ?'

'থাকি তো!' বলে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল আকিব।

'কীভাবে!'

'কল্পনায়।'

'মানে কী ?'

'মানে...।' বলে একটু থামল আকিব। তারপর বলল, 'মানে হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের বুকের ভেতরই নিজের একটা জগৎ থাকে। কেবল একার। কেউ সেটার খোঁজ পায়, কেউ পায় না। যে পায়, সে তার চারপাশের পৃথিবীর এত জঞ্জাল, এত জটিলতা, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা থেকে খানিক অবসর পেতে তার নিজের ওই কল্পনার জগতটাতে ঢুকে যেতে পারে। খোলা মাঠেও শামুকের মতোন আচমকা খোলস বন্ধ করে একা হয়ে যেতে পারে। আর ওই জগতটার অধিশ্বর সে নিজেই। সেখানে আর কারও কোনো প্রবেশাধিকার নেই। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণারও না।'

আকিবের কথাগুলো এত ভালো লাগছিল নীতুর! সে ভেবেছিল, আর কখনো কিছু ভালো লাগবে না তার। কখনো আর মন খুলে হাসতে পারবে না সে। অন্তও কম চেষ্টা করে নি। এখনো করছে। প্রবল এক অপরাধবোধ থেকে প্রতিটি মুহূর্তে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে নীতুকে খানিক আনন্দ দিতে। আগের মতো আলোঝলমলে করে তুলতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। অথচ মাত্র কদিনেই আকিব যেন সবকিছু অন্যরকম করে দিতে লাগল। সেই অন্যরকমটা বড় ভালো লাগে নীতুর। একটু একটু করে যেন ক্রমশই নিজেকে ফিরে পেতে লাগল সে। ওই স্কুলের সময়টুকু, ফেরার পথে মাঝে মাঝে আকিবের সঙ্গ, তার গল্প, আড্ডা, ভাবনা ক্রমশই যেন ফিরিয়ে দিতে লাগল পুরোনো নীতুকে। ধূসর হয়ে যাওয়া জীবনের পাতাটা ক্রমশই আবার সবুজ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সেখানেও আলগোছে সযতনে যেন লেগে রইল গভীর বিষণ্নতার ছাপ। ওই ছাপটা সবাই দেখতে পায় না। কেউ কেউ পায়। আকিব সেই কেউ কেউর একজন। তবে সে কখনো সেটা নীতুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে না। কারণ সে জানে, সবারই খুব ব্যক্তিগত কিছু গল্প থাকে, অনুভব থাকে। যতক্ষণ না সে নিজে তা কাউকে বলতে চায়, ততক্ষণ অবধি সেটা জানতে চাওয়া ঠিক নয়। এই পরিমিতিবোধটুকু আকিবের আছে।

হয়তো এ কারণেই আকিবের সঙ্গ ভালো লাগে নীতুর। হুটহাট দেখা করতে ইচ্ছে হয়। কথা বলতে ইচ্ছে হয়।

সেদিন অন্ত হঠাৎ বলল, 'আজকাল তুই কি খুব ব্যস্ত ?'

'কেন ?'

'ক্লাস শেষ হতেই কখন কোন ফাঁকে চলে যাস, টেরই পাই না।'

'টের পেতে হবে কেন ? আমাদের বাড়ি ফেরার পথ তো এক নয় যে একসাথে যেতে হবে!'

'কী ?' কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না অন্তর।

'আমাদের ফেরার পথ তো এক নয়।'

নীতু কথাটা খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু অন্ত হঠাৎ থমকে গেল। এটা সত্যি যে নীতুর সঙ্গে তার আগের সেই সম্পর্কটা আর নেই। এখন যেটি আছে সেটি ঠিক বন্ধুত্বও নয়, প্রেমও নয়। এ যেন ক্লাসের সবচেয়ে উপেক্ষিত, গুরুত্বহীন ছেলেটির কারণে-অকারণে ক্লাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেয়েটির গায়ে পড়ে উপকার করতে আসা। এতে মেয়েটির কিছু যায় আসে না। নেহাত ভদ্রতাবশেই সে সেই উপকার যতটা সম্ভব গ্রহণ করে। প্রয়োজনে ডাকে। প্রয়োজন না হলে ডাকে না। এটা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ছেলেটার কিছু বলার নেই। সে বরং উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে, ফের কবে মেয়েটা তাকে ডাকবে। সে আবার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারবে।

এসবই অন্ত টের পায়। আর টের পায় বলেই ভেতরে ভেতরে তীব্র এক যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়। নীতু তার সঙ্গে কখনো দুর্ব্যবহার করে নি। ওই ভয়ানক ঘটনার পরও না। এমনকি রাগ, ঝগড়া কিংবা অভিমানও না। কিন্তু অন্ত জানে, এমন নির্বিকার হয়ে যাওয়ার চেয়ে সে-ই বোধহয় ভালো ছিল। নীতুর উত্তরটা তাই খুব আহত করল তাকে। যত যা-ই হোক, নীতু আশ্চর্যরকম শান্ত আর স্বাভাবিক আচরণই করত তার সঙ্গে। সেখানে গ্রহণ না করলেও প্রত্যাখ্যানও ছিল না। কিন্তু আজ তার ওইটুকু কথা, 'টের পেতে হবে কেন ? আমাদের ফেরার পথ তো এক নয়,' অন্তর বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিনে চোরা যন্ত্রণার এক সুঁই বিঁধে দিতে থাকল।

সে বলল, 'পথ এক না হলে একসাথে ফেরা যায় না ?'

নীতু ভাবলেশহীন গলায় বলল, 'এত জটিল জটিল কথার তর্ক আমার ভালো লাগে না রে অন্ত। শোন, আমি একটা কাজ পেয়েছি। স্ট্রিট চিলড্রেনদের নিয়ে একটা স্কুল আছে কমলাপুরের দিকে। ক্লাস শেষে ওদের পড়াই আমি। এবার হলো তোর ?'

অন্ত যতটা সম্ভব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'তাই নাকি! এটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোটা সত্যিকারের কোয়ালিটি টাইম। আমায় নিবি একদিন ?'

নীতুর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নাছোড়বান্দা অন্তকে এড়ানোর কোনো উপায়ও সে জানে না। ফলে সেদিন ক্লাস শেষে নীতুর সঙ্গে পথপুষ্পের স্কুলে গেল সেও। সেখানে তাকে আকিবের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিল নীতু। ক্লাস শেষে অন্ত বলল, 'চল নীতু, সন্ধে হয়ে আসছে।'

তারা হেঁটে স্কুল কম্পাউন্ড থেকে বের হচ্ছিল। আকিব তখনো স্কুলের কেয়ারটেকারকে কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নীতু বলল, 'দাঁড়া একটু। আকিব আসুক।'

আকিব এল। তবে সেই আসা অন্তর জন্য সুখকর কিছু হলো না। আকিব এসেই চট করে বলল, 'অন্ত, আমরা তাহলে যাচ্ছি, হ্যাঁ ? আবার দেখা হবে।'

অন্তু অবাক গলায় বলল, 'তোমরা কে কে ?'

'আমি আর নীতু।'

অন্তু হতচকিত ভঙ্গিতে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?'

'আমি নীতুকে ওর বাসায় পৌঁছে দিয়ে তারপর যাব। তুমি তো অন্যদিকে যাবে। যাও তাহলে...।'

'তোমার বাসা কোথায় ?' অন্তু ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

আকিব হাসল, 'নাহ্, আমার আর নীতুর বাসা একদিকে নয়। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, এই সন্ধ্যাবেলা ও একা একা অতদূর যাবে। আমার তো এ সময় তেমন কাজ থাকে না। এজন্য মাঝে মাঝে ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি যাই।'

অন্তু আর কথা বলল না। তবে নীতুর দিকে তাকিয়ে রইল সে। নীতু সেই একই ভাবলেশহীন গলায় বলল, 'যাই তাহলে অন্তু। কাল দেখা হবে।'

অন্তু কিছু বলল না। সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ, একা, স্তব্ধ। তখন সন্ধ্যার আকাশ দিগন্তে লাল আভা ছড়াচ্ছে। ওই আভাটুকুর দিকে তাকিয়ে রইল সে। নির্নিমেষ। কতক্ষণ জানে না। তবে অন্তুর হঠাৎ মনে হলো, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যেন তার বুকের বাঁ পাশে ক্রমশই ভারী হয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডটার ওজন আর বইতে পারছে না সে।

রিকশার ফুরফুরে হাওয়ায় নীতুর চুলগুলো উড়ে আসছিল আকিবের মুখে। আকিব অবশ্য সরাচ্ছিল না। একটা মোহনীয় মিষ্টি গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে সেই গন্ধটা বুক ভরে টেনে নিচ্ছে। নীতু বলল, 'আমি যদি সপ্তাহে আরও দুটো ক্লাস নিতে চাই, সম্ভব ?'

'আরও দুটো!' অবাক হলো আকিব। 'তার মানে ফাইভ ডেইজ ইন আ উইক ?'

'হুম।'

'কী বলছ তুমি ? সময় ম্যানেজ করতে পারবে ?'

নীতু ম্লান হাসল, 'আমার অফুরন্ত সময়। কতভাবে চেষ্টা করি, তবুও ফুরায় না।'

'সময় কখন প্রলম্বিত হয় জানো ?'

'জানি।'

'কখন ?'

'যখন জীবন থমকে যায়, সময় তখন দীর্ঘ মনে হয়।'

'তোমার জীবন থমকে গেছে ?'

নীতু জবাব দিল না। আকিব বলল, 'বলতে চাও না ?'

নীতু মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আজকাল মনে হচ্ছে আবার চলতে শুরু করেছে। তো চলতে শুরু করলে আর থমকানোর কথা বলে লাভ কী ? তারচেয়ে না হয় আরও গতিশীলই হোক।'

'তার মানে স্কুলের সময়টা তোমার ভালো কাটছে ?'

'খুব।'

'কেন বলো তো ?'

'কী কেন ?'

'মানে ওরকম একটা ভাঙাচোরা স্কুল। বাচ্চাগুলোও সেই অর্থে ওয়েল বিহেভড না। সারাক্ষণ হইহল্লা, চিৎকার-চেঁচামেচি, ওখানে তোমার ঠিক কী কারণে ভালো লাগছে ?'

নীতু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আকিবকে সেই কথাটা বলে। তার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার যন্ত্রণার গল্পটা। কিন্তু সে বলল না। এই কথা কখনোই কাউকে বলতে চায় না সে। কিছু অনুভূতি কেবল একার। তা সে আনন্দের হোক কিংবা যন্ত্রণার। এই অনুভূতি কাউকে বোঝানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না। সে বলল, 'আমার বাচ্চাদের ভালো লাগে। ওদের ওই হইহল্লা, ওই চিৎকার, শোরগোল ওটাই আমার ভালো লাগে।'

'আর কিছু না ?'

'আর কী ?'

আকিবের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করতে যে, তার সঙ্গ নীতুর ভালো লাগে কি না। নীতু কি কেবল ওই শিশুদের জন্যই রোজ ওখানে যেতে চায় ? নাকি আকিবও একটা কারণ ? কিন্তু শেষমেশ কেন যেন কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারল না সে। তবে ওই যে নীতুর থমকে যাওয়া জীবন, ওই জীবনের গল্পটা খুব ভাবায় তাকে। সে স্পষ্ট টের পায়, খুব যত্ন করে কিছু একটা নিজের ভেতর আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে নীতু। সেই কিছু একটা প্রবল বিষাদের। ভয়াবহ যন্ত্রণার। কিন্তু কী সেটা ?

রিকশা থেকে নামার সময় নীতুর হাত ধরল আকিব। ইচ্ছে করে যে ধরেছে, তা নয়। নীতু অন্ধকারে নামতে পারছিল না বলেই ধরা। তবে আকিবের হঠাৎ মনে হলো, এই হাতটা আরও দীর্ঘসময় ধরে রাখতে চায় সে। যতটা সম্ভব দীর্ঘ সময়।

ফেরার পথে একা রিকশায় কেমন অস্থির লাগতে লাগল তার। শীতের সন্ধ্যার মতো বিষণ্ণও। এই বিষণ্ণতা কিংবা অস্থিরতার কারণ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে বাসায় ফিরতে ফিরতে আকিবের আচমকা মনে হলো, দীর্ঘ সময় নয়, নীতুর ওই হাতটা সে একজীবনের বাকিটা সময়ের জন্যই ধরে রাখতে চায়। ছাড়তে চায় না আর কখনোই।

অন্তর ফোনটা এল রাতে। তার কণ্ঠ শান্ত, স্থির। আকিব ফোন ধরেই বলল, 'হ্যাঁ অন্ত, বল।'

অন্তু বলল, 'কী করছিস ?'

'এই তো। ফিরে খেলাম। শুয়ে পড়ব।'

'এত তাড়াতাড়ি ?'

'হুম। খুব ভোরে বেরুতে হবে।'

'কেমন যাচ্ছে স্কুল ?'

'আমার ? না নীতুর ?'

'নীতুর। তোর স্কুল তো তোর ভালোই যাবে। নীতুর কেমন যাচ্ছে, সেটা হলো ইম্পর্ট্যান্ট। তুই তো জানিসই কেন আমি তোকে বলেছিলাম নীতুকে ফোন করে স্কুলের কাজটা দিতে।'

'হুম। কিন্তু এক্সাক্ট ঘটনাটা কিন্তু বলিস নি তুই। জাস্ট বলেছিলি, ও তোর খুবই ভালো বন্ধু। পারসোনাল কিছু বিষয় নিয়ে খুবই আপসেট সে। আমি যেন ফোন করে স্কুলের কাজটা ওকে দেই। তাহলে ও একটু ব্যস্ত থাকবে। হয়তো এতে তার আপসেটনেসটা কিছুটা হলেও কাটবে। কিন্তু এটা তাকে ঘুণাক্ষরেও জানানো যাবে না যে, তুই আমাকে বলেছিস ফোন করে ওকে কাজটা দিতে।'

'হুম। আমি চাই নি যে ও জানুক তুই আমার কারণেই ওকে কাজটা দিয়েছিস।'

'কেন ?'

'তেমন কোনো কারণ নেই। আসলে ও চায় না ওর পরিচিত কেউ ওর জন্য কিছু করুক।'

'আমিও কিন্তু অপরিচিত না।' বলে হাসল আকিব। 'তোর সাথে যেমন আমার ডিবেট করতে গিয়ে পরিচয়, ওর সাথে পরিচয় স্কাউট করতে গিয়ে।'

'এটা বরং ভালোই হয়েছে। তোর সাথে যদি ওর একদমই পরিচয় না থাকত, তাহলে তুই ওভাবে হঠাৎ ফোন করে কাজ দেওয়ার কথা বললে ও কখনোই কাজটা করত না।'

'তা অবশ্য ঠিক। তা ছাড়া আমরা কমন ফ্রেন্ডস ছিলাম না বলেই ও জানত না যে তুই আর আমি আগে থেকেই পরিচিত। আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম, যদি কোনোভাবে বুঝে যায়!'

'উঁহু। ওই মানসিক অবস্থা ওর এখন নেই। তা কেমন যাচ্ছে ওর স্কুল ?'

'খুবই ভালো। শী ইজ এনজয়িং। আজ তো বলল সপ্তাহে নাকি আরও দুদিন ক্লাস নেবে।'

'নিলে দিয়ে দে। যতটা সম্ভব ব্যস্ত থাকুক।'

আকিব হাসল, 'জো হুকুম। তোর জন্যই তো সব করা। তবে মেয়েটা ভীষণ ভালো রে...।' বলে খানিক থামল আকিব। তারপর আবার বলল, 'তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি অন্তু ?'

'ওর।'

'তুই বলেছিলি তোর সাথে ওর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। স্রেফ বন্ধু। বন্ধু মানে খুব ভালো বন্ধু তোরা। কথাটা কি সত্যি ?'

'সত্যি।'

'আর কোনো সম্পর্ক নেই তোদের ?'

'নাহ।' অন্ত নিষ্কম্প গলায় বলল। কোথায় যেন তীব্র একটা অভিমান জমে আছে তার। এটা সত্যি যে অন্ত চায় নি নীতু বিষয়টা জানুক। আকিবকে যে সে নিজে বলেছে নীতুকে ফোন করে কাজটা দিতে, এটা গোপনই রাখতে চেয়েছে সে। জানলে হয়তো কাজটা করতই না নীতু।

আবার আকিবের কাছেও নীতুকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় নি সে। ফলে তার আর নীতুর সম্পর্ক কিংবা সংকটের কথা কিছুই বলে নি সে। বরং যতটা সম্ভব নীতুর সমস্যাটা আড়াল করেই পরিস্থিতিটা বুঝিয়েছে। অন্ত চায় না, তার কারণে আর কোনোভাবেই কোথাও ছোট হোক নীতু।

আকিব বলল, 'তাহলে তোকে একটা কথা বলব আমি।'

'কী কথা ?'

'খুব সিরিয়াস কথা।'

'বল।'

'আজ না।'

'কবে ?'

'খুব শিঘ্রই কোনোদিন।'

'আচ্ছা।' বলে ফোনটা রাখতে যাচ্ছিল অন্ত। তার আগেই আকিব বলল, 'রাখার আগে প্রশ্নটা শেষবারের মতো আরেকবার করি ? বিরক্ত হোস না প্লিজ।'

'বিরক্ত কেন হব ? বল।' স্বভাবিক গলায়ই বলল অন্ত।

'সত্যি নীতুর সাথে তোর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই ?'

অন্তর আচমকা মনে হলো, সে বুঝতে পেরেছে আকিব তাকে কী 'সিরিয়াস কথা' বলবে! আকিবের সেই সিরিয়াস কথাটা আসলে নির্ভর করছে অন্তর এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর। কিন্তু কী উত্তর দিবে অন্ত ?

খানিক ভাবল সে। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'না। নেই।'



রাজিয়া বলল, 'ওই ব্যাডার মধ্যে মনে হয় কিছু আছে।'

আফিয়া বলল, 'কোন ব্যাডা, মা ?'

'ফজলু মিয়া।'

'কী আছে ?'

'তা তো জানি না। খলিফা দ্যাখ কেমন হইয়া গেল! মা, বাপ, বইনের চাইতেও তার কাছে এখন ফজলু মিয়াই আপন। আগে তাও বাড়িঘরে আইতো, এহন তো আসনই ছাইড়া দিছে। দিন রাইত ওইখানেই পইড়া থাকে।'

আফিয়া কথা বলল না। তবে তার মায়ের কথা সত্য। খলিফা দিন দিন কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই কদিন আগের ছোট্ট এইটুকু খলিফা। সারাক্ষণ তার পিছে লেগে থাকত। ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদত। কোলে চড়ার জন্য নানান বাহানা করত। সেই ছেলেই কি না এখন কারও কথাই শোনে না! নিজেকেই সবকিছুর নিয়ন্তা ভাবে!

বেশ কদিন পর সেদিন রাতে হঠাৎ বাড়ি এল খলিফা। গটগট করে ঘরে ঢুকেই কাঠখোট্টা গলায় ডাকল, 'মা মা।'

রাজিয়া ছেলের গলার আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছিল। সে ভেবেছিল খলিফা রাতে থাকবে। তাকে ভালোমন্দ রান্নাবান্না করে খাওয়াবে সে। এই ভেবে তার চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। মুখে রাজ্যের হাসি। সে বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, 'তুই আইছস বাপ ? রাইতে কী খাবি ক ? আমি রান্ধন বসামু।'

'আমি খাইতে আসি নাই মা। তোমার লগে কথা আছে।' খলিফার গলা থমথমে।

'কী কথা ?' রাজিয়া যেন দপ করে নিভে গেল।

'আছে। তার আগে আফিয়ারে ডাকো।' খলিফার গলায় চাপা উত্তেজনা। চোখ লাল। বিষয়টা চোখ এড়াল না রাজিয়ার। এ কদিনেই খলিফার আকার আকৃতিও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। তাকে দেখতে বড়সড় লাগছে। মাত্র কয়েক মাসেই এমন জোয়ান মরদ হয়ে গেল কী করে সে!

আফিয়ার মুখও গম্ভীর। যেন খলিফাকে দেখেই সে আঁচ করতে পেরেছে ঘটনা। সে বলল, 'ক্যান আইছস ?'

খলিফা বসতে বসতে বলল, 'আসন মানা নাকি আমার ?'

'গরিবের ঘরে হাতির পাড়ায় মানা থাকে না। ডর থাকে। তোরে দেইখা তো আমার ডর লাগতেছে।'

খলিফা মায়ের দিকে তাকাল। বয়সে আফিয়া তার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় হলেও তাদের মধ্যে তুই-তোকারি সম্পর্কই। সে বলল, 'মা। অর কথার ভাঁজ দেখছ ? ও আমার লগে এমনে কথা কয় কেন ?'

'অপরাধ হইছে ? এখন কি মাফ চাইতে হইবো ? তাইলে বল, পায় ধইরা মাফ চাই।' মায়ের আগেই জবাব দিয়ে দিল আফিয়া।

খলিফার রাগ হতে লাগল। তবে এই রাগটা অন্য সময়ের মতো না। তারা দুই ভাই-বোন একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। এই বেড়ে ওঠায় একটা রাগ-বিরাগের সম্পর্ক তাদের সব সময়ই ছিল। কিন্তু সেখানে কঠোরতা ছিল না। যা ছিল, তার নাম মায়া-অভিমান। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে যে রাগটা তার হচ্ছে, সেটা আর সব রাগের চেয়ে আলাদা। অন্যরকম। এই রাগে অনেক বেশি হিংস্রতা। খলিফার হঠাৎ মনে হলো, সে ভেতরে ভেতরে আসলেই বদলে যাচ্ছে। তার মধ্যে যে মায়া মায়া ব্যাপারটা ছিল, তা যেন আর নেই। সেখানে ক্রমশই আসন গেঁড়ে বসছে প্রবল এক কর্তৃত্ব। নৃশংসতা। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সেটাকে সে উপভোগও করছে।

নিজেকে যতটা সম্ভব সংবরণ করল সে। তারপর রাজিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা। তোমরা থানায় গেছিলা ?'

রাজিয়া কিছু বলার আগেই জবাব দিল আফিয়া। সে বলল, 'হ। গেছিলাম।'

'গিয়া মিয়াভাইর নামে কী বলছস ?'

'বলছি আমাগো সন্দেহ আমার বাপের খবর একমাত্র সে-ই জানতে পারে। পুলিশ যেন তারে জিজ্ঞাসাবাদ করে।'

'তুই জানলি কী কইরা আব্বার খবর সে জানে ?'

'এইটা আমি একা না। সবাই জানে। পুলিশও জানে। আমরা তার নামে মাডার কেসের মামলাও করতে চাইছিলাম। কিন্তু পুলিশ মামলা নেয় নাই। কারণ সে মাসে মাসে পুলিশরে মোটা অঙ্কের টাকা দেয়। এইজন্য পুলিশ তারে কিছু কয় না। এইটাও সবাই জানে। তুই জানস না ?'

'না, জানি না।'

'তুই কী জানস ? সে ওলি-আউলিয়া কিসিমের লোক এইটা জানস ? তার শরীল থেইকা আঁতরের ঘ্রাণ আসে ? সে রাইত বিরাইত নদীর পানির উপর দিয়া হাঁইটা এই পার থেইকা ওই পার যায় ?'

খলিফা থমকে গেল। আফিয়া এসব কথা জানল কী করে! তার কথা সত্য। ফজলু মিয়ার চারপাশে যারা থাকে, তাদের ধারণা ফজলু মিয়ার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে। সে নানান অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করে। তার জন্ম নিয়েও নানান মিথ প্রচলিত আছে। সেসব সত্য

না মিথ্যা খলিফা জানে না। তবে সে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো না। খলিফা তা জানে। আর জানে বলেই তাকে নিয়ে তীব্র এক ভয় কাজ করে। কিন্তু এসব কথা আফিয়া জানল কী করে ?

আফিয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই খলিফা বলল, 'এরে সাবধান করো মা। আর মুখ বন্ধ করতে বলো। তুমিও বন্ধ রাইখো। খবরদার, বাইরের মানুষের কাছে কিচ্ছু নিয়া মুখ খুইলো না। তোমরা মিয়াভাইরে চেনো না। সে ভালোর চাইতে ভালো, খারাপের চাইতে খারাপ। তার চাইতে ভালো মানুষ আমি জন্মে দেখি নাই। খারাপ মানুষও না। সে আমাগো ভালো পায় মা। আমাগো কোনো ক্ষতি সে করব না। তোমরা ইচ্ছা কইরা ক্ষতি ডাইকা আইনো না।'

আফিয়া ভ্রুকুটি করে হাসল, 'আর কী ক্ষতি করব সে আমাগো ? বাপরে নিছে না দেখাইয়া। ভাইরে নিছে চোক্ষের সামনে দিয়া। আর সেই ভাই তার বাপের খুনির পক্ষে সাফাই গাইতে আইছে। হা হা হা। ক্ষতির আর বাকি কী রাখছে সে ?'

'তুই নিজ চোক্ষে দেখছস সে আব্বারে খুন করছে ? আব্বায় যদি এই রাইতে আইসা হাজির হয়, তখন কী করবি ?' তখন এই কথা ফিরাই নিতে পারবি ? নিজ চোক্ষে না দেখলে কিছু বিশ্বাস করবি না!'

আফিয়া হাসল, 'এইটাও কি তোর মিয়াভাই শিখাইছে ? মগজ ধোলাই তো ভালোই করছে। কী পানিপড়া খাওয়ায় তোরে ? নাকি তিনবেলা মন্তর পইড়া ফুঁ দেয় ?'

খলিফা কথা বলল না। তবে রাগে তার চোখ-মুখ যেন ফেটে পড়ছে। আফিয়া বলল, 'তো এখন কি আমাগো হুমকি দিতে আইছস ? কী করবে তোর মিয়াভাই ?'

খলিফা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'সে মাইয়া মানুষরে কিছু করে না। একদম ছোটবেলায় তার সামনেই তার মা'র লগে নাকি খারাপ ঘটনা ঘটছিল! এইসবই শোনা কথা। কিন্তু এইজন্য সে মাইয়া মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। পারলে উপকার করে। কিন্তু তুই বেশি বাড়ছস। বেশি কোনোকিছুই ভালা না আফি...।'

আফিয়া বলল, 'তোর বাপরে সে খুন করছে। সে তোর বাপের খুনি। আর তারপরও তুই তার পক্ষেই সাফাই গাস...। তুই তো আর মানুষ নাই খলিফা। তোর চোখ দেইখাই আমি বুঝছি, তোরে সে একটা জানোয়ার বানাইতেছে। যাতে তার হইয়া অন্য মানুষরে কামড়াইতে পারস।' বলে রাজিয়ার দিকে ফিরে তাকাল সে। তারপর বলল, 'তুমি সত্য কইরা কও তো মা, খলিফারে আমার বাপে জন্ম দিছে তো ? নাকি সে...।'

আফিয়া তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই ছিটকে পড়ল রাজিয়ার শরীরের ওপর। রাজিয়া কোনোমতে মেয়ের পতন ঠেকাল। তাদের দুজনের চোখেই আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দৃষ্টি। খলিফার চোখ যেন খুনের নেশায় উন্মত্ত। তার শক্ত হাতের পাঁচটা আঙুলই ছাপ বসিয়েছে আফিয়ার গালে। সর্বশক্তিতে চড়টা মেরেছে সে। মা আর মেয়ে জগতের সকল অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে খলিফার দিকে। খলিফা সাপের মতো

ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে হিসহিস করে বলল, 'পুলিশ তো দূরের কথা, ঘরেও জানি মিয়াভাইর নামে আর একটা কথাও না শুনি। একটা টুঁ-শব্দও না।'

বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে। বের হওয়ার আগে এক তোড়া টাকা ছুড়ে দিয়ে গেল বিছানার ওপর। তবে আফিয়া বা রাজিয়া কেউই সেই টাকার দিকে তাকাল না। তারা তাকিয়ে রইল খলিফার চলে যাওয়া পথের দিকে। তাদের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, এই ঘরে, এই এখানে খলিফা নামের ওই মানুষটাকেই তারা কোলেপিঠে করে বড় করেছে। অসুখেবিসুখে বুকের ভেতর আগলে রেখেছে। তার যন্ত্রণায় আকুল হয়ে কেঁদেছে। রাতভর বিছানার পাশে জেগে থেকেছে। তাদের ধারণা সেই খলিফা অন্য কেউ। সেও মজনু মিয়ার মতোই অজানা কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। মজনু মিয়ার মতোই সেই খলিফাকেও আর কখনো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

খলিফা চুপচাপ বসে আছে নদীর ধারে। একটা বাঁধানো দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সৌম্য, শান্ত। কিন্তু খানিক খেয়াল করলেই দেখা যাবে তার কপালের বাঁ দিকের শিরাটা দপদপ করে কাঁপছে। জুলফি বেয়ে নেমে আসছে ঘামের চিকন স্রোত। কোনো দিকে কোনো খেয়াল নেই তার। সে যেন ডুবে আছে অন্য কোনো জগতে। কিন্তু এত অসতর্ক হলে চলবে না। ফজলু মিয়ার মিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি শত্রুরও অভাব নেই। ফলে এরকম অরক্ষিত একটি জায়গায় এভাবে অসতর্ক হয়ে বসে থাকা বিপজ্জনক। বিষয়টা খেয়াল করেছে হেলাল। ফজলু মিয়া তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল খলিফার প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখতে। সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই খলিফাকে নিয়ে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা রয়েছে ফজলু মিয়ার।

খলিফার আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড সবই আঁতশি কাচের নিচে রেখে যাচাই করছে সে। দিন শেষে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ফজলু মিয়াকে জানাতে হয়। হেলাল সেই এতটুকু বয়স থেকেই ফজলু মিয়ার সঙ্গে আছে। বাইরের জগতের কাছে কঠিন, নিষ্ঠুর এই মানুষটা তার কাছে অদ্ভুত এক মমতার আশ্রয়। প্রগাঢ় ছায়ার উৎস। সেই ছায়ায় সে বেড়ে উঠেছে। শিখেছে অনেক কিছু। ফজলু মিয়া বিয়েশাদি করে নি। তার কোনো সন্তানাদিও নেই। ফলে হেলালকে যতটা সম্ভব পুত্রস্নেহেই মানুষ করেছে সে। একই সঙ্গে তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবেও গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। হেলাল জানে, তাকে শূন্য থেকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে এই মানুষটি। ফলে তার যে-কোনো কথা তার কাছে শিরোধার্য।

চুপচাপ বসে থাকা খলিফাকে দেখে তার ভেতরের অশান্ত মানুষটাকে টের পাচ্ছে হেলাল। সেই মানুষটা ভয়ংকর। মাত্র কয়েক মাসেই অন্য এক মানুষ হয়ে উঠেছে খলিফা। হয়তো ফজলু মিয়া এমনটাই চেয়েছিল। সে খলিফার পাশে এসে বসল। তারপর আলতো করে তার কাঁধে হাত রাখল। খলিফা অবশ্য ফিরেও তাকাল না। দীর্ঘ সময় পর হেলাল বলল, 'কী হইছে ? বাড়িতে কোনো ঝামেলা ?'

খলিফা জবাব দিল না। সে তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে মৃদু আঘাত করছে দেয়ালে। হেলাল বলল, 'সব ঠিক হইয়া যাইবো। মিয়াভাই জাদু জানে। এক তুড়িতে সব সমস্যার সমাধান। তুই তো আইছস বছরও ঘোরে নাই। এত অল্প সময়ে মিয়াভাইরে বোঝা সহজ না। বুঝালি ?'

খলিফা এবারও জবাব দিল না। হেলাল বলল, 'কী হইলো, কথা কস না কেন ?'

খলিফা আস্তে করে দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর টুপ করে লাফিয়ে পড়ে ডুবে গেল জলের মধ্যে। হেলাল দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকেও খলিফাকে আর দেখতে পেল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়িগঙ্গার কালো জলের ভেতর থেকে খলিফার কালো মাথাটা ভেসে উঠল কি না হেলাল বুঝতে পারল না।

রাতের অন্ধকারে ফজলু মিয়া ট্রলারের ছাদে বসে আছে। তার পাশে বসে আছে খলিফা। খলিফার গা ভেজা। তার জামা থেকে টপটপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে। সে ভেবেছিল ফজলু মিয়া এই নিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। লোকজন নিয়ে তাকে জোর করে নদী থেকে তুলে এনেছে হেলাল। সে খলিফার মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছে না। ফজলু মিয়া বলল, 'চা খাবি ?'

খলিফা মাথা নাড়ল, 'চা খাই না।'

'মদ, গাঞ্জা খাস ?'

'নাহ।'

'মাইয়া মানুষের অভ্যাস আছে ?'

খলিফা এই কথায় লজ্জা পেয়ে গেল। তার সঙ্গে ফজলু মিয়ার বয়সের ফারাক বিস্তর। তা ছাড়া এই ধরনের কথা বলতে সে কখনো তাকে দেখে নি। ফজলু মিয়া বলল, 'অরে একটা চা দে।'

খলিফাকে চা দেওয়া হলো। কাচের গ্লাসভর্তি চা। চায়ের অর্ধেক জুড়ে দুধের সর। ফজলু মিয়া বলল, 'খা।'

খলিফা ঠোঁটের কাছে গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল। কিন্তু পুরু সরের আস্তরণ ভেদ করে তরল চা তার ঠোঁট স্পর্শ করতে পারল না। সে গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে সর তুলে আনতে লাগল। তারপর সুরুৎ করে মুখে দিয়ে ছপছপ শব্দে খেতে লাগল। তার দুই ঠোঁটের কোষ গড়িয়ে শুভ্র দুধের স্রোত নেমে আসছে। ফজলু মিয়া সেই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চারপাশে নানা আলোর উৎস। সেই আলোয় ভেজা জবজবে খলিফাকে দেখতে অন্যরকম লাগছে।

ফজলু মিয়া বলল, 'তুই একটা কামে যাবি দিনাজপুর। সেইখান থেইকা খুলনা। পারবি না ?'

খলিফা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মালের বিষয় ?'

'হুম। এরপর সিলেট। হেলাল সব বুঝাই দিবো। পারবি ?'

'পারুম।'

'ডর করব না তো ?'

'কিসের ডর ?'

'কত ধরনের ডর আছে! পুলিশ তো আছেই। এইসব কামে আরও নানান সমস্যা। সব সময় জীবন হাতে রাখতে হয়।'

খলিফা বলল, 'জীবন তো হাতেই।'

ফজলু মিয়া কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সে তার হাতের চা-ভর্তি গ্লাসটা আচমকা পানিতে ছুড়ে মারল। ব্লুপ করে একটা শব্দ হলো। ওই শব্দটা তার কানে লেগে রইল।

গ্লাসটা এতক্ষণে কতটুকু ডুবেছে কে জানে!



সজল আর নদীর বিয়েটা হয়ে গেল আড়ম্বরহীন। কোনো আয়োজন নেই, আমন্ত্রণ নেই। অনেকটা চুপিসারেই এক আকাশ থেকে এক ছাদের নিচের বাসিন্দা হয়ে গেল তারা। এর কারণ অবশ্য সজল। নদী চেয়েছিল অন্তত ছোট করে হলেও একটা অনুষ্ঠান হোক। যেহেতু তার চেনাপরিচিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সজল তাতে কোনোভাবেই রাজি হলো না। এমনিতেই তার আয়-রোজগার সেভাবে নেই। বিয়েটাও হয়েছে নদীর ওপর নির্ভর করেই। তার ওপর বড়সড় আয়োজন করে নদীর ওপর তার নির্ভরশীলতার এই ওজনটা সে আর বাড়াতে চায় নি। তা ছাড়া, ঢাকায় এক মামা ছাড়া তার আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই।

বিয়ে নিয়ে মেয়েদের নানান ধরনের স্বপ্ন থাকে। আজকাল সেটা বিয়ের চেয়েও বেশি বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে। সেই অনুষ্ঠানজুড়ে নানাবিধ বিষয় থাকে। তার প্রধানতম হলো ফটোগ্রাফি। আর সবকিছুর চেয়ে এই ফটোসেশনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের উৎসব মূলত পরিণত হয় বিচিত্র সব উপায়ে ছবি তোলার উৎসবে। নদীর সেই ইচ্ছেটা হয়তো ছিলই না। কিংবা ছিল। সজল তা জানে না। সে জিজ্ঞেসও করে নি কখনো। এই জিজ্ঞেস না করা নিয়ে নদীর খানিক মন খারাপ হলো কি না, তাও তার ভাবনায় নেই। তবে খুব সূক্ষ্ম এই বিষয়টাই নদীকে খানিক অস্বস্তি দিতে শুরু করল। সজল কি কখনো তার এই সূক্ষ্ম অনুভবগুলো বুঝতে চেষ্টা করবে ? পূরণ না করুক, অন্তত জানতে চাইবে, তার মন খারাপ হলো কি না ?

নদী হাসিমুখেই বিয়েটা করে ফেলল। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তাদের বিয়েটা হলো কাজি অফিসে। সেখানে সজল আর নদীর খুব কাছের দুয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউই ছিল না। সজলের বাবা নেই। মা গ্রামে থাকেন। অসুস্থ থাকায় বিয়েতে আসতে পারলেন না তিনিও। তবে তার মামা এলেন। তিনিই সজলের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করলেন।

শায়লা বেগমের খানিক মন খারাপ হলেও তিনি অখুশি নন। তার দুটি মাত্র মেয়ে। এই দুই মেয়ের বিয়ে নিয়ে কত স্বপ্নই না তার ছিল! নিজের বিয়ের শাড়ি, গয়না যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। কত কী করবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু জীবন যেন হঠাৎ করেই তাকে সর্বোচ্চ প্রাপ্তির পরিবর্তে ন্যূনতম প্রত্যাশা পূরণের প্রার্থনায় শামিল হতে বাধ্য করেছে। সে কারণেই, নদী যে বিয়ে করেছে এতেই তিনি খুশি। এ যেন বিশাল এক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। দমবন্ধ এক পরিস্থিতি থেকে বুকভর্তি নিঃশ্বাস নিতে পারার স্বস্তি।

নদী জানত সজল তাদের বাসায় থাকতে চাইবে না। ফলে কাছাকাছিই একটা বাসা নিয়ে নিল সে। দুই বেডরুমের ছোট্ট সুন্দর এক বাসা। সামনের অংশটা খোলা। মস্ত বারান্দা। সেই বারান্দার টবে নানা রকম ফুল গাছ লাগাল সে। বাজার ঘুরে ঘুরে কত কী যে কিনতে লাগল! বালিশের কভার থেকে জানালার পর্দা। পাপোশ থেকে সোফার কুশন। রান্নাঘরের জিনিসপত্র। নুন, চিনি, মসলা রাখার কৌটা। এই পুরোটা সময় নদীর নিজেকে মনে হতে লাগল সেই নদীর ধারে ছটফট করে ছুটে বেড়ানো হলুদ পাখিটার মতো। সেও যেমন এখান থেকে ওখানে ছুটে যাচ্ছিল। ছোট্ট ঠোঁটে করে খানিক খড়কুটো, খানিক পাতা, খানিক ঘাস কুড়িয়ে নিচ্ছিল। ঠিক তেমন। আচ্ছা, পাখিটাও কি তার নতুন সংসার সাজাচ্ছিল ? তারও কি নতুন বিয়ে হয়েছে ? কথাটা মনে আসতেই ফিক করে হেসে ফেলল নদী। কী সব ছেলেমানুষী ভাবনা ভাবছে সে!

তবে এই যে নিজের একটা সংসার, এই ভাবনায় সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। বাসার এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার সময় নিজেকে হাওয়ায় ভাসা পালক মনে হয় তার। গুনগুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করে। আর সজল যখন পেছন থেকে এসে হুটহাট তাকে জড়িয়ে ধরে, চুলের ভেতর মুখ গুঁজে দেয়, খোলা কাঁধে নাক ঘষে, আলতো করে চুমু খায়, নদীর তখন কেমন অবশ অবশ লাগে। অদ্ভুত আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মানুষের স্বপ্নগুলো এমন করেও সত্যি হয় ? কিংবা স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু ?

মায়ের ঘর থেকে তার এই ঘরে আলাদা তো কিছু নেই। সেই তো সব একই। দরজা, জানালা, রান্নাঘর, আসবাবপত্র। এর বেশি তো কিছু নয়। তারপরও সবকিছু এমন স্বপ্নালু আর ঘোরগ্রস্ত কেন লাগে নদী জানে না। বাইরে গেলেও বাসায় ফেরার জন্য অস্থির হয়ে থাকে সে। এই প্রথম যেন সে বুঝতে পারে, ঘর কখন ঘর হয়ে ওঠে। ঘর মূলত ঘর হয়ে ওঠে নিজের একটা মানুষের জন্য। একটা বয়সের পর সেই নিজের মানুষের সংজ্ঞাগুলো হয়তো বদলে যেতে থাকে। কিংবা অনুভবে আন্দোলিত হওয়ার ধরন বদলাতে থাকে। এই যে তার মার কথা রোজ মনে পড়ে, বাবার জন্য ছটফট লাগে, যখন তখন নীতুর সঙ্গে ফোনে গল্প করে, তারপরও মন পড়ে থাকে সজলের কাছে। একে সে কী বলবে ? এমনটি তার একারই হচ্ছে ? নাকি সবারই হয় ?

সজল অবশ্য অল্পদিনেই নদীর সেই অস্বস্তির সূক্ষ্ম কাঁটাটা উপড়ে ফেলল। বিয়ের মাসখানেক পরে আবার শুটিং শুরু করল নদী। প্রথম দিন ঘুম থেকে উঠেই অবাক হয়ে গেল সে। তার টেবিলে ধূমায়িত চায়ের কাপ। ব্যাগটা গোছানো। ব্যাগের কাছে ছোট্ট একটা চিরকূট, 'গতকাল অনেক রাত করে ঘুমিয়েছিলে। হয়তো জাগতে দেরি হবে। এই জন্য তোমার যা যা কাপড় দরকার, সেগুলো ব্যাগে দিয়ে দিয়েছি। আমার জরুরি একটা কাজ ছিল বলে বেরিয়ে পড়তে হলো। তোমার শুটিং শেষে আমি তোমাকে নিয়ে বাসায় ফিরব। আদর।'

এই কটা মাত্র লাইন। কিন্তু নদীর চোখে জল চলে এল। সে চা'টা খেল না। দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। তারপর আলতো হাতে ছুঁয়ে দিল কাপটা। যেন ওখানে সজলের স্পর্শ লেগে আছে। হাতের নয়, মনের স্পর্শ। না হলে কি এমন কখনো হয় ? এই যে

এমন যত্ন করে ভাবা, এমন মায়াময় অনুভবে ছুঁয়ে যাওয়া ? হয় না। সে উঠে ঝটপট রেডি হয়ে নিল। তারপর ঘর থেকে বের হতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হলো, চা'টা খায় নি সে। কিংবা খেতে চায় নি। হয়তো সজলের ওই স্পর্শটুকুই কেবল পেতে চেয়েছিল। জলের মতো ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিল নদী। ঠোঁট জোড়া কাপে ছোঁয়াতেই কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তার। কী আশ্চর্য! এমন কেন হচ্ছে!

নদী আড়চোখে চারপাশে তাকাল। সে জানে এখানে কেউ নেই, তারপরও কেমন লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল সে।

রাতে সজল তাকে নিয়ে বাসায় ফিরল। নদী বলল, 'কেমন যাচ্ছে সব ?'

'এই তো গুছিয়ে আনছি কাজ।'

'কবে নাগাদ শুরু করতে পারবে ?'

'আরও মাস তিনেক লাগবে। দুজন লোকও নিয়েছি। ভাবছি আপাতত কলাবাগান বা দোয়েল চত্বরের ওদিকটাতে ফুটপাতের ওপরই অস্থায়ী একটা দোকান বসিয়ে দিব। মাটির তৈরি দারুণ সব কালেকশন থাকবে। যদিও কিছু ঝামেলাও আছে।'

'কী ঝামেলা ?'

'এই ধরো ফুটপাতের ওপর এভাবে বসতে হলে পুলিশ থেকে শুরু রাজনৈতিক ছিঁচকে নেতা, সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে কনভিন্স করতে হয়।'

'খারাপ লাগছে খুব ?'

'উঁহু। তুমি দেখো, একদিন এই শহরে আমার অনেকগুলো শোরুম থাকবে। একটা ব্রান্ড হয়ে যাবে মৃত্তিকা মায়া।'

'আমি জানি।' বলে সজলের হাত ধরল নদী। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি ?'

সজল হাসল, 'হুম, জানি।'

'কীভাবে ?'

'এই যে তুমি সারাক্ষণ বলতেই থাকো।'

'আমি সারাক্ষণ বলতেই থাকি ?' নদী খানিক থমকে গেল। সে সচরাচর এভাবে বলে না সজলকে।

'হুম।'

'কখন ? কীভাবে ?'

'সারাক্ষণ। চোখে।'

'মানে ?'

'মানে তোমার চোখে তাকালেই এই ভালোবাসাটা দেখা যায়।'

'তাই ?' নদী বড় বড় চোখে তাকাল।

'হু। মানুষ তার মুখের ভাষা লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু চোখের ভাষা লুকাতে পারে না।'

'পারে না ?'

'নাহ। কীভাবে লুকাবে ? মুখ না হয় বন্ধ করে রাখা যায়। চোখ তো সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখার কোনো উপায় নেই। আছে ?'

নদী হাসল, 'হুম, আছে। সে সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকবে। এভাবে...।' বলেই চোখ বন্ধ করে ফেলল নদী। তারপর বলল, 'তাহলে আর কেউ তার চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে পারবে না।'

সজল টুপ করে চুমু খেল নদীকে। নদীও। এ এক স্বপ্নময় অনুভব। সজল আর নদী জীবনের নানা জটিল সমীকরণ, অন্ধকার গলিপথ, শঙ্কা ও সঙ্কোচ পাশ কাটিয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে হেঁটে যেতে লাগল এক প্রার্থিত জীবনের রাজপথে।

কিন্তু যে-কোনো পথই শঙ্কার। সেখানে ওঁত পেতে থাকে নানাবিধ বিপদ। মেঠো পথজুড়ে কাঁটার ভয় থাকে। রাজপথজুড়ে দুর্ঘটনার। এই যে তাদের জীবন, যার শুরুটা স্বপ্নময়, তার আড়ালেও জমে ছিল খানিক মেঘ। সেই মেঘ ঝড় হবে বলে কখনো মনে হয় নি নদীর। সজল আশাবাদী থাকলেও মাঝে মাঝেই তাকে হতাশ লাগে। চিন্তিত মনে হয়। সে তখন ভেঙে পড়া গলায় বলে, 'যদি কোনোভাবে আমার কাজটা না দাঁড়ায় ?'

নদী বলে, 'না দাঁড়ালে নাই। আমি তো আছি। আমার উপার্জন ভালো। দুজনের চলে যাবে।'

'কিন্তু আমার যে চলবে না।'

'কেন ?'

'ঠিক জানি না। নিজের কাছেই হয়তো সারাক্ষণ কেমন গুটিয়ে থাকব। ও তুমি বুঝবে না। ওপরে দাঁড়িয়ে কখনোই নিচের মানুষটাকে বোঝা যায় না।'

'আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ? আর তুমি নিচে ?'

'নয় তো কী ?' সজলের গলায় বিষণ্নতা। 'আসলে এটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারবে না। এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তিও নেই। কিন্তু এই ফিলিংটা খুব সাপ্রেসিভ। সারাক্ষণ ভেতরটা শুষে নিতে থাকে।'

নদী যে বোঝে না, তা নয়। কিন্তু কী-ই বা করার আছে তার ? সে জানে, সজলকে যখন সে বাজারের টাকাটা দেয় কিংবা হাতখরচ বা বাড়িভাড়ার, সজল তখন কেমন গুটিয়ে থাকে। এটা সে কোনোভাবেই দূর করতে পারে না। আজকাল মাঝে মাঝে তার মনে হয়, জগতে দ্বিধাহীন সম্পর্ক বলতে বুঝি কিছু নেই। সজল অবশ্য আরও একটা কথা প্রায়ই বলে, 'মা যদি কখনো জানে যে এই সংসার পুরোটাই তোমার একার, এখানে আমার কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। তাহলে কী হবে জানো ?'

নদী খানিক থম মেরে থেকে বলল, 'এই সংসার আমার একার মানে ?'

সজল সচকিত হয়ে বলল, 'না মানে, আমি বলতে চাইছি এই যে ধরো বাসাভর্তি এত এত ফার্নিচার, জিনিসপত্র, নানা কিছু, এসবই তো তোমার কেনা। কোথাও কিচ্ছুটি আমি করি নি। মা যদি এসব জানে, কী করবে জানো ?'

নদীর মন খারাপ হলেও কিছু বলল না। সে উৎসুক গলায় বলল, 'কী করবে ?'

'সুর কেটে একটা শ্লোক বলবে।'

'শ্লোক ?'

'হুম।'

'কী শ্লোক ?'

সজল সুর করে শ্লোকটা বলতে লাগল—

'বউয়ের কামাই, খায় যে জামাই, সেই তো আসল খোঁড়া,
তাহার পাছে, আর কে আছে, বড় কপালপোড়া ?'

নদী সজলের কথা শুনে খিলখিল করে হাসল, 'তোমার মা তো দারুণ মজা করে কথা বলেন।' তবে এরপরই গম্ভীর হয়ে গেল সে। বলল, 'কিন্তু কথাটা খুবই পচা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবার আলাদা কী ? স্ত্রী যদি স্বামীর উপার্জনটাকে সহজভাবে নিতে পারে, স্বামী কেন নিতে পারবে না ? আর সংসারটা তো কারও একার নয়। এখানে দুজনের কন্ট্রিবিউশন থাকে। কিন্তু সেটার ধরন হয়তো সব সময় এক হয় না। এখন সবাইকে কি একদম সবখানেই একই রকম কন্ট্রিবিউশন করতে হবে ? সমানে সমানে ?'

'তা না।' এবার সজলও খানিক গম্ভীর হলো। সে বলল, 'আসলে মাকে তো তুমি দেখো নি। মা একটু সেকেলে ধরনের মানুষ। খুব একরোখা আর জেদি। নিজের ভাবনার বাইরে কখনো যেতে চান না। তা ছাড়া...।' সজল কথাটা শেষ করল না।

'তা ছাড়া কী ?'

'তখন কিছু না বললেও এখন বুঝতে পারছি, মা আমার এভাবে বিয়ে করাটা পছন্দ করেন নি। তার ধারণা ছিল আমি গ্রামে বিয়ে করব। আশপাশের দশজনকে জানিয়ে বড় আয়োজন করে। কিন্তু সব শুনে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলতেও চান নি। তবে উনি খুব জেদি মানুষ তো! ভেতরে ভেতরে জেদটা পুষে রেখেছেন।'

নদীর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বিয়েতে সজলের মামা এসেছিলেন। কিন্তু তাকেও কেমন গম্ভীর মনে হয়েছে। নদী মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এসব তো আমায় তখন বলো নি!'

'বলি নি তোমার মন খারাপ হবে ভেবে।'

'তাহলে এখন ?' নদী সতর্ক ভঙ্গিতে কথাটা বলল।

খানিক চুপ করে থেকে সজল বলল, 'মা ওনার নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে খুব একটা যান নি। আর ওনার চেনাজানা গণ্ডিতে উনিই সব। বংশের বড় মেয়ে বলে সবাই খুব

মানাপণ্য করে। তার কথা শোনে। ওনার সিদ্ধান্তই সেখানে চূড়ান্ত। তা ছাড়া বাবার মৃত্যুর পর উনি একা একাই সব সামলেছেন। ফলে নিজের প্রতি নিজের কনফিডেন্সটাও প্রবল।'

'হুম।' বলে গম্ভীর হয়ে গেল নদী। তারপর বলল, 'মা ঢাকায় চলে আসবেন না ? একা একা ওখানে আর কত দিন থাকবেন ?'

'নিশ্চয়ই আসবেন। তবে একটু সময় লাগবে। বাড়িতে আমাদের বাড়িঘর, কিছু জমিটমিও আছে। ওগুলো কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর তো আসতে হবে। মা তো সব সময় আমার সাথেই থাকতে চান।'

'তাহলে দ্রুত নিয়ে আসো। মা এলে খুব ভালো হবে। ঘরটা পরিপূর্ণ হবে।'

'হুম।' বলে থামল সজল। তার মুখে চিন্তার রেখা।

নদী বলল, 'কী হলো ?'

সজল সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। তবে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা যদি জানেন, ইউ আর দ্যা অনলি আর্নিং পারসন অফ দিস ফ্যামিলি, তিনি সেটা কখনোই ভালোভাবে নেবেন না।'

নদীর খুবই মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু সে তার মন খারাপটা প্রকাশ করতে চাইছে না। সজলের দুশ্চিন্তাটা খানিক হালকা করতেই যেন সে বলল, 'ও আমি ম্যানেজ করে নেব। তুমি দেখো...।'

'উঁহু, পারবে না।'

'কেন ?'

'ওই যে বললাম, মা খুব জেদি। নিজের ভাবনার বাইরে তিনি কোনোভাবেই যাবেন না।'

নদী আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আরও একটা উপায় কিন্তু আছে। সহজ উপায়।'

'কী ?'

'মাকে বলার দরকারটা কী যে সবকিছু আমার উপার্জনে হচ্ছে ? যদি একান্তই কিছু বলতে হয়, বলব তুমিই সব করছো। তাহলেই তো হয়ে গেল! তা ছাড়া, এর মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি কিছু না কিছু একটা করে ফেলবে। তাই না ?'

সজল জবাব দিল না। তবে তাকে খানিক চিন্তিতই দেখাল। এই নিয়ে নদীর সঙ্গে তার ঝলমলে সম্পর্কের আকাশে খানিক মেঘও উড়ে এল। একটা থমথমে হাওয়া। আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ত অকপট ভাবটা যেন আর নেই। সজল যতই নদীকে বোঝাতে যায়, নদী ততই বলে, 'তুমি শুধু শুধুই একটা সামান্য বিষয়কে এত বড় করে দেখছ।'

সজল বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না নদী।'

'পারছি। তুমি দেখো, মা আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভাববে। আমি সব ম্যানেজ করে ফেলব।' নদীর চোখে মুখে তখনো স্বপ্নের ঘোর। সজল কিছুতেই নদীকে বোঝাতে পারল না যে বিষয়টা সে যতটা তুচ্ছ করে দেখছে, আসলে তা মোটেই ততটা তুচ্ছ নয়।

দিন চলে যেতে লাগল। সজলের মা তহুরা বানুর ঢাকায় আসার সময়ও ঘনিয়ে আসতে লাগল। এই নিয়ে নদীর ভেতর চাপা উত্তেজনা। আনন্দ। কিন্তু সজলের ভাবনায় শংকার মেঘ ছায়া ফেলে। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ফোনে কথা হয় তার। এই সময়টা নদীর সামনে থাকে না সজল। যেন খানিক আড়াল খোঁজে সে। নদী অবশ্য কিছু বলে না। সে চেষ্টা করে বিষয়টা মেনে নিতে। সজল হয়তো মাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। তার এতদিনকার ভাবনার ভঙ্গিটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে এতকিছুর পরও মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় নদীর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে মাকে নিয়ে সজলের সঙ্গে তার অকপট সম্পর্কের মাঝখানে ক্রমশই গড়ে উঠছে একটা অদৃশ্য শক্ত দেয়াল। এই দেয়ালটাকে কোনোভাবেই দৃশ্যমান হতে দিতে চায় না সে।

কিন্তু সেদিন সজলের কথায় রীতিমতো এলোমেলো হয়ে গেল নদী। সজলও অবশ্য চট করেই কথাটা বলতে চায় নি। বলার আগে বহুবার ভেবেছে। কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই মার সঙ্গে তার নানাবিধ তর্কযুদ্ধ চলছে। এতদিন সেসব নদীকে জানায় নি সজল। কিন্তু কত দিন আর এভাবে না জানিয়ে থাকতে পারবে জানে না সে। তাই বলবে না বলবে না করেও শেষ অবধি কথাটা বলল, 'ধরো, মা যদি তোমার কাজ নিয়ে কম্প্লেইন করা শুরু করে ?'

'আমার কাজ নিয়ে!' ভীষণ অবাক হলো নদী। 'আমার কাজ নিয়ে কেন কমপ্লেইন করবে ?'

'বুঝতেই পারছ, ওনারা একটু পুরোনো ধাঁচের মানুষ। হয়তো তেমন কিছুই হবে না। হয়তো বুঝিয়ে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও আমার মাঝে মাঝে খুব ভয় হয়।'

সজলের এত উদ্বিগ্ন হওয়াটা নদীর কাছে অনর্থক মনে হলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস, শাশুড়িকে সে খুব ভালোভাবেই সামলে নিতে পারবে। বিষয়টা হেসেই উড়িয়ে দিল সে। বলল, 'তুমি অযথাই দুশ্চিন্তা করছ সজল। আমি সিওর, তুমি যেমন ভাবছ, উনি মোটেই তেমন নন। বরং আমার ধারণা, আমার কাজ নিয়ে উনি খুশিই হবেন। সবাইকে টিভিতে দেখিয়ে বলবেন, ওই যে দেখো, ওটা আমার ছেলের বউ...।'

নদী যেন জানে, সজল শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে। এসব কিছুই কোনো সমস্যা না। সজলের মা এখানে এলে বরং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। নদীকে নিয়ে তার মনে যে অস্বস্তিটুকু জমে আছে, নদীর বিশ্বাস তা সে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর সজল নিজেও তার ক্যারিয়ার নিয়ে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠবে। তখন বরং তাদের দুজনের সংসারটা পরিপূর্ণ হবে।

সজলের মা তহুরা বানু এলেন তার কিছুদিন পরই। নদীদের বিয়ের প্রথম বছর কেটে যাওয়ার দিন পনেরো বাদে। ততদিনে সজলের ব্যবসাটাও শুরু হয়ে গেছে। ভোরবেলা তারা দুজনই বেরিয়ে যায় কাজে। রাতে ফিরেই তহুরা বানুর সঙ্গে নানান আড্ডা, গল্প। ঝলমলে হাসিখুশি মানুষ তিনি। নদীর তাঁকে খুবই পছন্দ হলো। তহুরা বানুও মায়ের মতোই আগলে রাখতে লাগলেন নদীকে। সজল যে শুধু শুধুই দুশ্চিন্তা করেছে, সেটা এখন নিশ্চিত নদী। রাত করে বাড়ি ফিরেও টেবিলে নানা রকম খাবারের আয়োজন দেখে সে। ঘর গোছানো। বারান্দার টবের গাছগুলোতে পানি দেওয়া থাকে। রান্নাঘরটা ঝকঝকে তকতকে থাকে। সব যে তিনি নিজের হাতে করেন, তা নয়। একজন ছুটা বুয়া আছে তাদের। এতদিন খুব ফাঁকিবাজি করলেও তহুরা বানুর কাছে সেই সুযোগটা আর থাকে না। ফলে সবকিছু হতে থাকে দারুণ গোছানো।

রান্নাটা অবশ্য তহুরা বানু নিজেই করেন। তাঁর রান্নার হাত অসাধারণ। নদীরও খুব পছন্দ। যদিও তাকে নানা ধরনের ডায়েট মেনে চলতে হয়। তারপরও সবকিছু ভুলে দিন কয়েকের মধ্যেই যেন খাঁটি ভোজনরসিক হয়ে গেল সে। শরীর যেহেতু ত্যাগের চেয়ে ভোগেই বেশি আনন্দ পায়, সেহেতু মাত্র কদিনেই ধাইধাই করে ওজন বেড়ে যেতে লাগল তার। মাসখানেক আগের জামা পরতেও কষ্ট হতে লাগল। এই নিয়ে শুটিংয়েও এর-ওর ফিসফাস। কানাকানি। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই বিষয়টা নিয়ে সতর্ক হয়ে গেল নদী। তাকে হিসেব করে খেতে হবে।

সমস্যার শুরু এই অতি সামান্য ঘটনা থেকেই। সেদিন খাবার টেবিলে তহুরা বানু হঠাৎ বললেন, 'বউ মনে হয় আমার রান্ধন খুব একটা পছন্দ করে না।'

সজল ভাত খেতে খেতে বলল, 'কী যে বলো না মা! কেন পছন্দ করবে না ?'

'সে তো খায় না কিছুই। রাইতে আইসা এক টুকরা রুটি খাইয়া ঘুমাই যায়। সকালে ভাত না খাইয়াই চইল্যা যায়। আমি সেই ফজরের নামাজ পইড়াই তার জন্য ভাত-তরকারি রান্ধি। কিন্তু সে কিছু ছুঁইয়াও দেখে না।'

সজল হাসল, 'ওটাই ওদের খাওয়ার নিয়ম মা। দেখো না, কদিন তোমার রান্না খেয়ে খেয়ে শরীরের কী অবস্থা!'

'কী আর অবস্থা ? সেই তো হাড্ডিসার। ঘরের বউ এমন বাঁশ পাতার মতন শুকনা হইলে ভাল্লাগে ? মনে হয়, ফুঁ দিলে বাতাসে উইড়া যাইবো। গায়ে গোস্ত না থাকলে আবার মাইয়া মাইনসের দাম কী ?'

সজল কথা বলে না। হাসে। তখনো বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি সে। দেওয়ার কথাও না। তবে এই তুচ্ছ ঘটনাই খুব দ্রুত গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়।

নদী ভেজা চুল মুছতে মুছতে টেবিলে এসে বসল। তহুরা বানু তাকে প্লেটভর্তি করে ভাত দিলেন। সঙ্গে নানা পদের তরকারি। মাছ-মাংস। নদী অবশ্য সেসব খেল না। সে হাসিমুখে প্লেট সরিয়ে রাখল। তারপর বলল, 'মা, রুটি নেই ?'

'নাহ। এই বাসায় আর রুটি চলবো না। রুটি খাইয়া পেট বাঁচে ? গায় গোস্ত হয় ? হয় না। কয়দিন পর তোমার পোলাপান হইবো। শরীল এইরম পাটখড়ির মতন হইলে হইবো কেমনে ? নেও, ভাত খাও। পেট ভইরা ভাত খাও। কোনো কথা বলবা না।'

নদী সেদিন খেলও। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই খেল। কেবল তহুরা বানুকে খুশি করতেই। কিন্তু এই যন্ত্রণা চলতেই থাকল। সঙ্গে চলতে থাকল শীতল এক যুদ্ধও। সেই যুদ্ধ প্রকাশ্য হলো এক রাতে। তহুরা বানু নদীর প্লেটে ভাত তুলে দিচ্ছিলেন। নদী আচমকা উঠে দাঁড়াল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ভাতের প্লেটটা সরিয়ে দিল দূরে। তহুরা বানুর হাতে তখনো চামচ। চামচে ভাত। তিনি সেই ভাতের খানিকটা নদীর প্লেটে ঢেলেও ছিলেন। কিন্তু প্লেট সরিয়ে দেওয়ার কারণে ভাতগুলো ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে। নদী হনহন করে চলে গেল তার ঘরে। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তহুরা বানুর যেন ঘটনা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার সঙ্গে কেউ কখনো এমন করতে পারে, এটা তার দূরতম কল্পনায়ও ছিল না। তাও আবার নিজের ছেলের বউ! যে বাপ মরা ছেলেকে তিনি একা কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন!

তিনি হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন নদীর ঘরের বন্ধ দরজার দিকে। তারপর চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন। নিজের ঘরে গিয়ে তিনিও দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরদিন ভোরে সজলকে ডাকলেন তিনি। তাঁর বাক্স-প্যাটরা সব গোছানো। সজল ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আমারে বাড়ি দিয়ায়।'

'বাড়ি দিয়ায় মানে কী মা ?'

'বাড়ি দিয়ায় মানে বাড়ি দিয়া আয়। এক্ষণ বাড়ি দিয়ায়।'

'মা! কী এমন হয়েছে ?'

'যেইহানে আমার মানইজ্জত নাই, কথার দাম নাই, সেইখানে আমি থাকুম না। আমারে বাড়ি দিয়ায়।'

সজল তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না। তহুরা বানু বললেন, 'পরের মাইয়া পরের মাইয়াই, যতই তারে আদর-সোহাগ করো, কোনো লাভ নাই। সে কোনোদিন নিজের মাইয়া হইবো না। সে আমার মুখের উপরে প্লেট ছুইড়া মারলো!' কথার এই পর্যায়ে এসে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নায় তাঁর গলা বুজে এল। তিনি বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ, এই অপমানের আগে তুমি আমার মরণ দিলা না কেন ? এই মুখ আমি মাইনষেরে কেমনে দেখামু ? ও আল্লাহ... আল্লাহ গো...!'



নীতু ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কমলা রঙের শাড়ি। সে হেসে হেসে কথা বলছে বন্ধুদের সঙ্গে। ঝলমলে প্রাণবন্ত এক মানুষ। এ যেন ঠিক আগের সেই নীতু। যে তার চারপাশের জগতটা আলোয় উদ্ভাসিত করে রাখত। কী এক কথায় বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা নীতু হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল। পাশের বান্ধবীটি দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা অন্তু তাকিয়ে আছে। কারও হাসি এত সুন্দর হতে পারে ? অন্তু আবিষ্কার করল, তার চোখে পানি চলে এসেছে। মেয়েটাকে সে এত ভালোবাসে! কিন্তু আর কখনোই হয়তো নীতুকে সেটা বোঝাতে পারবে না সে। বিশ্বাস এমন এক জিনিস, একবার ভেঙে গেলে আর কখনো তা আগের মতো হয় না। হয়তো জোড়া লাগে, কিন্তু ওই দাগটা থেকেই যায়। ওটা কখনোই মোছে না। কিন্তু নীতুর সঙ্গে তার সম্পর্কের ছিঁড়ে যাওয়া এই পাতাটা কি আর কখনো জোড়া লাগবে ?

অন্তু তা জানে না। তবে সেদিন সে নীতুকে বলেছিল, 'আচ্ছা, তুই কি আমাকে কখনোই ক্ষমা করবি না ?'

'ক্ষমা কেন করব ? কী করেছিস তুই ?'

নীতুর এমন উত্তরে বলার মতো আর কিছু খুঁজে পায় না অন্তু। নীতু কেন কখনোই তাকে দোষী করে না ? কেন কোনো অভিযোগ করে না ? কেন সে মৃত মানুষের মতো অনুভূতিহীন, প্রতিক্রিয়াহীন থাকে ? অন্তু তারপরও বলে, 'তুই এমন করিস না প্লিজ। প্লিজ নীতু!' তার কণ্ঠে আকুতি।

'কী করছি আমি বল ?'

'এই যে এমন নির্লিপ্ত, নির্বিকার।'

'তাহলে আমি কী করব ? তুইই বলে দে ?'

'যা ইচ্ছে তাই। আমাকে মার, কাট। ইচ্ছেমতো বকাঝকা কর। তারপরও সবকিছু আগের মতো হয়ে যাক।'

নীতু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, 'কোনোকিছুই কি আর আগের মতো হয় অন্তু ?'

'হয় না ?'

'উঁহু।'

'কেন ?'

'কারণ সময়। সময় খুব ক্রুয়েল বুঝলি ? সময়ের চেয়ে ক্রুয়েল আর কিছু পৃথিবীতে নেই। সময় যে দরজা একবার বন্ধ করে দেয়, সেই দরজা আর কখনো খোলে না। এই যে ছেলেবেলা ফেলে রেখে এসেছিস, আর কখনো সেখানে ফিরে যেতে পারবি ?'

নীতুর এমন কথায় অন্ত চুপ করে থাকে। এর কোনো উত্তর তার কাছে নেই। তবে নীতুকে আরও খানিকটা ভালো রাখার, আনন্দে রাখার নতুন নতুন উপায় খুঁজতে থাকে সে। দিন কয়েক আগে নীতুর জন্মদিন গেল। জন্মদিনের কথা কাউকে কিছু বলে নি সে। তার ফেসবুকও বন্ধ। কিন্তু ক্যাম্পাসে ঢুকতেই চমকে গেল নীতু। বটগাছের নিচের বেদিটাতে বড় একটা ছবি তার। ছবিতে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার কপালে নীল টিপ। সেই ছবির নিচে বড় বড় করে লেখা—

'চোখ মুছে দেখো ঘুচে গেছে সব নোনাজলে লেখা দাগ,
ভেঙে যাওয়া তুমি উঠে দাঁড়ালেই আঘাতেরা হতবাক!'

শুভ জন্মদিন নীতু।

তুমি আকাশের মতোই আকাশ।

নীতু সেই ছবির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। তার ধারণাই ছিল না তার বন্ধুরা তাকে এত ভালোবাসে! লেখাটা পড়েও খুব স্পর্শিত অনুভব করল সে। যেন তার জন্যই লেখা। এমন নয় যে সে তার জীবনের ওই ভয়ংকর অধ্যায়ের দুঃসহ গল্প কাউকে বলেছে। কিন্তু তারপরও, তার খুব কাছের বন্ধুরা অনেকেই এই বদলে যাওয়া নীতুকে বুঝতে পারে। তারা টের পায়, ভেতরে ভেতরে কোনো এক অজানা কারণে আগের সেই মানুষটি আর নেই সে। হয়তো এ কারণেই তাকে এভাবে চমকে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু নীতু কখনো জানলই না, সে যখন ঝলমলে ফুলের মতোন সবাইকে নিয়ে কেক কাটছে, আনন্দ-আলোয় ভাসছে, তখন তার থেকে অনেক দূরে, একা এক দেয়ালের ফাঁকে, এক নিঃসঙ্গ পাখির মতো ভেজা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অন্ত। সেও কাঁদছে। তবে তার সেই কান্না আনন্দের। নীতু না জানুক, তাতে কী ? সে তো জানে, নীতুকে এই চমকে দেওয়া, এই আনন্দে ভাসিয়ে দেওয়ার উপলক্ষটুকু আড়াল থেকে তারই করা! এই আয়োজনটুকু তার।

নীতু কি কখনো জানবে ? অন্ত অবশ্য এসব নিয়ে ভাবে না। সে কেবল ভাবে নীতু আবার আগের মতো হয়ে যাক। ওই ক্ষতটুকু ভুলে যাক। আর সে আগের মতো হয়ে গেলে, তার অনুভবটুকুও তো আগের মতোই হয়ে যাবে। হয়তো আবারও তার অসুখ করবে। পুরোনো সেই অসুখ। অন্ত না হলে সেই অসুখ আর কেউ সারাতে পারবে না। কখনোই না। নীতুর সেই অসুখের অপেক্ষায় থাকে অন্ত।

নীতুর অবশ্য সেই অসুখ করে কি না বোঝা যায় না। কিংবা অন্তর অমন অবিরাম চেষ্টাই তাকে একটু একটু করে আবার তার সেই আগের ছন্দময় জীবনে ফিরিয়ে নিচ্ছে কি না,

তাও অস্পষ্টই থেকে যায়। কারণ তার জীবনে তখন আরও কিছু ঢেউ। সেইসব ঢেউ তাকে স্পন্দিত করে। তরতর করে এগিয়ে নিয়ে যায় সময়ের সুবর্ণ নৌকো।

পদ্মপুষ্প স্কুলটি নীতুর জীবনের আরেকটি ঢেউ। কিংবা সবচয়ে বড় উদ্দীপনাও। এই ঢেউ তাকে ক্রমাগত আলোয় ভাসিয়ে রাখে। যতটা সময় সে সেখানে থাকে, পৃথিবীর আর সবকিছু তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, শূন্য মনে হয়। সে বুঁদ হয়ে থাকে ফুল-পাখিদের দলে। আর আকিব ? আকিবের গল্পটাও যেন নীতুর এই নতুন জীবনে অদ্ভুত এক ধোঁয়াশা হয়েই ধরা দেয়। সেদিন আকিব হঠাৎ বলল, 'তুমি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করো ?'

'করি।'

'কতটা ?'

'উমমম...।' বলে খানিক ভাবল নীতু। তারপর বলল, 'জানি না। তবে অনেকটাই মনে হয়।'

'আর কো-ইনসিডেন্স ?'

'দুটো কি আলাদা ?'

'আলাদা না ?' পাল্টা প্রশ্ন করল আকিব।

'ঠিক জানি না। তবে কো-ইনসিডেন্স মানে যদি কাকতালীয় ঘটনা হয়, তাহলে সেটা ভাগ্যের থেকে আলাদা কেন হবে ? দ্যাট শুড বি আ পার্ট অফ আওয়ার ফেইট।'

'এই যে তোমার সাথে আমার এতবছর পর এভাবে দেখা, এটা কি তবে ? কো-ইনসিডেন্স, না ভাগ্য ?'

নীতু এবার হাসল, 'এসব কেন জিজ্ঞেস করছ ?'

'কারণ মাথায় একটা ভাবনা এসেছে।'

'কী ভাবনা ?'

'ধরো, আমাদের জীবনে যখন হুটহাট কোনো অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায়, মানে যেটা আমাদের ভাবনায় ছিলই না, তখন সেটা কি এমনি এমনিই ঘটে ? নাকি এর পেছনে বড়সড় কোনো কারণ থাকে ? বিশেষ কোনো তাৎপর্য ?'

'তাৎপর্য মানে ?'

'এই ধরো কনসিকুয়েন্স বা পরিণতি। মানে সেই ঘটনাটা ঘটার পেছনে ভাগ্যের নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে ? না হলে যেটা ঘটার কথাই না, কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, সেটা হঠাৎ কেন ঘটাবে ভাগ্য ?'

নীতু আবারও হাসল, 'তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু সহজ আর স্পষ্ট করে বলবে, প্লিজ ?'

আকিব খানিক ভাবল। তারা বসে আছে রিকশায়। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে। মাথা উঁচু করে সেই চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এক ধরনের ঘোর লেগে যায়। সেই ঘোর সহসা কাটে না। মনে হয় চাঁদটা কপালের সঙ্গে আটকে আছে। তাকে আর সেখান থেকে ছাড়ানো যায় না। আকিব সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, 'এই যে তোমার সাথে এত বছর পরে এমন অদ্ভুতভাবে আবার আমার দেখা হয়ে গেল, এটা কি অর্থহীন ? এর কোনোই কনসিকুয়েন্স নেই ?'

'অর্থহীন কেন হবে ? এই যে আমরা রোজ কত কত গল্প করছি। কী অসাধারণ সব সময় কাটাচ্ছি! এই যে রোজ তুমি আমায় এভাবে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসো, এই যাত্রাটুকুও যে কী ভীষণ সুন্দর, তুমি জানো ?'

'হুম জানি। কিন্তু সব যাত্রারই কিন্তু একটা গন্তব্য থাকে, তাই না ?'

'হুম, থাকে।'

'তাহলে আমাদের এই যাত্রার গন্তব্য কই ?'

আকিবের এই প্রশ্নে থমকে গেল নীতু। সে তার স্বাভাবিক মেয়েলি সংবেদন থেকেই অনেক কিছু টের পায়। এই যে আকিব তাকে রোজ বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসে। খানিক মুখভার হলেই কারণ খুঁজতে তটস্থ হয়ে ওঠে। মন ভালো করার হাজারটা উপায় খুঁজতে থাকে। এসব যে স্রেফ বন্ধুত্বের অনুভবই নয়, এখানে যে তার চেয়েও বেশি কিছু আছে, নীতু তা জানে।

আকিব মানুষ হিসেবে দারুণ। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তার। চারপাশের মেঘলা আকাশটাকে মুহূর্তেই ঝলমলে রোদে ভাসিয়ে দিতে পারে সে। নীতুর এই যে একটু একটু করে আবার নিজেকে ফিরে পাওয়া, বুকের ভেতর জমাট বেঁধে থাকা তীব্র যন্ত্রণার পিণ্ডটাকে কিছুটা হলেও ভুলে গিয়ে আবার হাসতে পারা, এসবে আকিবের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। আকিবের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে তার ভালো লাগে। সঙ্গ ভালো লাগে। এই যে প্রায় রোজ তারা রিকশায় বাড়ি ফেরে, এই সময়টুকুও যেন স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শের মতো। কেমন মোলায়েম, ফুরফুরে, মন ভালো করে দেওয়া আশ্চর্য এক অনুভব ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আকিবের এই প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে নীতু ?

আকিব বলল, 'বললে না ?'

'কী ?'

'আমাদের এই যাত্রার গন্তব্য কই ?'

'নামহীন কোনো গন্তব্যে।'

'সব গন্তব্যেরই কিন্তু নাম থাকে। হয়তো পথিকের কেবল নামটা জানা থাকে না।'

'আমাদেরও হয়তো জানা নেই।'

'কিন্তু আমি যে জানতে চাই।'

'আমি চাই না।' অস্ফুটে বলল নীতু।

'কেন ?'

'আমার ভয় হয়। ধরো মৃত্যু অনিবার্য, সেটা জেনেও কিন্তু আমরা আগামীকালের আশায় বাঁচি। কিন্তু আগামীকালই নিশ্চিত মৃত্যু, এটা জানলে সেই আশাটা আর থাকে না। বেঁচে থাকার বাকি সময়টুকু মৃত্যু তখন গ্রাস করে নেয়।'

'আমাদের সম্পর্কের গন্তব্যে কি মৃত্যুর মতো ভয়াবহ কিছু অনিবার্য ?'

'সব সম্পর্কের শেষেই মৃত্যু থাকে। কিছু মৃত্যু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না।'

কথাটা বলতে গিয়ে নীতুর গলাটা কি খানিক কাঁপল ? আকিব হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নীতুর কাঁধে হাত রাখল। তারপর তাকে টেনে আনল নিজের কাছে। নীতু এলও। তবে খানিক আড়ষ্ট হয়ে রইল যেন। আকিব জানে, এই আড়ষ্টতাটুকু সে কাটিয়ে দিতে পারবে। এমনই আকাশে চাঁদ থাকবে। এমন মন কেমন করে দেওয়া উদাসী হাওয়া। এমন রিকশায় নীতু সেদিন তার কাঁধে মাথা রেখে অপলক তাকিয়ে থাকবে। সেদিন সে বুকভরে তার উত্তাপ ও সুবাস শুষে নিতে থাকবে।

নীতু বলল, 'গন্তব্যহীন যাত্রাও কিন্তু হয়। ধরো, এই যে আমি, আমার কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই। আমার এই জীবন গন্তব্যহীন এক যাত্রাই।'

'এমন করে কেন বলছ ?'

'কী জানি!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীতু। আকিব তাকিয়ে রইল। নীতুর ওই দীর্ঘশ্বাসের কারণটাই এখনো সে জানে না। কী এমন দুঃখ তার ?

রিকশা থেকে নামার সময় আকিব ইচ্ছে করেই হাত বাড়িয়ে দিল। নীতু শক্ত করে হাতটা ধরল। ওই স্পর্শটুকু কী যে ভালো লাগে আকিবের! মনে হয় বুকপকেটে যত্ন করে ওই স্পর্শটুকু যদি সে জমা করে রেখে দিতে পারত! তাহলে যখন তখন ইচ্ছে হলেই আলগোছে বের করে ছুঁয়ে দিতে পারত!

এই সময়ে রাস্তার ঠিক ডান দিকে, ছোট্ট ঝুপড়ি চায়ের দোকানটার পেছনে অন্ধকারে প্রায়ই একটা ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছেলেটা ইদানীং সিগারেট ধরেছে। নীতু আর আকিবের রিকশাটা আসা অবধি সে অপেক্ষা করে। তারপর হাত থেকে ফেলে দেয় সিগারেটটা। আসলে সে সিগারেট খেতে পারে না। অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে দুটো টান দিতেই খকখক করে কাশে। তারপরও ধরায়। নীতু যখন আকিবের হাত ধরে রিকশা থেকে নামে, ছেলেটা তখন জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে লম্বা টান দেয়। তাতে উজ্বল হয়ে ওঠে সিগারেটের আগুন। সেই আগুনে ছেলেটার পাংশুটে মুখটা আরও ফ্যাকাশে, বিবর্ণ দেখায়। তার তখন খুব নীতুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়। তারপর চিৎকার করে কিছু বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে বলার মতো

কিছুই খুঁজে পায় না। তার তখন খুব কান্না পেতে থাকে। কিন্তু ছেলেটা যে অন্ত। সে জানে না, ঠিক কী কারণে তার চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। সে কাঁদতে পারে না।

আকিব জানে, নীতুর জীবনে সে ক্রমশই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগে হঠাৎ ইচ্ছে করেই পরপর বেশ কদিন স্কুলে গেল না সে। নীতুকে ফোনও করল না। নীতু সেদিন মেসেজ পাঠাল, 'তোমার ফোন অফ। স্কুলেও আসছ না। কেন ?'

আকিব রিপ্লাই করল দুদিন পর, 'জরুরি কাজে একটু ঢাকার বাইরে আসতে হয়েছে।'

'কবে ফিরবে ?'

'আরও দুদিন।'

'তাড়াতাড়ি এসো।'

'কেন ? কোনো সমস্যা ?'

'হু।'

'কী সমস্যা ?'

'বলা যাবে না।' লিখে একটা চোখ টিপে দেওয়ার ছোট্ট ইমো এঁকে দিয়েছিল নীতু। ওইটুকুতেই আকিবের বুক যেন অজস্র কৃষ্ণচূড়ার রঙে রাঙা হয়ে উঠল। আজ ফিরেই সে বলল, 'কী সমস্যা ?'

নীতু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'বাচ্চাদের জন্য স্কুলে একজন গানের টিচার রাখলে কেমন হয় ? একবার ভাবো, ওরা সবাই একসঙ্গে সুর করে গাইছে, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে...!'

নীতুর প্রস্তাবটা দারুণ। আগে কেন মাথায় আসে নি, এটা ভেবে অবাক হলো আকিব। তবে তার মন খারাপও হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, নীতু হয়তো তাকে অন্যকিছু বলবে। অন্য বিশেষ কিছু। যেই বিশেষ কিছুর জন্য সে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মন খারাপ ভাবটা কাটাতেই সে বলল, 'চলো কোথাও যাই ?'

'কোথায় ?'

'দূরে কোথাও।'

নীতুরও মন খারাপ লাগছিল। আকিব এ কটা দিন ছিল না, তাতেই চারপাশটা কেমন ধূসর আর প্রাণহীন হয়ে ছিল। এই যে আকিব এল, সঙ্গে করে যেন নিয়ে এল আস্ত এক রঙমহল। সেই দিনটা কী যে ভালো কাটল নীতুর! তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। ধলেশ্বরি নদীতে টুপ করে ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায় সূর্য। আকিব তখন বলল, 'আমি না থাকলে তোমার কষ্ট হয় ?'

'হয়।'

'কান্না পায় ?'

নীতু এই প্রশ্নের জবাব দিল না। আকিব তার কাছে সরে এল। খুব কাছে। প্রায় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার দূরত্বে। তারপর সে বলল, 'তুমি কাছে না থাকলে আমার কষ্ট হয়। খুব কষ্ট। কান্না পায়।'

বলেই সে নীতুর হাত ধরল। তারপর অন্য হাতে আলতো করে সরিয়ে দিতে লাগল বাতাসে উড়ে আসা এলোমেলো চুলের গোছা। তারপর নীতুর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল—

'তোমার নামে সন্ধ্যা নামা শহর জানে,
রোজ কতটা আঁধার জমাই অভিমানে।
রোজ কতটা কান্না জমাই বুকের কোণে,
তোমার নামে রাত্রি গভীর শহর জানে।'

দূরে তখন ডুবে যাচ্ছে সূর্য। নেমে আসছে সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যা অন্ধকারের বুকের ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে শহর, গ্রাম। মন, মানুষ। নীতুর ভারী হয়ে ওঠা নিঃশ্বাসের শব্দ টের পাচ্ছে আকিব। সে ধীরে তার ঠোঁট জোড়া বাড়িয়ে দিল নীতুর দিকে। তার হাতের মুঠোয় নীতুর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তার চোখের কোল উপচে পড়ছে ছলছলে জলে। আকিব সেই জলের ভাষা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না। তবে সেই জল তিরতির করে নেমে আসতে লাগল নীতুর চোখের কোল গড়িয়ে গালে। সঙ্গে যেন নিয়ে আসতে লাগল সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার। আকিব আঙুলের ডগায় সেই জল ছুঁয়ে দিতে দিতে ভারী গলায় আবারও বলল, 'তোমার নামে সন্ধ্যা নামা...।'

অন্ত কোনোভাবেই মন খারাপ করতে চায় না। কিন্তু মন এত অদ্ভুত যে সে মানুষের অনিবার্য অংশ হয়েও কখনোই নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। সে থাকতে চায় ইচ্ছে স্বাধীন। অন্ত তাই নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে মনের কাছে। বেশ কিছু দিন সে আর বাইরে যায় না। সারাক্ষণ একা একা থাকে। নীতু অবশ্য একবার তাকে ফোন করেছিল। অন্ত ধরেও ছিল। তবে সেটি বিশেষ কিছু নয়। কী একটা দরকার ছিল নীতুর। অন্ত তা মিটিয়েও দিয়েছে। তারপর আবার চুপচাপ। সে বুঝতে পারছে, আকিবের সঙ্গে নীতুর বিশেষ একটা বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। আর সে ক্রমশই সরে গেছে আরও দূরে। সীমানা পেরিয়ে ওপারে। এখান থেকে তার আর ফিরে আসার কোনো পথ নেই। তাহলে কাছে কাছে থেকে এই তীব্র কষ্ট বাড়িয়ে আর কী লাভ ? সে তাই যতটা সম্ভব ছায়া হয়েই থাকতে চায়। ছায়ার মতো আড়াল, অস্পর্শ্য।

আকিবকেও দোষ দেয় না অন্ত। সে তো আর এত কিছু জানে না। অন্তও কিছু বলে নি তাকে। তার আর নীতুর এই বিশেষ সম্পর্কটা তাই হয়তো স্বাভাবিকই। এর মাঝে

নিজেকে আর দেয়াল হিসেবে দাঁড় করাতে চায় না সে। অন্তর কি অভিমান হচ্ছে ? তীব্র কোনো অভিমান ? কিন্তু কার ওপর সেই অভিমান ? তার নিজের ওপরই ? নাকি অন্য কারও ওপর ? অন্ত জানে না, সেই অন্য কেউটা কে ?

তবে সেদিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। তাকে ফোন করল আকিব। আকিবের গলা ভারী। থমথমে। অন্ত বলল, 'বল।'

'তোর মনে আছে, তোকে একটা কথা বলব বলেছিলাম ?'

'হুম।'

'আজ বলি ?'

'বল।'

'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি আর নিতে পারছি না...।' আকিবের কণ্ঠ ভেজা।

'কী হয়েছে বল ?'

'আমি নীতুকে ভালোবাসি, অন্ত। প্রচণ্ড ভালোবাসি।'

অন্ত শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আর সে ?'

'সেও।'

'তাহলে সমস্যা কোথায় ?'

'জানি না।' বলে থমকে গেল আকিব। দীর্ঘ সময়। তারপর বলল, 'মানে ও কখনো নিজে থেকে আমায় বলে নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ও আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে। কিন্তু...।'

'কিন্তু কী ?'

'কোনো এক অদ্ভুত কারণে ও সেটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছি। সবরকম ভাবে। কিন্তু লাভ হয় নি। বরং...।' বলে ঢোক গিলল আকিব। তারপর প্রায় কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'নীতু হঠাৎ স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, সে আর কখনো স্কুলে আসবে না।'

অন্ত জানে না কেন, তার মনে হলো বুকের ভেতর দমবন্ধ কষ্টের যে পাথরটা জমে জমে ক্রমশই বড় আর ভারী হচ্ছিল, সেই পাথরটা হঠাৎ গলতে শুরু করেছে। কত দিন পর আবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে সে! ফোনের ওপারে আকিব কাঁদছে। আকিবের সেই কান্না অদ্ভুত এক আনন্দের অনুভব ছড়িয়ে দিচ্ছে অন্তর শরীরজুড়ে। জগতের নিয়ম কি তবে এই ? অন্তহীন কান্না ও হাসির এই যাত্রা কি তবে চলতেই থাকে সমান্তরাল ?

আকিব প্রায় ভেঙে যাওয়া গলায় বলল, 'তুই আমাকে সব ঠিক করে দে অন্ত, প্লিজ। তুই আমাকে সব ঠিক করে দে।' কান্নার শব্দে তার কথা শোনা যাচ্ছে না। গলা ভেঙে

যাচ্ছে। তবে তার শেষ শব্দটা তবু শুনতে পেল অন্তু। আকিব জলজ গলায় ফিসফিস করে বলছে, 'আই কান্ট লিভ উদাউট হার, অন্তু। আই কান্ট... তুই সব ঠিক করে দে অন্তু। প্লিজ...।'

আকিব কাঁদছে। অন্তু তাকিয়ে আছে আকাশে। একটা চিল উড়ে যাচ্ছে সেখানে। চিলটা একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু সেই একা নিঃসঙ্গ চিলটাকেও যে কী ভালো লাগছে অন্তুর। ওই চিলটা কে ? আকিব, না অন্তু ?

আর ওই অন্তহীন শূন্যতায় পরিপূর্ণ আকাশটা যে নীতু, তা তো সে জানেই। কিন্তু সেখানে একা একা উড়ে বেড়ানো ওই চিলটা সত্যি সত্যিই কে ?



পথপুষ্প স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেলাল। তার সঙ্গে খলিফা। খলিফা বলল, 'এইখানে আমাগো কাম কী ?'

'গেলেই দেখতে পাবি।'

দেখে অবশ্য খলিফা খুব একটা আগ্রহ পেল না। লম্বা একটা স্কুলঘর। চারখানা রুম। একটাতে গোল টেবিল ঘিরে তিনজন শিক্ষক বসে আছেন। সেটাই অফিসঘরও। বাঁ দিকের ঘর থেকে বাচ্চাকাচ্চাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে। খলিফা বলল, 'এই স্কুল মিয়াভাই চালায় ?'

'হুম।'

'আমারে তো কোনো দিন বলল না ?' খলিফা ভেতরে ভেতরে খুবই অবাক হয়েছে। ফজলু মিয়ার মতো কেউ যে পথশিশুদের নিয়ে স্কুল চালাতে পারে, এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। সে বলল, 'ভিতরে ভিতরে আপনাগো আরও কত ঘটনা আছে কে জানে!'

হেলাল হাতের উল্টো পিঠে খলিফার মাথায় আলতো চাটি মেরে বলল, 'আস্তে আস্তে সবই জানবি।'

'হ। তাই তো দেখতেছি। এইবার সিলেট, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, খুলনা গিয়া তো বহুত কিছু দেখলাম, জানলাম। ভয়াবহ ব্যাপারস্যাপার।'

'ভয় পাইছস ?'

'প্রথমবার তো... একটু ভয় তো পাইছিই।'

'এইখানে ভয়ের কিছু নাই। এইখানে সব আনন্দের ব্যাপার।'

খলিফা স্কুলঘরগুলো ঘুরে দেখল। ছোট ছোট শিশুরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই ছিন্নমূল শিশু। স্কুলের সামনে একটা মাঠ। মাঠের ওপাশে ছোট্ট একটা দোতলা ভবন। ছাত্রাবাসের মতো। সেখানে কিছু শিশুর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। এদের বেশির ভাগেরই মা-বাবার পরিচয় নেই। তবে তাদের সংখ্যা অল্প। এই সবকিছু দেখাশোনা করে আকিব। হেলাল বলল, 'কী খবর আপনাগো ?'

'জি ভালো। তবে একটু সমস্যা হচ্ছিল।'

'কী সমস্যা ? টাকা-পয়সা তো মাস শেষ হওয়ার আগেই আমি পাঠাই দেই। তবে বেশ কিছুদিন আসতে পারি নাই, খুব ঝামেলা যাচ্ছিল।'

'টাকা-পয়সার সমস্যা না।'

'তাহলে ?'

'সেদিন হঠাৎ পুলিশ এসেছিল এখানে।'

'পুলিশ ?' কপাল কুঁচকে তাকাল হেলাল। 'কেন ?'

'তারা বলল, এরকম স্কুলের যে ধরনের সরকারি অনুমোদন থাকা দরকার তা নাকি আমাদের নেই। এমনকি এই যে কিছু বাচ্চা এখানে থাকছে, সেটারও অনুমোদন দরকার হয়।'

হেলাল অবশ্য বিষয়টা পাত্তা দিল না। সে বলল, 'এইসব মিয়াভাই দেখবে। আপনে এগুলা নিয়া চিন্তা কইরেন না।'

আকিবের চিন্তা তবু দূর হলো না। সে বলল, 'আপনি বুঝছেন না, কেউ যদি কোনো অভিযোগ করে, তাহলে কিন্তু বড়সড় বিপদ হতে পারে।'

হেলাল হাসতে হাসতে বলল, 'কী বিপদ ?'

'ধরেন কেউ যদি অভিযোগ করে যে আমরা শিশুদের নিয়ে কোনো বিজনেস করছি, বা ধরেন চাইল্ড ট্র্যাফিকিং টাইপ কিছু...।'

'সেইটা কী জিনিস ?'

'শিশু পাচার... বা এমন আরও কিছু...। এরকম অনেক ঘটনাই কিন্তু আছে...।'

'ধুর মিয়া।' আকিবকে কথা শেষ করতে দিল না হেলাল। 'আপনি কার লগে কাজ করতেছেন, সেইটা তো জানেন না। এইটা মিয়াভাই চালায়। আমি তো পুঁটি মাছ। সে কিন্তু তিমি মাছ। আমারে দেইখা মিয়াভাই সম্পর্কে ধারণা করা ঠিক না। সে যেহেতু আছে, কিচ্ছু হইবো না। নিশ্চিন্তে থাকেন।'

আকিব নিশ্চিন্ত হতে পারল কি না বোঝা গেল না। তবে একটা অস্বস্তি রয়েই গেল। মূলত তারা বন্ধুরা মিলে কলেজে থাকতেই পথশিশুদের নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ করছিল। সপ্তাহে দু-তিন দিন তাদের স্টেশনের বাইরের খোলা চত্বরে পড়াত, ছবি আঁকা শেখাত। এই করতে করতেই তারা আলোচনায় চলে এল। তাদের নিয়ে পত্রপত্রিকায় খবর অবধি বের হলো। আর তখনই হেলাল নামের এই মানুষটা নিজ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। স্টেশনের পাশেই এতবড় জায়গা করে দিল। সেখানে আগে থেকেই ঘর ছিল, সেই ঘরে রীতিমতো স্কুল খুলে বসল তারা। গত কয়েক বছরে তা অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যত বড় হয়, তত তার আলো ছড়ায়। আবার অন্ধকারও ওঁত পেতে গ্রাস করে নেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এটিকেই তার ভয়। সে নিজেও এখনো জানে না, হেলালের পেছনে কে আছে। মাঝেমধ্যে অবশ্য মিয়াভাইয়ের কথা শুনেছে সে। কিন্তু সরাসরি দেখার সুযোগ হয় নি। তবে স্কুলটাকে যে যথাযথ অনুমোদন নিতে হবে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। কিন্তু মিয়াভাইয়ের অনুমতি ছাড়া সেটা সে কী করে করবে ?

নীতু অবশ্য মাসখানেক পর আবার স্কুলে আসতে শুরু করেছে। সে আগের মতোই শান্ত, স্বাভাবিক। তবে প্রথমদিন সন্ধ্যায় আকিব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। নীতুর সঙ্গে সে যাবে কি না বুঝতে পারছিল না। নীতু তখন নিজ থেকেই বলেছিল, 'আজ থাক। আমি কদিন একটু একা একা যাই। আমার একা থাকতে ভালো লাগছে।'

আকিব যে খুব বেশি মন খারাপ করেছে, তা নয়। বরং নীতু আবার আসাতে সে খুশি হয়েছে। তবে এজন্য অন্তর কাছে কৃতজ্ঞ সে। অন্তু না হলে এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। সপ্তাহখানেক বাদে একদিন নীতু নিজ থেকেই বলল, 'যাবে আমার সাথে ?'

ওইটুকু এক কথা। ওই কথাটুকুই আকিবকে যেন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। সে টুপ করে রিকশায় উঠে পড়ল। নীতু বলল, 'আস্তে। আমি পড়ে যাব তো।'

আকিব তটস্থ ভঙ্গিতে আবার রিকশা থেকে নামতে যাচ্ছিল। তার আগেই নীতু তাকে হাত ধরে থামাল। তারপর বলল, 'আরে! এমন করছ কেন ?'

এমন করছে কেন তা কেবল আকিবই জানে। সে শান্ত, চুপচাপ হয়ে বসে রইল। নীতু বলল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

'আমার খুব গিল্টি ফিল হচ্ছে নীতু।'

'কেন ?'

'এই যে তোমায়...।' কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

নীতু বলল, 'এই যে আমায় ভালোবাসো বলে ?'

আকিব কথা বলল না। নীতু যে এমন অবলীলায় প্রশ্নটা করবে, এটা সে ভাবতে পারে নি। নীতু বলল, 'ভালোবাসায় গিল্টি ফিলিংস থাকতে নেই আকিব। ওটা থাকা উচিত ঘৃণার ক্ষেত্রে। আমাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখো, শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। এত ঘৃণার মধ্যে খানিক নির্ভেজাল ভালোবাসা থাকলে সেটা তো অসাধারণ প্রাপ্তির।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো নয়।'

'কে বলেছে ?'

'তুমি।'

'উঁহু। আমি মোটেই সেটা বলি নি। এই যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, এটা আমার কাছে যে কত বড় প্রাপ্তি আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। শুধু আমি কেন, তোমার মতো কারও ভালোবাসা পাওয়া যে-কোনো মেয়ের জন্যই সৌভাগ্যের।'

'তাহলে ?'

'কী তাহলে ?

'তুমি তো আমায় ভালোবাসো না ?'

এই প্রশ্নে দীর্ঘসময় চুপ করে রইল নীতু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সবার তো ভালোবাসার ক্ষমতা থাকে না আকিব। অধিকারও না।'

'মানে ?' চমকে ওঠা গলায় বলল আকিব। 'তোমার আমাকে ভালোবাসার অধিকার নেই ?'

নীতু ম্লান হাসল, 'শুধু তোমাকেই না, আমার কাউকেই ভালোবাসার অধিকার নেই।'

ফজলু মিয়া বসে আছে জলচৌকিতে। রাতে তার ঘুম হয় নি। চোখ টকটকে লাল। তার সামনে হেলাল দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'এমপি সাব তো চেকিং ছাড়া মাল আনার অনুমতি দেয় নাই।'

'কী বলছে ?'

'বলছে সে নতুন এমপি হইছে। এখনই এইসব কাজে নিজেরে জড়াইতে চায় না। এমনিতেই নাকি সরকার এইবার অবৈধ মালামালের বিষয়ে খুব শক্ত।'

'এমপি সাব জানে না, তার ইলেকশনে আমি কত টাকা দিছি ?'

হেলাল কথা বলল না। তার মাথা নিচু। ফজলু মিয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তারে কত ভোট কালেক্ট কইরা দিছি, এইটাও সে ভুইলা গেছে ? এই ইলেকশনে সে জিততে পারত ?'

হেলাল এবারও কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'ঘটনা এইসব কিছুই না। ঘটনা অন্য। ফজলু মিয়ার চোখের বাইরে কিছু হয় না।'

হেলাল মুখ তুলে তাকাল, 'কী ঘটনা ?'

'সে নিজেই এইবার মালের কাম করব। শুধু আমার কমিশনে সন্তুষ্ট থাকলে তো তার ভাগে কম পইড়া যাইতেছে।'

'কী বলেন, সে নিজেই ?'

'হুম। তারে এই বুদ্ধি দিছে আরিফুল। সে নিজে সরাসরি কাম করবে না। করবে আরিফুল। সে থাকবে আড়ালে। কিন্তু নিজের ক্ষমতাটা ব্যবহার করবে। আরিফুলরে ক, আমি তারে খবর দিছি।'

আরিফুল এসেছে ফজলু মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। ফজলু মিয়া বলল, 'কী খবর আরিফুল ?'

'খবর ভালো ফজলু মিয়া।'

আরিফুলের উত্তর শুনে হেলাল থমকে গেল। আরিফুল এমপি সাহেবের কাছের লোক। তার নির্বাচনের সময় মূল দায়িত্বে ছিল সে। কিন্তু নির্বাচনের আগেও সে ফজলু মিয়াকে মিয়াভাই ছাড়া কথা বলত না। অথচ এখন সরাসরি ফজলু মিয়া! মাত্র ক মাসেই তার আচার-আচরণেরও বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়টাতে হেলাল অবাক হলেও ফজলু মিয়া কিছু বলল না। সে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে গেল, 'তোমরা কি আমারে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করতে দিবা না ?'

'কেন দিবো না ? আমরা কি তোমার ব্যবসায় হাত দিছি নি ?'

'দেও নাই। তয় এমপি সাব বোধহয় আর আগের মতো আমারে আপন মানুষ ভাবতে পারতেছেন না। পর পর ভাবতেছেন।'

'এই কথা কেন বলতেছো ?'

'কেন বলতেছি, সেইটা তুমি ভালো কইরাই জানো। পুলিশ বলল, আমার সব ট্রাক আর ট্রলারের নো চেকিং সুবিধা দিতে নাকি তাদের একটু ঝামেলা হইতেছে।'

'তো এইটাতে এমপি সাব কী করব ? সে তো আর চেক করে না। সরকারের কথা তো জানোই, ইলিগ্যাল জিনিসপত্রের বিষয়ে সরকার খুব কড়া এইবার।'

ফজলু মিয়া এই বিষয়ে আর কথা বলল না। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'শোনলাম, তোমরা নিজেরা নিজেরাই নাকি ব্যবসায় নামতেছো ? আমার ব্যবসায় ভাগ বসানো কি ঠিক হইতেছে ?'

'যার যার ব্যবসা সে সে করব। এইখানে ভাগের কথা কেন আসতেছে ? আর তোমার ব্যবসায় ভাগ বসাইবো এমপি সাব ? তোমার ওই মাছের ব্যবসায় ?'

'আমার ব্যবসাটা মাছের না, এইটা তুমি ভালো কইরাই জানো আরিফুল।'

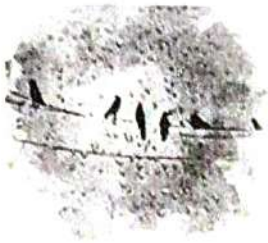
'সবাই তো তা-ই জানে। তো সবাই যেইটা জানে এখন থেকে সেইটাই তোমার একমাত্র ব্যবসা হওয়া উচিত। বাইরে এক, ভিতরে আরেক জিনিস তো ভালো না ফজলু মিয়া। মানুষ বিভ্রান্ত হয়।'

'হুম।'

'আর তুমি এমপি সাবরে কী মনে করো ? সে তো আর তোমার মতো জাইল্যা না, রাস্তাঘাটের লোক না। তার একটা লেভেল আছে।'

ফজলু মিয়া হাসল, 'কথা ঠিক বলছো। মাঝে মাঝে আমি আমার লেভেল ভুইলা যাই।' সে হেলালকে বলল এক ঝুড়ি তাজা ইলিশ মাছ নিয়ে আসতে। তারপর মাছের ঝুড়ি সে নিজ হাতে আরিফুলের গাড়িতে তুলে দিল। আরিফুল গাড়িতে ওঠার আগে সে বলল, 'এইটা তোমার জন্য আমার পক্ষ থেইকা উপহার আরিফুল মিয়া। তুমি আমারে একটা বিরাট কথা মনে করাই দিছো। আমি যে রাস্তাঘাটের লোক, এই কথা আমি ভুইলাই গেছিলাম।'

আরিফুলের গাড়ি চলে যাচ্ছে। ফজলু মিয়া তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি লেগে আছে। সেই হাসি দেখে হেলাল এবং খলিফা কেঁপে উঠল।



নদী মা হবে। এই খবরে শায়লা বেগমের আনন্দে আত্মহারা হওয়ার যোগাড়। নীতুরও। বহুকাল পর সত্যি সত্যিই যেন এ বাড়িতে আলোর বান ঢেকেছে। কিন্তু মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূর্যের মতোই সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে মেঘও। ঝলমলে আকাশ কালো করে নেমে আসে প্রলয়ংকরী ঝড়। নদী তার সংসারজীবনের এই অন্ধকার অংশের গল্প কখনোই তার মাকে বলে না। সে চায় না সেসব শুনে মা কষ্ট পাক। বরং যতটা সম্ভব তাঁকে আনন্দে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করে সে।

তার স্বপ্নময় সংসার-জীবনের ঘোর কাটতে শুরু করল বছর না পেরুতেই। সেই রাতের ঘটনার পর তহুরা বানু আর এ বাসাতে থাকবেন না বলেই পণ করেছিলেন। কিন্তু সজল তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে আটকাল। নদীও তার আচরণের জন্য যতটা সম্ভব দুঃখ প্রকাশ করল। কিন্তু নানা কারণে এই তিনজন মানুষের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল গড়ে উঠতে লাগলই। সেটাকে আর থামানো গেল না। একটা থমথমে হাওয়া। যে হাওয়ার ভেতর লুকিয়ে আছে সর্বগ্রাসী ঝড়। যে-কোনো মুহূর্তে সেই ঝড় সবকিছু ভেঙেচুরে দিতে পারে।

সজল তার বোহেমিয়ান জীবনটাকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। ভোরে উঠে কাজে যায় সে। রাতে বাসায় ফেরে। সেই একই একঘেয়ে জীবন। এই জীবনে কোনোভাবেই অভ্যস্ত নয় সে। ফলে ভেতরে ভেতরে সে ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। তা ছাড়া নদীর সঙ্গে একটা অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের সংঘাতও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেখানে সে প্রচণ্ড হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। যখন কোনো উপার্জনই ছিল না তার, তখন থেকেই বিষয়টার শুরু। কিন্তু আজকাল তা ধীরে ধীরে আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

নদী দামি কোনো কাপড় কিনে দিলে তা সে পরে না। এই না পরারও কারণ আছে। বন্ধুদের আড্ডায় এই নিয়ে তাকে টিপ্পনি শুনতে হয়, 'কিরে সজল, বউয়ের টাকায় তো ভালোই মাঞ্জা মারছিস। এদিকে আয় দোস্ত, তোর কপালে একটা ঘষা দেই। যদি ভাগ্য কিছু ফেরে।'

'কিরে, এইটা আবার কবে কিনে দিল ভাবি ? শার্টটা কিন্তু জোস। ঘরে এমন লক্ষ্মীমন্ত বউ থাকলে নিত্য নতুন ব্রান্ডের জামা পরা যায়।'

জামাটা হয়তো সজল নিজেই কিনেছে, কিন্তু তার সবকিছুই যেন পরিচিত হতে লাগল নদীর পরিচয়ে। অপরিচিত কোথাও গেলেও তার সঙ্গের মানুষটা তাকে পরিচয়

করিয়ে দেয় এভাবে, 'আরে চিনলেন না ? আমার বন্ধু সজল। ওই যে অ্যাকট্রেস নদী আছে না ? তার হাজবেন্ড।'

এমন কত কত ঘটনা যে অহরহ ঘটতে থাকল, নদী তা জানে না। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাই চির স্বাধীনচেতা, খেয়ালি, আত্মবিশ্বাসী সজলের ভেতরটা ভেঙে চুরমার করে দিতে লাগল। তার খুব দমবন্ধ লাগে। নদীকে একটা দানবীয় ছায়া মনে হয়, যে ছায়া তাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। তার যেন আর আলাদা কোনো পরিচয় নেই। সত্তা নেই। সে যেন নদীর বিশাল অস্তিত্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ। বয়সে ছোটরাও আজকাল নানান রকম তির্যক মন্তব্য করে। সেদিন একজন কথায় কথায় বলল, 'ভাই, আপনার কোনো শালি-টালি নাই ?'

'কেন ?'

'না মানে আপনার যা বউ-ভাগ্য ভাই। কিছু না কইরাও যে আরাম আয়েশে জীবন কাটাইতেছেন, এই ভাগ্য কয়জনের হয় ? ভাই দেখেন না, আমাগোও কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না। বিয়ের পর পায়ের ওপর পা তুলে খাব। আহারে জীবন... আহা...!'

এমন অজস্র ঘটনা ঘটতে লাগল রোজ। সজল শত চেষ্টা করেও কিছুতেই বিষয়গুলোকে আর আড়াল করে রাখতে পারে না। নিজেকেও বোঝাতে পারে না। ফলে ক্রমশই নদীর সঙ্গে তার একটা অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের, আত্মসম্মানবোধের প্রবল দেয়াল গড়ে উঠত লাগল। সেই দেয়াল প্রকাশ্য হতে লাগল তহুরা বানুর সেই দিনের ঘটনার পর। তিনি আড়ালে আবডালে বলার চেষ্টা করতে লাগলেন যে, নদী আর অভিনয় করতে পারবে না। কোনো ভদ্রঘরের বউ পরপুরুষদের সঙ্গে এমন রঙঢং করে বেড়ায় না। এতে তাদের বংশের মানসম্মান আর থাকছে না। এমন তো নয় যে সে কাজ না করলে এই সংসার চলবে না!

ভয়ানক সমস্যার সেই শুরু। সজল কোনোভাবেই মাকে বলতে পারল না যে, নদী কাজ ছেড়ে দিলে এই সংসার চলবে না। এই সংসারের প্রতিটি ধূলি-কণা নদীর উপার্জনের। প্রতিটি ইঞ্চি তার যত্নে-ঘামে গড়া। তহুরা বানু এর কিছুই জানেন না। কারণ তারা পরিকল্পনা করেই সেটি লুকিয়েছিল। স্ত্রী আর মায়ের এই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে সজলের অবস্থাও তথৈবচ।

এর মধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা। নদীর নাটকের একটি সংলাপ নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হলো চারদিকে। বিষয়টা দেশের প্রচলিত ধর্মীয়-সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত করেছে বলে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল কিছু মানুষ। নানা ধরনের হুমকি-ধামকিও আসতে লাগল। কোনোভাবেই তাদের বোঝানো গেল না যে সংলাপটি তার লেখা নয়। সে কেবল অন্যের লেখা গল্পে অভিনয় করেছে। শেষ অবধি নদী বিষয়টিকে গ্রাহ্য না করার সিদ্ধান্ত নিল।

তহুরা বানু অবশ্য বিষয়টা সেভাবে জানেন না। সজলও চেপে গেল মায়ের কাছে। কিন্তু এক শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পরে সজলের সেই মামা এলেন বাসায়। তহুরা বানুর

সঙ্গে বন্ধ ঘরে তাঁর কী কী কথা হলো, সজল বা নদী তার কিছুই জানে না। তবে সেদিন থেকেই তহুরা বানু প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, নদী আর টিভিতে কাজ করতে পারবে না। সে যদি টিভিতে কাজ করে তবে তিনি কিছুতেই আর এখানে থাকবেন না। কোনো ধরনের সম্পর্কও রাখবেন না ছেলে-বউয়ের সঙ্গে।

সজল তার মাকে চেনে। আর চেনে বলেই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু সজল এটাও জানে, এই বিষয় নিয়ে নদীকেও কিছু বলতে পারবে না সে। তা ছাড়া মা তো আর জানে না যে এই সংসারের সবকিছু নদীর উপার্জনের টাকায় করা। এই এত বড় বাসা, এই আয়েশী জীবন সজলের কারণে নয়, বরং নদীর উপার্জনে। এখন নদী যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে আর উপায় থাকবে না তাদের। সে হয়তো আজকাল কিছু উপার্জন করতে শুরু করেছে, কিন্তু তা খুবই সামান্য। তাতে কিছুতেই সংসার চালানো যাবে না। সুতরাং এই মুহূর্তে নদী কাজ বন্ধ করে দিলে অথৈ সাগরে পড়বে তারা। কিন্তু তহুরা বানুকে সেসব বোঝাবে কে ?

কথাটা সজলকেই বলতে হবে। মাকে বোঝাতে হবে তাকে। এই নিয়ে সজলের সঙ্গে রোজ ঝগড়া হতে লাগল নদীর। সম্পর্কটা ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। সামান্য বিষয় নিয়েও দুজনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘাত, আত্মপরিচয়ের সংকট। এ যেন এক অবিরাম অদ্ভুত দ্বৈরথ। সেই দ্বৈরথে সজলের মা আগন্তুক। কিন্তু সেই আগন্তুকের ভূমিকাই সবচেয়ে প্রবল।

কিছুদিনের মধ্যে তহুরা বানু চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন, নদীকে অবশ্যই কাজ ছাড়তে হবে। কারণ তার বয়স হয়ে যাচ্ছে। সে যদি এখনই বাচ্চাকাচ্চা না নিয়ে নেয়, তবে ভবিষ্যতে তার মা হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। আর তখন সুস্থ বাচ্চাকাচ্চা নাও হতে পারে।

এই বিষয়টা নিয়ে তিনি কথা বললেন নদীর মা শায়লা বেগমের সঙ্গেও। আগে থেকেই বিষয়টা মাথায় ছিল তাঁর। ফলে তহুরা বানুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন না শায়লা বেগম। সজলের আয়-রোজগার সম্পর্কে তাঁরও স্পষ্ট ধারণা নেই। নদীও সেটা মাকে কখনো বুঝতে দেয় নি। সজলকে কারও কাছে ছোট করতে চায় নি সে। ফলে শায়লা বেগম হয়ে উঠলেন সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত। যেন নদী মা হলেই পৃথিবীর সব সমস্যা এক নিমিষেই দূর হয়ে যাবে।

তবে ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, সজলের ব্যবসা ধীরে ধীরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তার ভাবনা ও উদ্যোগ সফলও হতে লাগল। ফলে টাকা-পয়সাও আসছিল হাতে। বাড়ছিল স্বপ্ন আর আত্মবিশ্বাসও। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস সজলকে কেমন বদলে দিতে লাগল। মায়ের কথাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও আকারে ইঙ্গিতে সেও যেন চাইতে লাগল, নদী অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও কাজ ছেড়ে দিক। যেহেতু তাকে নিয়ে ঘরে-বাইরে দুজায়গাতেই নানা ইস্যু তৈরি হয়েছে, সেহেতু এসবের সমাধানও করতে হবে তাকেই।

তহুরা বানু আর শায়লা বেগম ততদিনে রীতিমতো কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিয়েছেন, নদীকে এবার মা হতেই হবে। এইসব ডামাডোলের মধ্যেই এক ভোররাতে মারা গেলেন আদিবুর রহমান। নদীর বাবা। তাঁর মৃত্যুটা কেমন স্পন্দনহীন। যেন কারও কিছু এসে গেল না তাতে। বরং এতদিন দখল করে রাখা তার ওই শোবার ঘরটা কিছু মালপত্র রাখার জন্য ফাঁকা হয়ে গেল। এ যেন সবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচা। তিনি যেন সবার কাঁধে এক অদৃশ্য পাহাড়সমান বোঝা হয়ে চেপে ছিলেন। নদীরও কি ? নদী সেটা একা একা ভাবতে লাগল। বাবাকে সে ভালোবাসে এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি ভেতরে ভেতরে সেও যেন চাইছিল, এই মৃত্যুর চেয়েও দুঃসহ জীবন থেকে বাবা মুক্তি পাক।

তবে বাবার মৃত্যুতে একটা অদ্ভুত অসহায়ত্বও ঘিরে ধরল তাকে। খুব একা আর আশ্রয়হীন মনে হতে লাগল তার। ওই না থেকেও থাকা বাবাই যেন কীভাবে কীভাবে খানিক ছায়া দিয়ে আগলে রাখতেন। সবকিছু মিলিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব একা আর ক্লান্ত হয়ে গেছিল নদী। এত এত বিরুদ্ধ স্রোতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। সজলকেও আজকাল এত অচেনা লাগে তার। সেই সজল! সে আজকাল রাত করে বাড়ি ফেরে। তারপর ঘরে ঢুকে চুপচাপ কথা বলে না। কত দিন তার সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলে না। আচ্ছা, সবকিছু কি আর কখনোই আগের মতো হবে না ? এই সজলও না ? সেই আগের সজল ?

তুমুল অভিমান, অজস্র অব্যক্ত যন্ত্রণা আর কান্না বুকে পুষেই মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল নদী। ছেড়ে দিল কাজও। সজল তো বলেই দিয়েছে, এখন সংসার চালানোর মতো সামর্থ্য তার আছে। ফলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে পুরোপুরি আড়াল হয়ে গেল নদী। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, একা, নিঃসঙ্গ।

কিন্তু জীবন যেখানে খেয়ালি নদী, সেখানে মানুষ কতটুকুই বা বাধ দিতে পারে ? সজলের ব্যবসার কাঁচামাল বোঝাই নৌকা হঠাৎ ডুবে গেল নদীতে। তার ব্যবসার প্রধান দুই সহযোগী কিছু না জানিয়েই আচমকা কাজ ছেড়ে দিল। বিভিন্নজনের সঙ্গে করা তাদের টাকা-পয়সার লেনদেনে বড় ধরনের অনিয়মও পাওয়া গেল। মাত্র দুটো মাস। দুমাসেই সজল নিজেকে আবিষ্কার করল মস্ত বড় এক খাদে। সেখানে তাকে তাড়া করছে ঋণের বোঝা। পুঁজিহীন ব্যবসার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। জীবন আবার তার ভয়ানক চেহারা নিয়ে মুখোমুখি হলো সজলের। কিন্তু ঘটনা কাউকে জানাল না সে। কাকে জানাবে ?

নদীর কাছে সেই জায়গাটাও আর নেই তার। বরং সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল কতকিছু! পায়ের তলায় খানিক মাটির স্পর্শ পেতেই পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার প্রবল অহমে সে ভুলে গিয়েছিল নদীকে। নদীর সেই অকৃত্রিম সহযোগিতার বিশ্বস্ত দৃঢ় হাতখানাকে। এখন কার কাছে যাবে সজল ? আর নদীইবা কী করবে ? সে তখন চার মাসের গর্ভবতী। তার শরীরটাও ভীষণ খারাপ। রোজ ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়। নানান জটিলতা। কিন্তু

সে সবের কোথাও সজল নেই। সে তখন দিক্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা একা এক মানুষ। তার স্বপ্ন, সম্ভাবনা ক্রমশই মিইয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও। শুরু হলো ভয়াবহ এক দুঃসময়।

মানুষের ভেতরে লুকিয়ে রাখা পাশবিক বোধগুলো জাগিয়ে তুলতে থাকে দারিদ্র্য। তাদের চেহারা হয় ভয়ংকর। সময় তাদের আরও বিকট, বিভৎস, ভয়ালদর্শন করে সামনে নিয়ে আসতে থাকে। জীবন হয়ে যেতে থাকে নরকযন্ত্রণার অন্য নাম। সজল তা বুঝত। আর বুঝত বলেই শেষের দিকে অসহায়ের মতো সে নদীর কাছে এসে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিতে চাইত। কিন্তু নদীও ততদিনে ভেতরে ভেতরে উপেক্ষিত, ক্ষতবিক্ষত, কঠিন এক মানুষ। সজলের সেই নিঃশর্ত সমর্পণ কিংবা কান্না তাকে আর স্পর্শ করে না। বরং অদ্ভুত এক ক্রোধ কাজ করতে থাকে ভেতরে ভেতরে। নির্দয় প্রতিশোধস্পৃহা। যেন যে যন্ত্রণা সজল তাকে দিয়েছে তার সবটুকু সে ফেরত পায়। বুঝতে পারে। সজল বুঝতও।

কিন্তু সম্পর্ক এমন এক ঘর, তার মাঝখানে একবার দেয়াল উঠে গেলে সেখানে দুটো আলাদা ঘর হয়ে যায়। সেই আলাদা ঘর থেকে পরস্পরের কান্নার শব্দ শোনা যায়, দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার শোনা যায়। কিন্তু হাত বাড়িয়ে প্রবল মমতায় পরস্পরকে আর স্পর্শ করা যায় না।

নদীর জমানো টাকা প্রায় শেষ। সজল কোনোভাবেই কিছু করতে পারল না। বেশ ক মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে গেল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নদীর বাচ্চা হওয়ার সময়। এমনিতেই নানান জটিলতা ছিল তার। ফলে ডেলিভারির সময় একাধিক অপারেশন করতে হলো। কন্যাসন্তানের মা হলো সে। কিন্তু টানা উনিশ দিন আইসিইউতে ভর্তি থাকতে হলো। এই পুরোটা সময় নদী একা। সজল তখন উদ্‌ভ্রান্ত এক মানুষ। তার ব্যবসাটা প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কলাবাগানের ফুটপাতের বিশাল অংশ জুড়ে যে মাটির জিনিসপত্রের দোকান সে দিয়েছিল, সেখানেও নানাবিধ ঝামেলা। পুলিশ, মাস্তানদের নিয়ম করে চাঁদা দিতে হয়। তারপরও বিড়ম্বনার অভাব নেই।

নদী অবশ্য এসব নিয়ে কিছু বলল না। সে হাসপাতাল থেকে সরাসরি চলে এল মায়ের বাসায়। মেয়ের নাম রাখা হয়েছে রুনি। সজল মাঝে মাঝে এসে মেয়েকে দেখে যায়। ওই দেখে যাওয়ার সময়টুকুই যেন এত এত হতাশা আর যন্ত্রণার মাঝেও এক পশলা শান্তির বৃষ্টি। নদী অবশ্য তার সঙ্গে কথা বলে না। বা বললেও তা খুবই নৈর্ব্যক্তিক। তারা দুজনই যেন বুঝতে পারছে পরস্পরের কাছে দুজন অচেনা মানুষ হয়ে গেছে তারা। এই অচেনা মানুষের ভেতরের মানুষটাকে খুঁজে বের করার তাড়নাও যেন আর নেই।

নদী যেন কনক্রিটের কনকনে ঠান্ডা শীতল মেঝে। সেখানে হাসি নেই, কান্না নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। অনেকটা নীতুর মতো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে শক্ত, অবিচল।

সজল সেসব বুঝতে পারে কি না কে জানে! তবে নদীর ভেতরটা ক্রমশই শুকিয়ে খটখটে হয়ে যেতে থাকে। সেই খটখটে হয়ে যাওয়া সজল টের পায় মাস কয়েক পর। রুনির পেছনে অনেক খরচ। সেই খরচের হিসেবও সজলের কাছে নেই। এর মধ্যে সে সেদিন এসে বলল, 'বাসাটা তো আর টানতে পারছি না।'

'না পারলে ছেড়ে দাও।'

'তাহলে মা ? মা যাবে কই ?'

'এ বাসায় নিয়ে আসো। একটা ঘর ফাঁকাই আছে।'

'মা কখনোই এ বাসায় আসবে না। তুমি তো তাকে চেনো।'

এই প্রথম যেন প্রকাশ্যে প্রচণ্ড ধৈর্যচ্যুতি ঘটল নদীর। তার হাতে একটা পানির মগ ছিল। সে সেই মগটা হঠাৎ আছড়ে ফেলল মাটিতে। মগের ভাঙা টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চারধারে। একটা টুকরো এসে লাগল সজলের গায়েও। সজল হতভম্ব ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। তবে কিছু বলল না। সে পরের সপ্তাহে তহুরা বানুকে বাড়ি রেখে এল। তার পরের মাসে বাসা ছেড়ে দিল। তবে নদীদের বাসায় উঠল না সেও। উঠল মেসে। বাসা ছাড়ার দিন নদীকে যেতে হলো সেখানে। তার নিজের হাতে কেনা কত কী যে সেই বাসায় রয়ে গেছে। ছোট্ট সুন্দর সোফা, বুক শেলফ, আলমারি, খাট থেকে শুরু করে আরও কত কী! সেসব তাকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে গেল নদী। এ যেন ধু-ধু এক মরুভূমি। কোথাও কিছু নেই।

নদী বলল, 'এ কী!'

সজল কথা বলল না। নদী ড্রইংরুমে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'সোফাটা কই ?'

সজল চুপ। নদী ত্রস্ত পায়ে এ-রুম থেকে ও-রুম ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'আলমারি ? সামনের ঘরের খাট ? ওই যে ওখানে যে ওয়ারড্রোবটা ছিল... ?'

নদী হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞেস করত, কিন্তু তার আগেই সজল সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বোকা বোকা হেসে বলল, 'এত সব জিনিস তুমি ওই বাসায় নিয়ে রাখতে কই ? আর আমিও তো মেসে নিয়ে যেতে পারতাম না। তাই...।'

'তাই কী ?'

'বিক্রি করে দিয়েছি।'

নদীর বিশ্বাস হচ্ছে না সজল সত্যি সত্যিই এই কাজ করেছে। সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সজল মিনমিন করে বলল, 'বাসা ভাড়া অনেক জমেছিল। তুমি তো জানোই আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। তার ওপর কিছু ঋণও জমে গেছে। বাড়িওয়ালা খুব ঝামেলা করছিল। তোমার কাছেও তো টাকা নেই। কী করব আমি ? এমন না যে...।'

সজল আরও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু নদী আর সেসব শুনল না। দাঁড়ালই না সে। হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সজল তার প্রস্থানের পথের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। সে ভেবেছিল নদী হয়তো একবারের জন্যও ফিরে তাকাবে। তাকে কিছু বলবে। কিন্তু নদী আর পিছু ফিরে তাকাল না।

সে তখনো জানে না, নদীর এই চলে যাওয়া পিছু ফিরে তাকাবার জন্য নয়। কিছু কিছু প্রস্থান খুব সহজ, স্বাভাবিক। তাতে কোনো আড়ম্বর নেই, আনুষ্ঠানিকতা নেই। কিন্তু সেই আড়ম্বরহীন চলে যাওয়া জুড়েই খুব গোপনে লেখা থাকে চিরপ্রস্থানের গল্প।



মজনু নিখোঁজ হয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক হলো। এতদিনে লোকে তার কথা ভুলেও গেছে। ভোলে নি কেবল রাজিয়া। প্রায়ই মাঝরাতে তার মনে হয়, ওই বুঝি কেউ তাকে ডাকছে। সে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুললেই দেখবে মজনু দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা পুরোনো পত্রিকা ভাঁজ করা। সে জানে পত্রিকার ভেতর একটা শাড়ি। সে এখন ঘরে ঢুকে বলবে, 'বউ, শাড়ি পইরা আসো।'

রাজিয়া বলবে, 'আপনের কি লজ্জাশরম নাই ?'

'না নাই। আমি হইলাম বেহায়া, বেলাজ, বেশরম।'

'আপনে দাঁত মাজেন না কত দিন ? আপনার মুখ থেইক্যা ভক ভক কইরা গুয়ের গন্ধ আসতেছে।'

মজনু মিয়া এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজিয়াকে চেপে ধরে চুমু খাবে। দীর্ঘ চুমু। রাজিয়া ওয়াক ওয়াক শব্দ করে বাথরুমে ছুটে যাবে। মজনু মিয়া তার কালো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলবে, 'মজনু মিয়ার ক্ষমতা দেখলা ? চুমা দিয়াই মাইয়া মানুষ পোয়াতি বানাই ফালাইলো! হা হা হা।'

রাজিয়ার চোখ ভিজে উঠেছে। মানুষটার হাজারটা দোষ। সে মদ, গাঁজা খায়। খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায়। চুরি-ছিনতাইও করে। কিন্তু দিন শেষে সে ঘরের মানুষ। ঘরে ফিরে আসত। এটুকুতেই খুশি ছিল রাজিয়া। আশপাশে প্রায় সব ঘরের পুরুষমানুষই তিন-চারটা করে বিয়ে করেছে। বউ-বাচ্চা রেখে চলে গেছে। কিন্তু মজনু মিয়া অন্তত এই কাজ কখনো করে নি। এতেই খুশি রাজিয়া। স্বামীকে সে নিজের সঙ্গে তো বেঁধে রাখতে পেরেছে!

মজনু মিয়ার নামে পুলিশের কাছে অসংখ্য অভিযোগ। চুরি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা থেকে শুরু করে ধর্ষণ, খুন পর্যন্ত। কিন্তু রাজিয়া সেসব বিশ্বাস করে না। সবাই বলছে এসব কারণেই ফজলু মিয়া তাকে খুন করেছে। ফজলু মিয়ার কাছে সাত খুন মাফ। কিন্তু মেয়েমানুষ সংক্রান্ত বিষয়ে উল্টাপাল্টা কিছু সে নিতে পারে না। এই কথাও সবাই জানে। ফলে বাদামতলীর ঘাটে যে অল্পবয়সী মেয়েটা ধর্ষণের পর খুন হয়েছে, এটাকে সে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও রাজিয়া কেন যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে মজনু মিয়া সত্যি সত্যিই খুন হয়েছে। হতে পারে বিষয়টা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না সে। তা ছাড়া স্বামীর লাশও তো সে নিজ চোখে দেখে নি!

আবার অবিশ্বাসও হয় না। পুলিশ থেকে আশপাশের সবাই জানে, মজনুকে ফজলু মিয়াই খুন করেছে। তার মেয়ে আফিয়াও তা-ই বলে। খলিফার সঙ্গে অবশ্য বহুকাল আর

কথা হয় না রাজিয়ার। সে পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই লোকমারফত টাকা-পয়সা পাঠায়। সেই টাকার অংক ভালো। আগের ঘর ছেড়ে তাদের ভালো বাসায় তুলে দিয়েছে খলিফা। কিন্তু নিজে আসে না। রাজিয়া এতে খুব খুশি। তবে এই খুশি সে প্রকাশ করে না। আফিয়ার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য ছেলেও দেখে রেখেছে সে। ছেলে বাদামতলির চালের আড়তের ক্যাশিয়ার। দেখতে শুনতে ভালো। প্রায়ই সে রাজিয়ার জন্য এটা-সেটা কিনে নিয়ে আসে। আফিয়ার জন্যও। সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু আফিয়া সেসব ছুঁয়েও দেখে না। তাকে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। এই নিয়ে সে চিন্তিত। মেয়ের মতিগতি ভালো ঠেকছে না।

রাজিয়া সেদিন বলল, 'তুই না ফজলু মিয়ার লগে কাজ করে বইলা খলিফারে দেখতে পারস না ?'

'তুমি পারো ?'

'আমার পোলারে আমি দেখতে পারব না, পারব অন্য মাইনষে ?'

আফিয়া ঝট করে তাকাল। রাজিয়া বলল, 'সে তার বাপের খুনির লগে কাম করে। এই জন্য তোর খুব জ্বলে। আর তুই ? তুই কী করস ? তুই তো তার লোকের লগে ছিনালি করস। আমি কি বুঝি না, বুঝছস ?'

আফিয়া কথা বলল না। রাজিয়া বলল, 'আগে আয়নায় নিজের চেহারাখান দ্যাখ। তারপর আমার পোলারে দোষ দিস। আর তুই নিজ চৌক্ষে দেখছস, তোর বাপরে ফজলু মিয়া খুন করছে ? দেখছস ? খলিফা এতদিন সেইখানে থাইক্যা কিছু বুঝলো না, আর তুই জ্যোতিষ হইছস ? কিছু না দেইখ্যাই আন্দাজে বইলা দিলি ? ছিনালি করতে খুব আরাম, না ? আর আমার পোলায় কাম কইরা ইনকাম করলেই দোষ ?'

আফিয়া বলল, 'আমার বাপ খারাপ। তার পয়দাও খারাপ। এই জন্য আমি খারাপ। তোমার পোলা তো আর আমার বাপের পয়দা না, এইজন্য সে ভালো। এখন আমারে কও, তার আসল বাপ কেডা ?'

রাজিয়ার হাতে মাছ কোটার বটি ছিল। সে সেই বটি ছুড়ে মারল আফিয়ার দিকে। আফিয়ার ভাগ্য ভালো, সে কোনোমতে মাথাটা সরিয়ে নিতে পারল। কিন্তু তাতেও পুরোপুরি এড়াতে পারল না। কপাল কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। রাজিয়া আগুনচোখে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে। মেয়ের কপাল বেয়ে যে রক্ত নামছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। আফিয়ারও না। সে বসে আছে স্থির, চুপচাপ। তার পরনে সাদা জামা। সেই জামা লাল হয়ে যাচ্ছে রক্তে।

হেলাল এসেছে আফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। সে বলল, 'তোমার কপালে কী হইছে ?'

'কিছু হয় নাই।'

'কিছু না হইলে কাটলো কেমনে ?'

'আমি নিজে কাটছি।'

'মানে কী ?'

'মানে হইলো আমার কপাল ভালো না, এইজন্য আমি কাটছি। খারাপ কপাল রাইখা লাভ কী ?'

হেলাল আফিয়ার কথা কিছুই বুঝল না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তবে সে জানে রাজিয়া অনেক দিন ধরেই মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে। কিন্তু আফিয়া তাতে রাজি হচ্ছে না। এই নিয়ে মা-মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে। এদিকে হেলাল চাইলেও চট করে বিয়ে করতে পারছে না। সে প্রতিবারই আফিয়াকে আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে বলছে। আফিয়া বলল, 'আপনে আর এইখানে আইসেন না।'

'কেন ?'

'কেন সেইটা আপনে জানেন।'

'না, জানি না।'

'না, জানলে নাই।'

'তোমার মায়ে অনেক যন্ত্রণা দিতেছে ?'

'না।'

'সে তোমার কপাল কাটছে ?'

'আইজকার পর থেকে আপনে আর এইখানে আসবেন না। এইটা ফাইনাল।'

'কী ফাইনাল।'

'আইজকার পর থেইকা আপনে আর আমার লগে কোনো যোগাযোগ করবেন না। সব শেষ।'

'সব শেষ ?'

'হ।'

'কী বলতেছো তুমি ?'

'আপনে বাংলা কথা বোঝেন না ?'

হেলাল আফিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আফিয়ার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। তবে তার চোখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকের কপাল বেঢপভাবে ফুলে আছে। ফুলে যাওয়া মাংস ঢেকে দিয়েছে চোখ। দেখতে বিভৎস লাগছে। হেলালের হঠাৎ কী হলো! সে আচমকা উঠে দাঁড়াল। তারপর ছুটে গেল ঘরের দিকে। রাজিয়া রান্না করছিল। সে চুলার ওপর থেকে ডালের কড়াইটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। ফুটন্ত ডাল ছিটকে পড়ল রাজিয়ার শরীরে। আফিয়া চিৎকার শুনে যতক্ষণে ঘরে ঢুকেছে, ততক্ষণে মাটিতে গড়াগাড়ি খাচ্ছে রাজিয়া। হেলাল সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ জ্বলছে।



সজলের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়। কলাবাগান নার্সারির সামনে ফুটপাতে তার দোকান। গত পাঁচ বছরে তার জীবন মোটামুটি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তারপরও এই দোকান সে ছাড়ে নি। ছেড়ে করবেই বা কী ? তার তো আর কিছু করার নেই। ভাগ্য কিংবা সে নিজেই নিজেকে এনে দাঁড় করিয়েছে সময়ের ভয়ংকর এক চোরাবালিতে। এখান থেকে উত্তরণের আর কোনো পথ তার জানা নেই। কেউ হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা ধরবে তেমন সম্ভাবনাও নেই। সে এখন কেবল অপেক্ষা করছে এই চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার। মাঝে মাঝে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে একটি মাত্র মানুষ তার হাত শক্ত করে ধরে তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারত, সেই মানুষটা আর তার নেই। যে প্রগাঢ় ভালোবাসা সে তার চোখে এঁকে দিয়েছিল, সেই চোখে এখন দগদগে ঘৃণা। এই ঘৃণাও কি সে নিজেই এঁকে দেয় নি ? সজল আজকাল এসব নিয়ে খুব ভাবে। কিন্তু সে এও জানে, তার জন্য আর কিছুই অপেক্ষায় নেই। সে যে পথের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরেই চূড়ান্ত পতনের ভয়াল গিরিখাদ।

সে এখনো মাটির তৈরি নানান সামগ্রী বিক্রি করে। পুতুল, ফুলদানি, শোপিস, মূর্তি থেকে নানা জিনিস। এর বেশির ভাগই সে নিজে বানায়। রঙ করে। যখন তার ব্যবসা বড় ছিল, তখন দু-চারজন সহকারীও ছিল, কিন্তু তাদের বাদ দিতে হয়েছে। ব্যবসা সংকুচিত হতে হতে অতি ক্ষুদ্র হয়েছে। সজলের ধারণা সামনে এটা আরও ছোট হবে। ছোট হতে হতে একসময় উঠে যাবে। তা ছাড়া আজকাল তার ব্যবসা-বাণিজ্যে মনও নেই।

তার মন তার কন্যা রুনি আর প্রাক্তন স্ত্রী নদীর প্রতি। নদীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর চারেক হলো। কন্যাসন্তানের অভিভাবকত্ব আইন অনুযায়ী রুনি আছে তার মায়ের কাছে। বিষয়টা সজল মেনে নিতে পারছে না। গত কয়েকবছর থেকেই সে নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে রুনিকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু পারছে না। তবে সজলের বিশ্বাস, এবার একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। রুনির অভিভাবকত্ব চেয়ে সে মামলা করেছে। মামলায় তার পক্ষের উকিলের নাম মনমোহন দাস। মনমোহন দাস সজলের বন্ধুর মামা। উকিল হিসেবে খুব নামডাক না থাকলেও তিনি খারাপ নন। যদিও এই মামলায় তিনি সজলের জয়লাভের সম্ভাবনা খুব একটা দেখেন না। কারণ সাধারণত বিশেষ কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হলে রুনির এখন তার মায়ের কাছেই থাকার কথা।

সে কথা তিনি সজলকে জানিয়েওছেন। কিন্তু সজলের দৃঢ় বিশ্বাস এই মামলায় সে জিতবেই। জিতে নদীকে একটা উচিত শিক্ষা দিবে।

সজলের একসময় মনে হতো, সে যা ভাবে, যা করে তার বেশির ভাগই দারুণ সম্ভাবনাময়, সঠিক। কিন্তু দিনে দিনে তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকেছে। আজকাল মনে হয়, তার জীবনের মতো এই ব্যবসার সিদ্ধান্তটাও বড় ধরনের ভুল ছিল। আগে মাটির জিনিসপত্রের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ ছিল, তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। ইদানীং সেই আগ্রহ প্রায় নেই হয়ে গেছে। সারা দিন বসে থেকেও একটা পুতুল বিক্রি হয় না তার। তার ওপর যুক্ত হয়েছে চাঁদাবাজি। ফুটপাতে ব্যবসা করলে নানান জনকে চাঁদা দিতে হয়। পুলিশ, ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক দলের কর্মী থেকে শুরু করে নানাজনকে।

সজলের ধারণা, ব্যবসা গুটিয়ে তাকে বাসায় চলে যেতে হবে। যদিও বাসায় এইসব জিনিসপত্র রাখা খুব ঝামেলার। যে মেসে সে থাকে সেই মেসের সদস্যরা খুবই খিটখিটে। সে যদি এই জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে রাখে তবে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে।

আজ সারা দিনই আকাশ মেঘলা। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। সুতরাং বসে বসে মাছি মারা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। সে সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। প্লাস্টিকের বড় নীল পলিথিন দিয়ে সব ঢেকেঢুকে রাখতে হবে। রাতে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া আজকাল সন্ধ্যার পর এমনিতে কোনো বেচা-বিক্রি হয় না। সমস্যা হচ্ছে, তার পকেটে কোনো টাকা-পয়সা নেই। এ মাসের মেস ভাড়া কীভাবে দিবে তাও সে জানে না। এদিকে রুনির অভিভাবকত্ব মামলার আবার তারিখ পড়েছে। মামলায় তার পক্ষে যে উকিল লড়ছেন, তিনি এমনিতেই সজলের কাছে অনেক টাকা-পয়সা পাবেন। নেহাত তার বন্ধুর মামা এবং ভালো মানুষ বলেই তিনি এখনো কিছু বলছেন না। কিন্তু গত কিছুদিন থেকে তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, এবার একটা হেস্তনেস্ত না করে তিনি ছাড়বেন না।

সজল নাইলনের দড়ি দিয়ে পলিথিনগুলো শক্ত করে বাঁধল। যাতে জোর বাতাস হলেও পলিথিন ছুটে না যায়। এইটুকু কাজ করতেই খুব হাঁপিয়ে উঠেছে সে। তার মন অসম্ভব বিক্ষিপ্ত। প্রায়ই তার মনে হয়, যদি হঠাৎ করেই কোনো একটা মিরাকল ঘটে যেত তার জীবনে! এমন তো কত মানুষের জীবনেই ঘটে। তাহলে তার জীবনে ঘটতে দোষ কী ?

সজল কাজ শেষে ঘুরে রওয়ানা দিবে ঠিক এই মুহূর্তে একটা লোকটা হন্তদন্ত ভঙ্গিতে ছুটে এল। ছোটখাটো মোটাসোটা লোকটা। দ্রুত হাঁটার সময় তার ভুঁড়িতে মৃদু কম্পন তৈরি হয়। মাথায় চুল কম। থুতনির নিচে মাংস জমা হয়ে আছে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তার জরুরি কিছু মাটির মূর্তি দরকার। আরও কিছু লাগবে বলে অগ্রিম অর্ডারও দিয়ে দিল সে। শুনে ভারি অবাক হলো সজল। এমন তো কখনো ঘটে না। তবে কি তার জীবনে মিরাকল ঘটা শুরু করে দিয়েছে ?

টাকার অংক হয়তো বেশি নয়। তারপরও এই সময়ে এটা বিশাল ব্যাপার। পকেট পুরো ঘরের মাঠ। সজলের দোকানে জিনিসপত্রের দাম কম। মাটির জিনিস খুব বেশি দাম দিয়ে লোকে কিনতে চায় না। তারপরও মেসভাড়ার দুশ্চিন্তাটা তো অন্তত দূর হলো। বহুদিন পর একটা ভালো সন্ধ্যা কাটল সজলের। কেন যেন মনে হতে লাগল, ভালো সময় এই বুঝি খুব সামনেই। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে—এই কথা তো আর গুণীজনরা এমনি এমনি বলে যান নি। তার জীবনে আর কত রাত থাকবে! এবার আলো ফোটার পালা। এতদিন শুধু শুধুই দুশ্চিন্তা করছিল সে।

যদিও মামলার পরের তারিখেও কোনো সুসংবাদ পেল না সজল। বরং আরও একবার পেছাল শুনানির তারিখ। তার ব্যবসাও তেমনই রইল। তবে এর দিন কয়েক বাদে সেদিন সন্ধ্যার সেই লোকটা আবার এল। লোকটার নাম শশধর ভৌমিক। নারায়ণগঞ্জে তার মাটির জিনিসপত্রের ব্যবসা আছে। এতদিন সে জিনিসপত্র আনত মানিকগঞ্জ থেকে। কিন্তু সেখানে খরচ বেশি আর যাতায়াত কঠিন হয়ে যায় বলে সজলের সঙ্গে একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসতে চায় সে। বিষয়টা খুবই লোভনীয়ই মনে হলো সজলের। যদিও শশধর ভৌমিক খুব হিসেবি মানুষ। কাজের আগে একটা পয়সা দিতেও রাজি নয় সে। নানাধরনের মূর্তি কিংবা পুতুলের স্যাম্পল দিয়ে যায়। সেসব দেখে রেপ্লিকা বানাতে হবে সজলকে।

সজল অবশ্য কাজটাতে মজা পেয়ে গেল। পয়সা যত কমই পাক, কাজটার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। একধরনের উত্তেজনাও। এখনো হাতে টাকা-পয়সা না এলেও তার ধারণা খুব শীঘ্রই টাকা-পয়সাও আসতে শুরু করবে। শশধর লোকটার ব্যবসায়িক বুদ্ধি ভালো।

তবে সুসংবাদটা এল আরও কদিন পর। এক রাতে হুট করেই সজলের বাসায় এসে হাজির হলো শশধর। তার হাতে অনেকগুলো ব্যাগ। সে ব্যাগগুলো সজলকে দিতে দিতে বলল, 'সজল সাব, আপনার কপাল তো মনে হয় খুইলা গেছে।'

সজল বলল, 'কীভাবে ?'

'সিলেটে এক পার্টিরে আপনার কাজ দেখাইছিলাম। ভীষণ পছন্দ করেছে। আমি কিছু স্যাম্পল নিয়া আইছি। আপাতত রাইখা গেলাম। তবে এখনই বানানোর দরকার নাই। ওনারা মাটির বদলে অন্য উপাদান চায়। বলেছে আপনার সাথে বসবে।'

সজল নতুন করে উত্তেজনা অনুভব করল। শশধর বলল, 'এগুলা যত্ন করে রাইখেন। ডিজাইনগুলো রেয়ার। এনসিয়েন্ট মডেল। আপাতত আপনার কাছে থাকুক। আমি দিন কয়েক পরে এসে পার্টির কাছে আপনারে নিয়ে যাব।'

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, শশধর আর এল না। তার কোনো খোঁজখবরও নেই। বিষয়টা নিয়ে সজল খুবই বিরক্ত। এদিকে মামলার ফাইনাল তারিখও চলে এসেছে। শশধরের আশায় এ কদিন দোকানও খোলে নি সে। পকেটের অবস্থা ভয়াবহ। এখন কী করবে সে ?

সজলের অবশ্য কিছুই করার থাকল না। মামলার রায় হয়েছে। রায় গিয়েছে তার বিপক্ষে। প্রচলিত অভিভাবকত্ব আইন অনুযায়ী কন্যাসন্তান তার বয়ঃসন্ধিকাল অবধি মায়ের কাছে থাকবে। রুনিও তার মায়ের কাছেই আছে। সজল মামলা করেছিল এই অভিযোগে যে, নদী ঠিকঠাকভাবে মেয়ের দেখাশোনা করছে না। সে দায়িত্বে অবহেলা করছে। আবার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এইসব কারণে সে রুনির অভিভাবকত্ব কেরত চেয়ে মামলা করেছে। কিন্তু সজল প্রমাণ করতে পারে নি যে নদী আসলেই রুনির দায়িত্বে অবহেলা করছে। বরং রুনি নিজে আদুরে গলায় বলেছে, সে মাকে ছাড়া রাতে ঘুমাতে পারে না। বাবা মাঝে মাঝে দেখা করতে এলে তার ভালো লাগে। তবে বাবাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে। কিন্তু মাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

আদালত চত্বরে বড় একটা কৃষ্ণচূড়াগাছ। গাছে ফুল ধরেছে। কিছু ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নিচে। সেই ফুলের ভেতর কাঠের বেঞ্চি পাতা। সজল সেই বেঞ্চিতে বসে আছে। তার পরনে মলিন শার্ট। মুখে না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে উকিল মনমোহন দাসের দিকে তাকাচ্ছে না। মনমোহন দাস আদালতের বারান্দায় কারও সঙ্গে কথা বলছেন। সজলের পকেটের অবস্থা খুবই খারাপ। এমনকি সিগারেটও আছে মাত্র দুটা। এরপর আর সিগারেট কেনার পয়সাও তার কাছে নেই। সে সিগারেট ধরাবে কি ধরাবে না এই নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। মনমোহন দাসকে একটা ভালো শিক্ষা সে দিতে চায়। তার ধারণা ঠিকঠাক টাকাপয়সা দিতে পারছে না বলে মনমোহন দাস ইচ্ছে করেই এই মামলায় হেরেছেন। দুর্বল নথিপত্র উপস্থাপন করেছেন।

মনমোহন দাস সজলের দিকে হেঁটে আসছেন। সজল তাঁর দিকে তাকিয়ে শব্দ করে থুতু ফেলল। তারপর বলল, 'আপনার কাছে সিগারেট আছে ?'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'আপনি সিগারেট খান না ?'

'নাহ।'

'তাহলে কী খান ?'

'কী খাই মানে ?'

'কী খাই মানে কী ? সিগারেট ছাড়া পৃথিবীতে কি খাওয়ার আর কিছু নাই ? আপনি সেসবও খান না ?'

মনমোহন দাস জবাব দিলেন না। তবে ভ্রু কুঁচকে সজলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সজলের নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে। সজল বলল, 'এই জন্যই তো আপনার এই দশা।'

'কী দশা ?'

'এই যে, এক চুটকিতে জেতা যায় এমন মামলায়ও হেরে গেলেন।'

'এই মামলা এক চুটকিতে জিতে যাওয়ার মতো মামলা ?'

'অবশ্যই এই মামলা এক চুটকিতে জিতে যাওয়ার মতো মামলা। কিন্তু সমস্যা কী জানেন ? সমস্যা হচ্ছে আপনার বুদ্ধি কম। বুদ্ধি কম বলে আপনি এই মামলায় জিততে পারবেন না।'

'আমার বুদ্ধি কম ? আমার বুদ্ধি কম ?' মনমোহন দাস হতভম্ব চোখে সজলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'অবশ্যই আপনার বুদ্ধি কম। বুদ্ধি কম না হলে আপনি সিগারেট খেতেন। মিনিটে মিনিটে সিগারেট খেতেন। দুনিয়ায় যে সব মানুষের বুদ্ধি কম, তারাই কেবল সিগারেট খায় না। আর সবাই খায়। বুদ্ধিমান, ট্যালেন্টেড লোকমাত্রই সিগারেট খায়। এইটা খেয়াল করে দেখেছেন ?'

মনমোহন দাস কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তার এত বছরের ওকালতি জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি। তিনি শান্তশিষ্ট মানুষ। কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে নেই। কিন্তু তারপরও তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা কেউ কখনো বলে নি। তিনি বিচলিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার সত্যিই ধারণা আমার বুদ্ধি কম ?'

'আমার আর ধারণার কী দরকার ? আপনি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত, সার্টিফায়েড বলদ। আমি তো আর আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবতে পারি না! আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবলে আদালত অবমাননা করা হবে। মহামান্য আদালতকে অবমাননা করার মতো ঝুঁকি আমি এই মুহূর্তে নিতে পারব না। কারণ এই মুহূর্তে আরেকটা মামলা লড়ার মতো টাকা আমার পকেটে নেই।'

মনমোহন দাস সজলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না এটা সত্যি সত্যিই সজল। এই ছেলে সত্যি সত্যিই তাকে এসব কথা বলছে! সজল বলল, 'টাকাপয়সা নেই শুনে এত অবাক হওয়ার কিছু নেই। টাকাপয়সা আজ নেই, কাল হবে। এটা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

'টাকাপয়সা নেই মানে ? তোমার কাছে আমার কত টাকা পাওনা আছে তুমি জানো ?'

সজল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'এতদিন আমার ধারণা ছিল আপনার বুদ্ধি কম। এখন তো দেখছি আপনার লাজলজ্জাও কম। আচ্ছা, এরকম পানির মতো সহজ একটা মামলায় বলদের মতো হেরে যাওয়ার পরও টাকার কথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না ?'

মনমোহন দাস বিস্মিত, বিধ্বস্ত, হতাশ চোখে সজলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলের আচার-আচরণ খুবই ভালো। বিনয়ী ধরনের মানুষ সে। যতবার তাঁর কাছে এসেছে খুবই আদব লেহাজের সঙ্গে কথা বলেছে। তার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই জানতেন এই মামলায় তার জেতার সম্ভাবনা খুবই

ক্ষীণ। প্রচলিত আইনানুযায়ীই আরও বেশ কবছর রুনি তার মায়ের কাছেই থাকবে। তারপরও যদি আদালতের মাধ্যমে তাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয় তাহলে সেজন্য শক্তিশালী কারণ দেখাতে হবে। সজল সেসবের কিছুই দেখাতে পারে নি। এমন কি তার চাকরিবাকরিও নেই। ফুটপাতে কী এক ব্যবসা সে করে, তাতে তার নিজেরই চলে না। এর মধ্যে রুনিকে সে কী করে দেখভাল করবে, তাও জানে না। কেবল ঝোঁক কিংবা জেদের বশেই সে মামলা করতে এসেছিল। সব শুনে মনমোহন দাস তখনই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন, এই মামলা জেতার সুযোগ খুবই কম। এমনকি তিনি মামলাও নিতে চান নি। কিন্তু সজলের অনুরোধ, উপরোধ আর জোরাজুরিতে একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন। পয়সাকড়িও বলতে গেলে কিছু নেন নি। কিন্তু ন্যূনতম যা দেওয়ার কথা ছিল, তাও ঠিকঠাক দেয় নি সজল। আর আজ এখন এসব কী বলছে সে!

সজল পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান উকিল সাহেব। ওই যে নদী বের হচ্ছে। ওর সাথে রুনি। আমি একটু রুনির সাথে কথা বলে আসি। শোনেন, এইসব উকিল ফুকিল দিয়ে কিছু হবে না। আসল হচ্ছে মেয়ে। আমার মেয়ে যদি আমার কাছে আসতে চায়, কার বাপের সাধ্য তাকে আইন আদালত দিয়ে আটকে রাখে! আছে কারও সাধ্য ?'

মনমোহন দাস জবাব দিলেন না। তবে তাঁর হঠাৎ মনে হলো সজল অসুস্থ। দিনের পর দিন নানান দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সজলের চোখ টকটকে লাল। কপালে হাত দিলেই হয়তো দেখা যাবে তার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কী আশ্চর্য, ছেলেটার জন্য এখন আবার তাঁর মায়া হচ্ছে! এই মায়াই তাঁকে খেলো। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটার প্রতি একধরনের আর্দ্রতা তিনি অনুভব করেছেন। তবে বিষয়টা কখনো প্রকাশ করেন নি। কিন্তু মনমোহন দাসের ধারণা, সজল এটা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছে। আর বুঝে ফেলেছে বলেই সে সুযোগটা নিচ্ছে।

ছেলেটা স্ত্রী-কন্যার চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। ডিভোর্সের এত বছর পরও সে নদীকে অসম্ভব ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসা সে প্রকাশ করতে চায় না। আর চায় না বলেই নানাভাবে মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে সে। মনমোহন দাসের সন্দেহ, এই সুযোগে সজল মূলত নদীর কাছাকাছি থাকতে চায়। বছর দুয়েক আগে নদীর আবার বিয়ে হতে পারে এমন খবর শুনে সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। মামলাটা মূলত তখনই করেছিল সজল। মনমোহন দাসের ধারণা, সে রুনিকে পেতে নয়, বরং নদীর বিয়ে আটকাতেই এই মামলা-মামলা খেলা খেলছে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন সে নদীর বিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তা মনমোহন দাস জানেন না।

নদী আদালতের মূল ভবন থেকে বেরোবার আগে ভালো করে বোরকায় মুখ ঢেকে নিল। সে বেশ কিছুদিন হয় আবার অভিনয় শুরু করেছে। তবে দীর্ঘদিন বিরতির পরও মানুষ তাকে এখনো মনে রেখেছে। আজকাল ইউটিউবের কল্যাণে এটা হয়েছে। যখন ইচ্ছে

যে-কোনো নাটক দেখা যায়। টেলিভিশনের জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না। রাস্তাঘাটে লোকে তাকে দেখলে মোবাইল ফোন হাতে এগিয়ে আসে। তারপর বিগলিত গলায় বলে, 'কে ? নদী আপা না ? আপনি তো আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেছেন। তা নাটক করেন নাই কেন এতদিন ?'

কথা সত্য। নদী আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেছে। এর কারণ অবশ্য সে জানে না। আলাদা করে রূপচর্চার অভ্যাসও তার নেই। বরং সারাক্ষণই নানাবিধ দুশ্চিন্তায় সে বিধ্বস্ত। তারপরও কেন তাকে লোকজন সুন্দর বলে তা সে জানে না। হতে পারে রুনিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় সে শুকিয়ে যাচ্ছে। আর আজকালকার তত্ত্ব অনুযায়ী, মেয়েমানুষ যত শুকনো তত সুন্দরী। হয়তো সেই তত্ত্বেই নদীকে সবাই সুন্দরী বলছে।

নদীর সঙ্গে নীতুও আছে। রুনি বলল, 'আমার আবার মাথাব্যথা করছে খালামনি।'

নীতু কিছু বলার আগেই নদী বলল, 'মাথাব্যথা কেন করছে ?'

নদী তাড়াহুড়া করছে। সে চায় না সজলের সঙ্গে তাদের দেখা হোক। রুনি বলল, 'আমি তো জানি না মা। আমার খুব মাথাব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে চোখ ছিঁড়ে যাবে।'

'মাথাব্যথা করলে চোখ ছিঁড়ে যাবে কেন ?'

'তা তো জানি না'।

নদী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নীতু তার হাত চেপে ধরল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'দুলাভাই আসছে আপু।'

রাগে নদীর গা জ্বলে গেল। তবে নিজেকে সামলে নিল সে। এখন রেগে যাওয়ার সময় না। কারণ সজলকে দেখা যাচ্ছে। তার ঠোঁটে সিগারেট। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এদিকেই আসছে। কিন্তু ডিভোর্সের চার বছর পরও যখন কারও নিজের আপন বোনই তার বোনের প্রাক্তন স্বামীকে দুলাভাই বলে ডাকে, তখন মাথা ঠিক রাখা সম্ভব না। নদী তারপরও যতটা সম্ভব শান্তই রইল। সজল সামনে এসে দাঁড়িয়ে শেষ দুটো লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলল। তারপর লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'এখনো আপিল করার সুযোগ আছে, বুঝলে ? তুমি ভেবো না এটাই ফাইনাল রায়। আমার উকিলের সাথে কথা হয়েছে, উনি কাগজপত্র রেডি করছেন। খুব শীঘ্রই আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করব।'

নদী গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা আপনি করুন। সেটা এখানে এসে আমাকে বলার কিছু নেই।'

সজল হাসিমুখেই বলল, 'বলার অবশ্যই আছে। মামলা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই আবার বিয়েশাদির আয়োজন শুরু করে দিয়ো না। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তাই না ? তোমার চেহারা তো দেখি দিন দিন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। সো বিয়ে নিয়ে টেনশনের কিছু নেই।'

রাগে নদীর মাথার তালু ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু সে রাগল না। রুনি বলল, 'তুমি আবার আমার সামনে বসে সিগারেট খেয়েছ বাবা ?'

'সামনে বসে তো খাই নি মা।'

'তাহলে ?' কপাল কুঁচকে বলল রুনি।

'দাঁড়িয়ে খেয়েছি।'

রুনি বাবার কথায় ফিক করে হেসে ফেলল। যেন তার মাথাব্যথা ভালো হয়ে গেছে। বিষয়টা নদীর চোখ এড়াল না। সে কটমটে চোখে রুনির দিকে তাকাল। রুনি খানিক জড়সড় হয়ে গেল। বিষয়টা বুঝতে পেরে সজল বলল, 'আর খাব না মা।'

রুনি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'এই নিয়ে কতবার তুমি এটা বললে ? তুমি এত মিথ্যে কথা কেন বলো বাবা ?'

'আমি আর মিথ্যে কথা বলব না মা। ছেড়ে দেব।'

'কবে ছেড়ে দেবে ?'

'তুমি আমার কাছে চলে এলেই ছেড়ে দেব।'

'এটাও একটা মিথ্যে কথা বাবা। তারচেয়ে তুমি আগে মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দাও, তারপর আমি তোমার কাছে চলে আসব।'

সজল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুনি বলল, 'তুমি আরও একটা মিথ্যে কথা বলেছ বাবা।'

'আরও একটা মিথ্যে কথা ?' সজল এবার সত্যি সত্যি অবাক হলো।

'হুম।'

'কী মিথ্যে কথা ?'

'তুমি বলেছিলে, আমার এবারের জন্মদিনে তুমি আমাকে খুব সুন্দর একটা পুতুল কিনে দিবে। জাপানি পুতুল। কিন্তু দাও নি।'

'দেই নি কে বলেছে ? অবশ্যই দিব। আগে তোমার জন্মদিন তো আসুক।'

রুনি সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, 'আজ আমার জন্মদিন বাবা!'

সজল থতমত খেয়ে গেল। আরও একবার সে রুনির জন্মদিন ভুলে গিয়েছে! কিন্তু কী বলবে এখন ? খানিক দিশেহারা ভঙ্গিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করল। বলল, 'তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার জন্মদিন ভুলে গিয়েছি ? মোটেই না। আমি বরং ভাবছিলাম, রাতে আমি তোমাদের বাসায় গিয়ে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব। এইজন্য এমন ভান করেছি।'

রুনি কথা বলল না। সে বাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সজল বলল, 'বাবা ভুলে গেছে ভেবে যখন তোমার খুব মন খারাপ হবে, আর ঠিক তখনই রাতে বাবা নিজে

গিয়ে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে... কেমন হবে তখন ? এটাই ছিল বাবার প্ল্যান। হা হা হা।' সজল কথা শেষ করার আগেই হাসতে লাগল।

রুনি এবার গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি আরও একটা মিথ্যে বললে বাবা। আমি জানি তোমার মনেই ছিল না। তা ছাড়া মা বলেছে তোমার কাছে টাকা নেই। এইজন্য আগেভাগেই মা আমাকে একটা সুন্দর পুতুল কিনে দিয়েছে।'

সজল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নদী বলল, 'নিজের নোংরা চরিত্রটা আর মেয়েটার মধ্যে না ঢোকালে হয় না ?'

রুনি মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়ের হাত ধরে টানতে লাগল নদী। সজল কিছু বলতে গিয়েও শেষ অবধি বলল না। তার হঠাৎ খুব অসহায় লাগছে। রুনি বারবার বাবার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কিন্তু নদী গজগজ করতে করতে চলে গেল। সজলের নিজের প্রতি খুব রাগ হতে লাগল। প্রবল আক্রোশও। যেন তার চেয়ে অক্ষম, অসহায়, দুর্ভাগা পিতা আর পৃথিবীতে নেই। এত এত খারাপ সময় পার করার পরও আজকের মতো এত অসহায় বুঝি আর কখনো লাগে নি তার।

মনমোহন দাস তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নরম গলায় বললেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ সজল ?'

সজলের হঠাৎ চিৎকার করতে ইচ্ছা করল। কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমরা কি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করব না ?'

মনমোহন দাস শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'লাভ নেই সজল। শুধু শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। আর তোমার পকেটের অবস্থাও তুমি জানো।'

সজল খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'যেভাবেই হোক আমার মেয়েকে আমার চাইই উকিল সাহেব। আপনি যেভাবেই পারেন একটা ব্যবস্থা করেন।'

মনমোহন দাস সজলের কাঁধে হাত রাখলেন। সত্যি সত্যিই সজলের গা গরম। চোখের টকটকে লাল ভাব আরও বেড়েছে। চোখেমুখে কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব। তিনি বললেন, 'তুমি একটু শান্ত হও সজল। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।'

সজল এবার নিয়ন্ত্রণ হারাল। সে তার কাঁধ থেকে মনমোহন দাসের হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আপনারা কেউ কিছু করতে পারবেন না। কিচ্ছু না।'

তারপর খানিক থেমে ক্রুদ্ধ গলায় বলল,'যা করার আমাকেই করতে হবে।'

রুনির শরীরটা খারাপ। জ্বর এসেছে। সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা। ফলে রাতে তার জন্মদিনের আয়োজন হলো খুব সংক্ষিপ্ত। সে শুয়ে আছে নদীর কাছে। নদীর মন ভালো। অবশেষে মামলার রায়টা চূড়ান্ত হলো। শুধু শুধু এতদিন ধরে একটা ভোগান্তি। তবে সজলকে দেখে মনে হচ্ছে না, সে সহজে তাকে ছাড়বে। আসলে জীবন মানুষকে দারুণ সব উপলব্ধি দেয়

এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে সেই উপলব্ধি থেকে পেছনের ভুলগুলোকে শুধরে নেওয়ার সুযোগটা আর দেয় না। নদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ রায়হান।

আজকাল নিজেকে খুব দ্বান্দ্বিক লাগে নদীর। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই মনে হয়, আবারও ভুল করছে না তো! কিংবা যেটাকে ভুল ভাবছে সেটাই সঠিক নয় তো ? এ এক তীব্র যন্ত্রণাকর অনুভব। রায়হানের সঙ্গে তার আবার খানিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। তবে সেই যোগাযোগ একদমই কাজের। নদী যেহেতু আবারও অভিনয় শুরু করেছে। আর দিন যত গিয়েছে, ততই বহু বছর আগের সেই ঘটনা তার কাছে কেমন অস্পষ্ট আর গোলমেলে ঠেকেছে। এমন তো নয় যে সে সত্যি সত্যিই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল ?

রায়হান অবশ্য ওই প্রসঙ্গ আর তোলে না। নদীও না। তারা দুজনই চুপচাপ শান্ত। তবে রায়হান নদীকে বলেছে, নদীর যদি কখনো ইচ্ছে হয়, তবে তারা আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারে। আর তা নদীর শর্ত মেনেই। নদী অবশ্য ভেতরে ভেতরে খুব গুটিয়ে ছিল। ফলে নিজ থেকে সে কখনো কিছু বলে না। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস সে ভেতরে ভেতরে টের পায়। মানুষ কি কখনোই তার একজীবনে সেই মানুষটাকে খুঁজে পায়, যাকে সে সত্যি সত্যি চায় ?

নাকি পুরো জীবনটাই কেবল ভুলের বিকিকিনি! মানুষের ভাবনা বদলায়। কেউ মানিয়ে নেয়। কেউ নেয় না। কিন্তু জীবনভর কেবল রয়ে যায় আক্ষেপ। আর অনুভূতি বদলায়। আজ যা ঘৃণা, কালই হয়তো তা ভালোবাসা। আবার আজ যা ভালোবাসা, তা-ই হয়তো কাল ঘৃণা। এই যে সজল, সজলকে সে যতটা ভালোবেসেছিল, অতটা ভালো কি কেউ কাউকে বাসে ? কিংবা এই যে এখন, যতটা ঘৃণা সে সজলকে করে, এতটা ঘৃণা কি কেউ কাউকে করে ? আর রায়হান ?

নদী জানে না। সে আসলে নিজেকেই বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, মানুষ কি কখনোই তার নিজের অনুভবটা পুরোপুরি বোঝে ? কিংবা চেনে নিজেকে ? নাকি সারাটা জীবন সে যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, ঝাপসা লাগলে কেবল সেই আয়নাটাকেই মুছতে চায় ? অথচ সে কখনোই বুঝতে চায় না ওই আয়না নয়, সবার আগে ধুয়ে-মুছে স্পষ্ট করতে হবে নিজেকে। আয়না যত ঝকঝকে পরিষ্কারই থাক না কেন, নিজেকে পরিষ্কার করতে না পারলে সেই আয়নায় সে কখনোই নিজের স্পষ্ট অবয়বটা দেখতে পারবে না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে তুমুল ঝড়। নদী হঠাৎ আবিষ্কার করল, গালের কাছে তার বালিশটা খানিক ভেজা। সে কি কাঁদছিল! কেন ? কখন ? নদী আপনমনেই মৃদু হাসল। নিজের অবচেতন চোখের জল দেখে এমন করে কি কেউ কখনো হাসে ? নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করে ?

রাত বারোটার কিছু আগে নিচের গেট থেকে খবর এল সজল এসেছে। এতরাতে সজলের কথা শুনে ভারি রাগ হলো নদীর। এই এখন কিছুতেই সে সজলকে বাসায় ঢুকতে দিবে না। এ নিয়ে পাঁচজন পাঁচ কথা শোনাবে। নিচের দারোয়ানটাও লোকের কাছে নানান কথা ছড়াবে। মাত্র এ কবছরেই নদী সবচেয়ে বেশি যেটি উপলব্ধি করেছে, তা হলো, এ দেশে একজন ডিভোর্সি নারীর জীবনের চেয়ে দুঃসহ আর কিছু নেই। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার চারপাশের পুরুষের কাছে যেন আপনাআপনিই এই বার্তা পৌঁছে যায় যে এই নারী সহজলভ্য। একে নিয়ে অশোভন মজা করা যায়। চোখের ইশারাতেই বিছানায় নিয়ে যাওয়া যায়। ইচ্ছেমতো রটনা রটানো যায়। একে রক্ষা করার কেউ নেই। তা সে যত ক্ষমতাবান নারীই হোন না কেন!

এ যুদ্ধেও মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে যায় নদী। এই যে সজল এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এত রাত করে এখানে এসেছে, এ নিয়েও দশজন রসিয়ে রসিয়ে কথা বলবে। সে কথার ডালপালা ছড়াবে। রাস্তায় পেছন থেকে কেউ শিস দিয়ে নোংরা মন্তব্য ছুড়ে দিবে। নদী দারোয়ানের ফোনে ফোন করল। কিছুতেই সজলকে ভেতরে আসতে দেওয়া যাবে না। ওপরে তো নয়ই। কিন্তু দারোয়ানের ফোন ধরল সজল। তার গলা ভারী। সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ভেতরে আসতে দিবে না ?'

প্রচণ্ড রাগে মাথা গরম হয়ে আছে নদীর। সে উত্তপ্ত গলায় বলল, 'এত রাতে কোনো ভদ্রমহিলার বাড়িতে এভাবে কেউ ঢুকতে পারে না। এটা একটা ভদ্র এলাকা। এখানে যারা থাকে, তারা সবাই ভদ্রলোক। আপনার মতো...।' নদী কথা শেষ করতে পারল না। রাগে রীতিমতো তার হাত পা কাঁপছে।

সজল চিৎকার করে বলল, 'আমার মেয়েকে তুমি আমাকে দেখতে দিবে না ?'

নদীর মাথায় রক্ত চেপে গেছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'না।'

সজল আবারও চিৎকার করে বলল, 'তুমি আমার মেয়েকে আমাকে দেখতে দিবে না ?'

নদীও একইভাবে শক্ত গলায় বলল, 'না।'

'আজ তার জন্মদিন। তার জন্মদিনের রাতে তার বাবা তাকে দেখতে পারবে না!'

নদীর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। আপাদমস্তক হিপোক্রেট একটা লোক। মেয়ের জন্মের সময় খবর নেই। জন্মের পরও কোনো দায়দায়িত্ব নেই। আর আজ এই মধ্যরাতে এসেছে পিতৃত্ব ফলাতে! সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এটা পিতৃত্ব ফলানোর সময় না। এখন রাত বারোটা বাজে। ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন কাম টুমরো।'

বলেই ফোন রেখে দিল নদী। সজল অবশ্য গেল না। সে চিৎকার চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় তুলল। নানান হুমকি-ধামকি দিতে লাগল। যদিও ঝড়বৃষ্টির রাত হওয়ার কারণে খুব বেশি মানুষ সেটা শুনতে পেল না। সজল কতক্ষণ এসব করল নদী জানে না। তবে দীর্ঘসময় পরে দারোয়ান জানাল সজল রুনির জন্মদিনের গিফট রেখে গেছে নিচে।

নদীর একবার মনে হলো ওই গিফট সে রুনিকে দিবে না। এই মধ্যরাতে আশপাশের বাসার মানুষের কাছে তাকে চূড়ান্ত ছোট করেছে সে। বিষয়টা নিতে পারছে না নদী। কিন্তু শায়লা বেগম নীতুকে নিচে পাঠিয়ে গিফটের প্যাকেট দুটি আনিয়ে নিলেন। ততক্ষণে রুনি অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে।

সজল মেসে ফিরল গভীর রাতে। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তাকে দেখে তার মেসের রুমমেট জাহেদ ভয় পেয়ে গেল। দরজা খুলতে দেরি হয়েছে বলে জাহেদকে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিল সজল। তারপর উন্মাদের মতো আচরণ করতে লাগল। ঠিক জ্বরের ঘোরে কি না বোঝা গেল না, তবে সারা রাত বিড়বিড় করে কীসব বলতে লাগল সে। তার সেই বিড়বিড় করা কথার বেশির ভাগই রুনিকে নিয়ে। যে করেই হোক, রুনিকে সে ফিরিয়ে আনবেই। যে-কোনো মূল্যে, যে-কোনোভাবে।



গত ক বছরে আকিব আর নীতুর সম্পর্কে যেন একটু একটু করে আলো-হাওয়া লেগেছে। তবে সেটিতে কোথাও প্রকাশ্যে কিংবা সোচ্চারে ভালোবাসার কথা নেই। হয়তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনই আরও পরিণতও হয়েছে। বিশেষ করে আকিব। ফলে সে নীতুর অনুভূতিকে নীরবে, গভীরে পাঠ করতে চায়। কেবল নিজের মতো করে অনুবাদ নয়। সম্পর্কে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীর অনুভূতিকে নিজের মতো অনুবাদের চেয়ে অনুভব করাটা ঢের বেশি জরুরি।

আকিব এখন অনেক বেশি শান্ত, স্থির। সে অপেক্ষা করতেও শিখে গেছে। তার সেই প্রকট পাগলামিটাও আর নেই। ফলে দুজনের অগোচরেই ওই আলো-হাওয়াটুকু যেন বাড়িয়ে তুলেছে তাদের সম্পর্কের সীমানাটাও। তারা কেউ কাউকে আর কখনো জিজ্ঞেস করে নি, ভালোবাসে কি না। কিন্তু পরস্পর যেন জানে, সবকিছু জিজ্ঞেস করতে নেই। সব প্রশ্নের উত্তর হয় না। কিছু অনুভব আপনাআপনিই আপন হয়ে যায়। নিজের হয়ে যায়।

নীতু সেদিন বলল, 'আমি কিছুদিন আসব না আকিব।'

'কেন ?'

'বড় আপু আর রুনিকে নিয়ে একটু ঢাকার বাইরে যেতে হবে।'

'কোনো সমস্যা ?' চিন্তিত দেখাল আকিবকে।

'একদম না।' হাসল নীতু। 'বহুদিন কোথাও যাই না আমরা সবাই মিলে। সে কারণেই যাওয়া। গ্রামের দিকে কোথাও।'

'আচ্ছা।' বলে চুপ করে রইল আকিব। তারপর বলল, 'তারপর ?'

'তারপর কী ?'

'পড়াশোনা তো শেষ। কী করবে এখন ?'

'এখনো ভাবি নি।'

'চাকরিবাকরি ?'

'কিছু একটা তো করতেই হবে।' উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে জবাব দিল নীতু। 'দেখি। মাস্টার্সের রেজাল্টটা হোক।'

আকিবের খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বিয়ে নিয়ে নীতুর ভাবনা কী। কিন্তু সে জিজ্ঞেস করল না। নীতুর বান্ধবীদের কম বেশি প্রায় সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। নীতু

সাধারণত কোথাও যায় না। তবে সেদিন আকিবদের বাসায় গিয়েছিল সে। আকিবের মা বললেন, 'আমার কাছে ভালো একটা পাত্র আছে। চাইলে বিয়ে করে ফেলতে পারো।' বলে হাসলেন তিনি।

নীতু কথা বলল না। তিনি বললেন, 'আকিব কিন্তু ছেলে হিসেবে ভালো। তোমরা সমবয়সী জেনেও বলছি। এই যে এত বছর সংসার করছি, এখন কী মনে হয় জানো ? বয়স না, বোঝাবুঝিটাই আসল। অথচ আমাদের দেশে বিয়ের আগে কেবল বয়সটাই দেখা হয়। বোঝাবুঝি নিয়ে ভাবনার কোনো বালাই নেই।'

নীতু মৃদু হাসল। এই মানুষটাকে তার অসম্ভব পছন্দ। একটা মা মা ঘ্রাণ তাঁর শরীরজুড়ে। সেখানে একটা বন্ধুসুলভ ব্যাপারও আছে। নদীর ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে তারা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই কেউ না কেউ প্রসঙ্গটা তুলেছে। এবং নদীকে নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে এটা সেটা বলেছেও। তার সবই তীব্র আপত্তিকর। নদী যে সেসব কী করে সহ্য করে, নীতু জানে না। তবে সে জানে, কী অসহ্য অপমানকর সেসব কথা! কেবল নদীর ডিভোর্সকে কেন্দ্র করেই তার নিজের ভবিষ্যৎ কিংবা বিয়ে নিয়েও নানা কথা তাকে শুনতে হয়েছে। ডিভোর্সি বড় বোনের ছোট বলে কী কী ভোগান্তি তাকে পোহাতে হবে, কেন তার সহসা ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসবে না, এমন নানান কিছু।

কিন্তু আকিবের মা এসবের মধ্যেও আশ্চর্য ব্যতিক্রম একজন মানুষ। তাঁর আচরণে, কথায় কখনোই বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু খুঁজে পায় নি নীতু। বরং তিনি যেন নরম তুলোর মতো মানুষ। কাছে গেলেই কী কোমল মায়াময় উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখেন! নীতুর মাঝে মাঝে মনে হয়, শাশুড়ি হিসেবে তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ হয় না। সে সেদিন হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিল আকিবকে, 'কেবল তোমার মাকে শাশুড়ি হিসেবে পাওয়ার জন্য হলেও তোমাকে বিয়ে করা ফেলা যায় আকিব। যাতে সারাক্ষণ তাঁর আশপাশে থাকা যায়।'

শুনে আকিব হেসেছিল। বলেছিল, 'তুমি কি জানো, আম্মু তোমাকে কী অসম্ভব পছন্দ করে ?'

নীতু জানে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। এই ছোট্ট জীবনে কিছু মানুষের অবিশ্বাস্য ভালোবাসা সে পেয়েছে। কিন্তু কেন যেন সেইসব ভালোবাসার কাছে আর যেতে চায় না সে। থাকতে চায় দূরে। যেখান থেকে ছোঁয়া যাবে না কিছুই, কিন্তু অনুভব করা যাবে পুরোপুরি।

নীতুর মাস্টার্সের রেজাল্ট হয়েছে। অন্তু বলল, 'কী করবি এবার ?'

'দূরে কোথাও চলে যাব।'

'দূরে কোথায় ?'

'যেখানে কেউ আমাকে চেনে না কিংবা আমিও কাউকে না।'

অন্তু তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। এই এতটা বছরেও কখনো সে নীতুর সঙ্গে কিছু নিয়ে জোর করে নি। নীতু যা বলেছে চুপচাপ মেনে নিয়েছে। নীতুর সব উপেক্ষা, অপমান, স্বেচ্ছাচারিতা—সব। কিন্তু এভাবে আর কত দিন ? সবকিছুরই তো একটা সমাপ্তি আছে। সে যে অন্যায় করেছে, তারও। এই দীর্ঘ বছরে দিনের পর দিন যে অপরাধবোধ, যে ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণা সয়েও হাসিমুখে নীতুকে আগলে রাখতে চেয়েছে সে, তারপরও তার প্রায়শ্চিত্ত হয় নি ? অন্তু বলল, 'আমি কী করব আমাকে তুই বল প্লিজ ? আমি আর পারছি না।'

নীতু দায়সারা ভঙ্গিতে বলল, 'নিজের জীবনটাকে নিজের মতো সাজিয়ে ফেল। চাকরিবাকরি কর। তারপর বিয়ে। জীবনটাকে কেন এভাবে ফেলে রেখেছিস ?'

'নীতু!' অন্তু ব্যাকুল গলায় ডাকল। তারপর শক্ত করে তার হাতটা ধরল। তারপর বলল, 'এবার তো সব ঠিক হোক ? কম তো হয় নি!'

নীতু নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, 'আমার আর কাউকে ভালো লাগে না অন্তু। আমার মনে হয় বাকি জীবনটা আমি এভাবে কাটিয়ে দিব। একা একা। দূরে কোথাও চলে যাব। এই বিয়ে, ঘর, সংসার, সন্তান, সম্পর্ক এসব কিছুই আমার আর সহ্য হয় না অন্তু। নিজের জীবন, বড় আপুর জীবন, আশপাশের মানুষ—সব তো চোখের সামনেই দেখেছি। আসলে কি জানিস, শেষ পর্যন্ত মানুষ একাই। তাহলে শুধু শুধু যন্ত্রণা বাড়ানো কেন ?'

অন্তু কথা বলল না। নীতুই খানিক থেমে আবার বলল, 'বিশ্বাস কর, এইসব বিয়ে, ঘরসংসারের কথা ভাবলেই আমার গা ঘিনঘিন করে। আমি তোকে বোঝাতে পারব না। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকতে দে না প্লিজ।'

অন্তু আর কথা বলে নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকিয়ে ছিল নীতুর দিকে। তবে তার সেই দীর্ঘশ্বাস তীব্র ক্রোধে পরিণত হলো তার কিছুদিন বাদেই। খবরটা সে পেয়েছে আকিবের কাছ থেকেই। আকিব তাকে ফোন করে বলল, 'একটা দারুণ খবর আছে বন্ধু।' তার গলায় উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাস চেপে রাখারও চেষ্টা করছে না সে।

'কী খবর ?'

'নীতু অ্যাকসেপ্টেড মাই প্রপোজাল।'

'মানে ? কিসের প্রপোজাল ?'

'নীতু বিয়েতে রাজি হয়েছে।'

'বিয়েতে ? কার সাথে ? কিসের বিয়ে ?' এত অবাক আর কখনো হয় নি অন্তু।

'আমার সাথে। আম্মু আগামীকালই ওদের বাসায় যাবে প্রস্তাব নিয়ে। ফরমাল প্রপোজাল। নীতুর মায়ের সাথে আম্মুর ফোনে কথাও হয়েছে।'

অন্তুর মাথা কাজ করছিল না। নীতুকে সারা রাত ফোন করল সে। কিন্তু নীতুর ফোন বন্ধ। তার সঙ্গে দেখা হলো দিন কয়েক বাদে। নীতু দাঁড়িয়ে ছিল পথপুষ্প স্কুলের সামনের মাঠে। সেখানে আকিব নেই। অন্তুকে দেখে চমকে গেল নীতু। তাকে সুস্থ

মানুষ মনে হচ্ছে না। উস্কোখুস্কো চুল। চোখের নিচে কালি। ফ্যাকাশে মুখ। সে নীতুর সামনে দাঁড়িয়েই কান্নাজড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'কী করেছি আমি ? বলো আমি কী করেছি ? একটা ভুলই তো করেছি। মানুষ ভুল করে না ?'

নীতু কথা বলল না। সে বিস্মিত চোখে অন্তর দিকে তাকিয়ে রইল। অন্ত বলল, 'এই একটা ভুল সংশোধনের জন্য আমি কী করি নি ? বলো কী করি নি ? গত পাঁচ-ছটা বছর প্রত্যেকটা দিন আমি তোমার পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে থেকেছি। থাকি নি ?'

নীতু জবাব দিল না। অন্ত বলল, 'তুমি হাসলে আনন্দে লেজ নাড়িয়েছি। কাঁদলে পাগলের মতো এদিক সেদিক ছুটে গেছি। যদি তোমাকে সামান্য হলেও আনন্দ দেওয়া যায়। নিজের দিকে কখনো তাকাই নি। রাতের পর রাত ঘুমাই নি, খাই নি। কারও সাথে কথা বলি না। কোথাও যাই না। সারাটাক্ষণ তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে। তুমি কখন হাসবে, কখন কাঁদবে। আমি সাথে সাথে ছুটে আসব। তারপরও তোমার এতটুকু মায়া হয় না ? একটুও না ?'

অন্ত কাঁদছে। নীতু কথা বলছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। অন্ত হঠাৎ বলল, 'তুমি একটা মিথ্যুক নীতু। তুমি একটা আপাদমস্তক মিথ্যুক। তুমি আসলে যে-কোনো উপায়ে আমাকে তোমার জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলে। তোমার কেবল একটা কারণ দরকার ছিল। আর সেজন্যই আমার অপরাধবোধটাকে আমার দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহার করেছ। অ্যান্ড ইউ প্লেইড ওয়েল।' বলেই চিৎকার করে উঠল সে। তারপর হিসহিসে গলায় বলল, 'আকিবকে বিয়ে করবে তুমি ? তো করো। কিন্তু আমার সাথে কেন মিথ্যে নাটকটা করলে ? আমি কি তোমাকে বাধা দিতাম ? ইউ আর আ হিপোক্রেট নীতু। ইউ আর সাচ আ ফিলদি হিপোক্রেট, লায়ার। থুঃ।'

বলেই নীতুর সামনে একদলা থুথু ফেলল সে। নীতু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নীতুর গালে সপাটে চড় বসাল অন্ত। হতভম্ব নীতু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। অন্ত কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল সে। দূরে আকিবকে দেখা যাচ্ছে। পেছনের ল্যাম্পপোস্টের আলোর উল্টোদিকে হেঁটে আসছে সে। তার লম্বা ছায়া পড়েছে মাঠে। সেই ছায়ায় ক্রমশই ঢেকে যাচ্ছে অন্ত। আকিবের ছায়ার ভেতর থেকে অন্তকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না।



সপ্তাহখানেকের ছুটিতে সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছে নদী। শায়লা বেগমের শরীরটা বেশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে। বিশেষ করে নদীর ডিভোর্সের পর। আজকাল তিনি কথাবার্তাও তেমন বলেন না। ঘরের কাজকর্ম করেন। নামাজ রোজা করেন। বাকিটা সময় কাটান রুনির সঙ্গে। রুনিই যেন তার জীবনের একমাত্র আনন্দের উৎস। দুঃখ ভুলে থাকার মন্ত্র।

ঢাকার খুব কাছেই মানিকগঞ্জ। নদীদের গ্রামের বাড়িও এখানেই। মূল শহর থেকে খানিক ভেতরে শান্ত, নিরিবিলি এক গ্রামে। শহরের এত কাছে এমন সুন্দর গ্রাম যে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, টইটম্বুর নদী, সবুজ বৃক্ষের দীর্ঘ সারি। এখানে সেখানে নানান গ্রামীণ উৎসব। লোকজ অনুষ্ঠান। কত কী যে হয় চারদিকে! কিন্তু শহরের মতো সেসব প্রাণহীন নয়। বরং দিন কয়েক থাকলেই যেন বুকভরে অফুরন্ত প্রাণশক্তি শুষে নেওয়া যায়।

রুনি কখনো গ্রাম দেখে নি। নদীরও বহুদিন আসা হয় না। জীবন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সেখানে বিরাম নেই। অবিরাম ক্লান্তিকর এক ছুটে চলা। ফলে এবারের এই অবকাশটুকু যেন নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগও। গাঁয়ের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলে দিন কয়েকের জন্য আনন্দময় এক পুনর্মিলনীও হয়ে যাবে এই ফাঁকে। কিন্তু যতই শহর ছাড়িয়ে তারা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল ততই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল নদীর। সজলের স্মৃতি সে কোনোভাবেই আর মনে করতে চায় না। তার জীবনের প্রায় সবটুকুই নিংড়ে নিঃশেষিত করে নিয়েছে সে। আর তার বিপরীতে দিয়েছে দুঃসহ যন্ত্রণাময় এক জীবন।

নদীর এখনো মনে আছে সজলের সঙ্গে প্রথম ঠিক এখানেই ঘুরতে এসেছিল সে। তখন শীতকাল। চারদিকে মিহি কুয়াশার চাদর। দিগন্তবিস্তৃত হলুদ সর্ষেখেত। তার ওপর সারি সারি বক উড়ে যাচ্ছে দূরে। সর্ষেখেতের ভেতর ছোটাছুটি করছে লাল নীল চাদর পরা শিশুরা। ঠিক ওই জায়গায়টায় তখন ব্রিজ ছিল না। নদীটা কি আরও খানিকটা চওড়া ছিল ? হবে হয়তো। স্পষ্ট মনে নেই নদীর। তবে আর সব স্পষ্ট মনে আছে তার। এত স্পষ্ট যে মনে হয় চোখের সামনে সিনেমার পর্দায় ভেসে বেড়াচ্ছে দৃশ্যগুলো। সে একটা অফহোয়াইট শাড়ি পরেছিল। আর একটা এক রঙা হালকা মেরুন রঙের চাদর। চাদরটা তাকে সজল দিয়েছিল। সেখানে নিজ হাতেই কারুকাজ করেছিল সে। সেই কারুকাজে লেখা ছিল নদীকে নিয়ে কবিতাও। কবিতাটা এখনো মনে আছে নদীর—

'আমায় দিয়ো একটুখানি ছুঁয়ে, আমায় দিয়ো একটুখানি মন,
এই জনমের জন্ম মৃত্যু জানে, তুমি মানেই আমার সমর্পণ!'

নদীর এখনো গা শিউরে ওঠে লাইনটা পড়লে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সজলের প্রতি তীব্র এক ঘৃণাও। একটা মানুষ ভেতরে আর বাইরে কী করে এমন আলাদা হতে পারে, তা সে জানে না। নদী ভাবতে না চাইলেও দৃশ্যগুলো যেন তার চোখের ভেতর সুঁইয়ের তীক্ষ্ণ ফলার মতো গেঁথে যেতে থাকল। নদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাদের জীবনের ওই গল্পটুকু নিয়ে হয়তো নাটক হতে পারত, উপন্যাসও হতে পারত। সবাই ভাবত পৃথিবীটা কী অদ্ভুত সুন্দর! মন ও মানুষ কী মায়াময়, ভালোবাসাময়। কিন্তু গল্পের বাকি অংশ কি তারা জানত ? কখনোই জানত না। গল্পের বাকি অংশ কেবল জানে নদীরা।

নদীরা বাড়ি পৌঁছাল বিকেলে। সূর্যের তেরছা আলো পড়েছে উঠানে। সেই আলোয় সোনালি আভা ছড়াচ্ছে কতকগুলো মুরগির বাচ্চা। তারা ঠোঁটে খুটে খুটে কিছু খাচ্ছে। মা মুরগিটা দাঁড়িয়ে আছে দূরে। হয়তো মুগ্ধ চোখে বাচ্চাদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা দেখছে। রুনি হঠাৎ ছুটে গেল সেদিকে। সে মুরগির বাচ্চা ধরবে। কিন্তু মা মুরগিটা সঙ্গে সঙ্গেই তেড়ে এল। নীতু চট করে তাকে ধরে ফেলল। সন্ধের আগে আগে তারা নদীর ধারে ঘুরতে গেল। নদীর দুধারে সবুজ ঘাসের কার্পেট। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিল নদী। তার দেখাদেখি অন্যরাও। খালি পায়ে হাঁটতে কী যে ভালো লাগছে! কত দিন পর এমন শিশিরভেজা ঘাসে পা ডোবানো ? এমন মাটি ছুঁয়ে দেখা ? এই স্পর্শের অনুভব কতকাল পাওয়া হয় না!

রাতভর তারা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছুটে বেড়াল। শহরের আগেই গাঁয়ে শীত নেমে আসে। সন্ধ্যা হতেই টুপটাপ শিশির। ঘন কুয়াশা। উঠোনে উঠোনে আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পের আসর। পিঠাপুলির উৎসব। এ যেন অন্য এক জগৎ। এ জগতে যেন কোনো জটিলতা নেই, সংকট নেই, সংঘাত নেই। কিংবা থাকলেও নদীরা তা টের পায় না। তারা কেবল অনুভব করতে থাকে টলটলা জলের মতো স্বচ্ছ, সহজ, গভীর এক জীবন।

নদীর কী যে ভালো লাগছে! এখন গাঁয়েও মানুষ টিভি দেখতে পায়। ফলে অনেকেই তাকে চেনে। খবর পেয়ে দূরদূরান্ত থেকেও কতজন যে তাকে দেখতে ছুটে এল। সঙ্গে নিয়ে এল নানারকম উপহার। নদী মুগ্ধ হয়ে গেল সেইসব অকৃত্রিম ভালোবাসায়। এত এত ভালোবাসা চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অথচ আমরা কেবল মুখোমুখি হই ঘৃণার। কিংবা ঘৃণাটাকেই বড় করে দেখি।

চড়ুই পাখির ডানায় চলে যেতে লাগল সময়। যতটা ভালো লাগবে বলে নদী ভেবেছিল, তার চেয়েও বহুগুণ আনন্দে কাটতে লাগল দিন। যেন ইচ্ছের অসীম আকাশে স্বাধীন পাখির মতো উড়ে বেড়াল তারা। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। এ উঠান থেকে সে উঠান। ছেলেবেলার কত কত খেলা যে আবার খেলা হলো। সেই বৌচি, কানামাছি, গোল্লাছুট। আরও কত কী!

সেদিন রাতে রুনি হঠাৎ বলল, 'আমি আর ঢাকায় ফিরে যাব না মা।'

'কেন ?'

'ওখানে আমার ভালো লাগে না।'

'তাহলে কোথায় ভালো লাগে ?'

'এখানে।'

'কেন ?'

বার কয়েক চেষ্টা করেও ঠিকঠাক উত্তরটা গোছাতে পারল না রুনি। শেষে বলল, 'এখানে আকাশ অনেক বড়। ঢাকায় এইটুকু।' সে দুই আঙুলের ডগা এক করে ঢাকার আকাশের এক চিমটি আকৃতিটাকে দেখানোর চেষ্টা করল। নদীর মন খারাপ হয়ে গেল। আসলেই তো! ঢাকায় শিশুদের জন্য একটা খেলার মাঠ নেই। বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো হাওয়া নেই। মাথার ওপর আকাশ নেই। এই যে এই কটা দিনেই যেন রুনি অন্য এক মানুষ হয়ে গেছে। ঝলমলে, হাসিখুশি। তার চোখেমুখে ঠিকরে পড়ছে আলো। অথচ ঢাকায় গেলেই আবার সেই চোখে মুখে অসুখ। শরীর-মন জুড়ে বিষাদের জলছবি।

ফেরার দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই মন খারাপ হতে লাগল সবার। সবচেয়ে বেশি রুনির। আগের দিন বিকেলে সে বলল, 'মা, আজ একটু বড় রাস্তার দিকে খেলতে যাই ?'

'কেন ?' গম্ভীর মুখে বলল নদী। 'ওখানে কী ?'

'না বোলো না প্লিজ ?' ছোট ছোট হাতে হাতজোড় করে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল রুনি। 'কাল তো চলেই যাব। প্লিজ মা।'

তার চোখ ছলছলে। বাড়ি থেকে এই কয়েক কদম গেলেই নতুন রাস্তা হয়েছে। সেটা যে এমন আহামরি কোনো রাস্তা, তা নয়। তবে এই গায়ে ওই রাস্তাটুকু হওয়ার কারণেই মানুষ গাড়ি নিয়ে আসা-যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলে সবাই তাকে বড় রাস্তাই বলে। সেখানে অন্যান্য ছেলেপুলেদের সঙ্গে রুনিকে যেতে দিতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না নদীর। কিন্তু তার ওরকম চোখে মুখে অনুরোধ দেখে নাও করতে পারল না সে। বলল, 'আর কে কে যাবে ?'

রুনি বেশ কজনের নাম বলল। তাদের কাউকেই চেনে না নদী। চেনার কথাও না। আশপাশের সব বাড়িতেই অসংখ্য বাচ্চাকাচ্চা। তাদের বাবা-মায়ের নাম অবধি সে ভুলে গেছে। সেখানে ওই পিচ্চি-পাচ্চাদের নাম মনে রাখা তো অসম্ভব! তবে সে মনে মনে খুশিই হলো। মাত্র কদিনেই এখানে কত কত বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে সে। নদী বলল, 'ওরা সবাই তোমার বন্ধু ?'

'হুম।'

'কেমন বন্ধু ?'

রুনি আধো উচ্চারণে বলল, 'বেস্টি।' এই শব্দটা সে নতুন শিখেছে।

নদী বলল, 'কারও কি এতগুলো বেস্ট ফ্রেন্ড হয়? বেস্ট ফ্রেন্ড তো হয় একজন?'

রুনি গাল ফুলিয়ে বলল, 'ওরা এত ভালো জানো মা? সবাইকেই আমার বেস্টি মনে হয়।'

নদী রুনিকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিল। তারপর নিজেদের জিনিসপত্র গোছাতে বসল। যাওয়ার সময় লাগেজ অনেক ভারী হয়ে যাবে। গ্রাম থেকে কতকিছু যে নিয়ে যেতে হয়। কাজ শেষ করে নীতুকে নিয়ে খানিক ঘুরতে বের হলো সে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবার কাছ থেকে বিদায়ও নিল। রুনির কথাটা যেন কিছু সময়ের জন্য মাথা থেকে হারিয়েই গেল। নীতু আচমকা বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো আপু। রুনি যদি ফিরে আমাদের না দেখে খুব কাঁদবে।'

'ও হ্যাঁ।' যেন হঠাৎ মনে পড়ল নদীর। 'আমি তো ভুলেই গেছিলাম।'

তারা তাড়াহুড়া করে বাড়ি ফিরল। শায়লা বেগম ওজু করে নামাজে যাচ্ছিলেন। নদী বলল, 'রুনি কই মা?'

'রুনি কই মানে?' শায়লা বেগম খুব অবাক হলেন। 'তোদের সাথে যায় নি?'

'না মা। ও তো বাচ্চাদের সাথে বড় রাস্তার ধারে খেলতে গেল। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসার কথা। এখনো আসে নি?'

'না। দেখি নি তো। তোরা একটু এগিয়ে দেখ। অন্ধকার হয়ে আসছে তো। একা একা না আবার ভয় পেয়ে যায়।'

বড় রাস্তা যে খুব দূরে তা নয়। মিনিট তিনেকের হাঁটা পথ। কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরুতেই যেন ঝপ করে নেমে এল সন্ধ্যা। চারদিকে কেমন সাদা কাফনের মতো প্রাণহীন কুয়াশা। শূন্য, রুক্ষ, থম ধরা মৃত সন্ধ্যা। যেন বুকের ভেতর বিষাদের সুর গেঁথে দিতে থাকল। নদী জানে না কেন, তার হঠাৎ খুব অস্থির লাগতে লাগল। সে নীতুকে বলল, 'পা চালিয়ে হাঁট নীতু। আমার কেন যেন ভয় করছে।'

বড় রাস্তার ধারে এসে থমকে দাঁড়াল তারা। চারপাশে কোথাও কেউ নেই। শূন্য, খাঁখাঁ প্রান্তর। নদীর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। আশপাশে কাউকে দেখতেও পেল না সে যে জিজ্ঞেস করবে। নীতু বলল, 'ওর সাথে আর কে কে ছিল আপু?'

নদী কথা বলল না। তীব্র আতঙ্কে তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। সে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। বড় রাস্তার উঁচু ঢাল বেয়ে নামতে লাগল দ্রুত। তারপর একে একে সবগুলো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু রুনি কোথাও নেই। কোথাও না। আর সব বাচ্চারা ঠিকঠিক যার যার ঘরে ফিরে এসেছে। কেবল রুনিই নেই! নদী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। সে চিৎকার করে আছড়ে পড়ল ঘরের দাওয়ায়, 'রুনি কই? আমার রুনি? রুনি?'

খায়রা বেগম লোক ডাকলেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে লোক পাঠানো হলো রুনিকে খুঁজতে। বড় রাস্তার আশপাশের সব জায়গায়ও। খোলা ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে নদীর পাড়, বাঁশঝাড় অবধি। কিন্তু কোথাও রুনি নেই। রাত তখন দশটা। সেই রাতেই রুনির খোঁজে আশপাশের গুকুরে লোক নেমে গেল। জাল ফেলা হলো নদীতে। গাঁয়ের শত শত লোক চলে এল তাকে খুঁজতে। কিন্তু কোথাও রুনি নেই।

যেন ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে!



ফজলু মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে থানার ওসি মোফাসসেল হোসেন। তিনি বললেন, 'কেমন আছেন আপনি ? শরীর-স্বাস্থ্য ভালো ?'

ফজলু মিয়া বলল, 'আপনারা যেমন রাখছেন, তেমনই।'

'আমরা কি ভালো-মন্দ রাখার মালিক ? ভালো-মন্দ রাখার মালিক আল্লাহ।'

ফজলু মিয়া হাসল, 'আল্লাহ তো আছেই। আপনেরা হইলেন উছিলা। দুনিয়ায় উছিলার দরকার আছে।'

মোফাসসেল হোসেনকে চা খেতে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই চা খাচ্ছেন না। তাঁকে বিচলিত লাগছে। ফজলু মিয়া বলল, 'তা ওসি সাব কি কিছু বলবেন ? আমার আবার একটু কাজ আছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তো জানেনই ? গত দুই মাস আপনাগো ভালো-মন্দ কোনো খেদমতও করতে পারতেছি না।'

'একটা কথা।'

'জি।'

'আপনি অন্যভাবে নিয়েন না। আপনার সাথে তো আমার বহু বছরের সম্পর্ক। সেখান থেকেই কথাটা বলতে চাই।'

'জি বলেন।' ফজলু মিয়া আঙুলের ডগায় সর তুলে চুমুক দিল। যথারীতি তার ঠোঁটের কোষ গড়িয়ে সাদা দুধের সরু প্রস্রবণ নেমে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে মোফাসসেল হোসেন বলল, 'এমপি সাহেবের ঘটনা তো মনে হয় শুনছেন ?'

'কী ঘটনা ?'

মোফাসসেল খানিক সময় নিয়ে বললেন, 'তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের পরিচালক আরিফুলকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফজলু মিয়া ধীরেসুস্থে সর খাওয়া শেষ করে এক চুমুকে গ্লাসের চাটুকুও শেষ করল। তারপর গ্লাসটা উঁচু করে কাত করে ধরল তার মুখ থেকে সামান্য দূরে। তারপর জিভ বের করে অপেক্ষা করতে লাগল গ্লাসের তলা নিংড়ে আসা চায়ের শেষ বিন্দুগুলোর জন্য। টপটপ করে কয়েকটা ফোঁটা তার জিভের ডগায় পড়ল। সে সেই ফোঁটাগুলোও আরাম করে খেল। তারপর গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'কই গেছে সে ? বহুদিন তার লগে আর যোগাযোগ নাই আমার। লাস্ট যেইবার আইছিল, বছর কয়েক আগে, তখন তারে যাওনের সময় আমি এক ঝুড়ি ইলিশ মাছ দিয়া দিছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ

নাই। আমার খুব পেয়ারের লোক সে। ইয়ার-বন্ধুমানুষ আমরা। একে অন্যরে নাম ধইরা তুই তোকারি কইরাই কথা কইতাম।'

'আচ্ছা।'

'কয় দিন হইলো খোঁজ নাই ?'

'সাত দিন।'

'কাউরে কিছু বইলা যায় নাই ?'

'নাহ। ফোনও বন্ধ।' বললেন মোফাসসেল হোসেন।

'চিন্তা কইরেন না, ফিরা আইবো। হয়তো ফুর্তি টুর্তি করতে গেছে কোথাও।'

'না। এমপি সাহেব সবখানে খোঁজ নিয়েছেন। কোনো ট্রেস নাই। কোথাও না পেয়ে তারপর না তিনি আমাদের জানিয়েছেন।'

'তাইলে তো চিন্তার বিষয়। শুনছিলাম, নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করছিলো সে। সেইখানে কিছু হয় নাই তো ? আর এমপি সাবের লগে সম্পর্ক কেমন ?'

'খুবই ভালো। সে ছিল এমপি সাহেবের ডান হাত। তার সবকিছু আরিফুলই দেখত।'

'ওহ। দেখেন, খোঁজখবর নেন। আমিও কোনো খোঁজ জানলে জানামু নে।'

'জি জানাবেন।' যেন অন্যকিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিলেন ওসি সাহেব। ফজলু মিয়া আড়ত থেকে বের হয়ে নিজে হেঁটে গিয়ে ওসি সাহেবকে গাড়িতে তুলে দিল। সঙ্গে কিছু উপহার। পকেটে একটা পেটমোটা খাম। খামটা দিতে দিতে বলল, 'ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ যাইতেছে। চাইর দিক থেইকা নানান বাজে খবর। এইজন্য খাম চিকন। বিষয়টা একটু নজরে রাইখেন।'

ফজলু মিয়া বসে আছে জলচৌকিতে। তার সামনে চায়ের গ্লাস। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। সে চা খাচ্ছে না। আঙুলের ডগায় সরও তুলছে না। তার মুখ থমথমে। রাত প্রায় শেষের দিকে। তাকে শেষরাতে ঘুম থেকে তুলে দুটো দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। দুঃসংবাদ দুটো শোনার পর থেকে সে কোনো কথা বলছে না। হেলালও কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। খলিফা এই ফজলু মিয়াকে আগে কখনো দেখে নি। তার কপালের পাশের একটা শিরা দপদপ করে কাঁপছে। ফজলু মিয়া অনেকক্ষণ পরে বলল, 'পুরা চালানই ধরা পড়ছে ?'

'না মিয়াভাই। তিনটা মালসহ একটা চালান ধরা পড়ছে।'

'কোন দিকের চালান ?'

'সিলেটের তামাবিলের চালান।'

'ওই যে কুমিল্লার তন পাইছিল ? ওইগুলানই তো তামাবিল বর্ডার দিয়া পাস হওনের কথা ছিল ?'

'জি মিয়াভাই।'

'বিষ্ণু না কালী ?'

'শিব।'

'মালসহ যে ধরা পড়ছে অর নাম কী ?'

'বদরুল।'

'হুম।' বলে গম্ভীর হয়ে গেল ফজলু মিয়া। তারপর বলল, 'তামাবিল বাদ দেস না কেন ? যদি ঝামেলাই হয়, তাইলে তামাবিল পয়েন্ট বাদ দে।'

'তাইলে মাল যাইবো কোন দিক দিয়া ?'

'মাছের ট্রলারের লগে খুলনা পাঠাই দে। ওইহান দিয়া হিলি বা বেনাপোল ?'

'ঝামেলা আছে মিয়াভাই।'

'কী ঝামেলা ?'

'আমাগো সব মাছের ট্রলারই এক্সট্রা চেকিং হইতেছে। পুলিশও কোনো হেল্প করতেছে না। আর এলাকায়ও প্রায় প্রত্যেকদিনই পুলিশ আসে। সবখানে খোঁজখবর নিতেছে।' হেলাল আড়চোখে একবার খলিফার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আর আমাগো ভেতর থেইকাও মনে হয় কোনো খোঁজখবর বাইরে যায়। নাইলে এত কথা ছড়াইলো কেমনে ?'

'আরিফুলের ঘটনা নিয়া কথা হইতেছে ?'

'জে মিয়াভাই।'

হেলাল চুপ করে রইল। ফজলু মিয়া বলল, 'ঘরের ইন্দুরে বান কাটলে কিন্তু সেই ঘর থাহে না। কথাডা মনে রাহিস। এহন ঘর রাখবি না ইন্দুর রাখবি, সেইটাও কি আমার কইতে হইবো ?'

'জে না মিয়াভাই।'

ফজলু মিয়া আবারও চুপ করে রইল। তারপর হেলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর ?'

হেলাল তার উল্টোদিকে ইশারা করতেই দুজন মিলে ধস্তাধস্তি করতে করতে অন্ধকার থেকে এক লোককে নিয়ে এল। লোকটার চেহারা-চুল উস্কোখুস্কো। চোখে প্রবল আতঙ্ক। সে ফজলু মিয়ার সামনে দাঁড়াতে পারছে না। তীব্র ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। ফজলু মিয়া বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই-ই মাল আনতে দিনাজপুর যাইতি ?'

লোকটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি ভুল করছি মিয়াভাই। আমারে মাফ কইরা দেন। আমারে মাফ কইরা দেন।'

ফজলু মিয়ার লুঙ্গির গিঁট ঢিলা হয়ে গেছে। সে দুহাতে লুঙ্গির গিঁট শক্ত করতে করতে বলল, 'তুই আমার মাল চুরি করস, তোর কইলজাডা খুব দেহনের শখ আমার। হেলাল, আমার রাম দাওডা দে। লম্বা রাম দাওডা। আমি তার কইলজাডা কাইট্টা দেখবো, কত বড় কইলজা তার। দে, আমার দাওডা দে।'

লোকটা মাটিতে বসে পড়ল। তার দুপায়ের মাঝখানে প্যান্ট ভিজে গেছে। ভয়ে প্রস্রাব করে দিয়েছে সে। প্রস্রাব গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। হাউমাউ করে কিছু বলার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না। তার সব কথা জড়িয়ে মুখ থেকে অদ্ভুত এক শব্দ বের হচ্ছে। ফজলু মিয়া রামদাখানা হাতে নিয়ে তার আসন থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল আড়তের পেছন দিকে। জায়গাটা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাই করা মাছ রাখার বড় জলাধারটাও সেখানে। মাছের চালান এলে জীবিত মাছগুলো ট্রলার থেকে সরাসরি ছুড়ে ফেলা হয় এই জলাধারে। ফজলু মিয়ার শখ এটা। জীবিত মাছগুলো যখন এই বিশাল জলাধারে সাঁতার কাটে, তখন সেই দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগে তার। মাঝে মাঝে সে নিজেও সেই মাছের সঙ্গে জলাধারের ভেতর নেমে যায়। তারপর ভেসে থাকে দীর্ঘ সময়। মাছের সঙ্গে জলকেলি করে। এ এক অদ্ভুত নেশা তার।

জলাধারের সঙ্গেই কাঠের উঁচু বেদি। বেদির ঠিক নিচেই কুচকুচে কালো জল। বড় মাছ হলে এখানেই কাটা হয়। নিচে ফেলে দেওয়া হয় মাছের উচ্ছিষ্টাংশ। লোকটাকে টেনে নিয়ে আসা হলো ঠিক ওই বেদির ওপর। তারপর তিন-চারজন মিলে তাকে চেপে ধরে শুইয়ে দেওয়া হলো সেখানে। খলিফার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এই ভয়ংকর ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটছে। ফজলু মিয়ার দিকে তাকাতে পারছে না সে। তাকে দেখে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন কোনো অশুভ শক্তি ভর করেছে তার ওপর। রামদা হাতে দাঁড়ানো ফজলু মিয়ার দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে দেয়ালে। খলিফা সেদিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। যেন বিশালাকায় এক ভয়াল দানব। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করবে সে।

বেদির ওপর চেপে রাখা লোকটা হাত-পা ছুড়ে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু চার চারজন লোক তাকে চেপে ধরে আছে। ফজলু মিয়া রামদা হাতে দুই পা এগিয়ে এল। খলিফা এতক্ষণে খেয়াল করল ফজলু মিয়ার হাতে সিগারেট। সে সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছে। সিগারেটের আগুনের আভায় কালচে লাল হয়ে আছে তার ঠোঁট। দেখতে ভয়ংকর লাগছে। খলিফা চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আচমকা আবিষ্কার করল, ওই লোকটা আর সেখানে নেই! বরং তার জায়গায় কাঠের ওই বেদিটার ওপর শুয়ে আছে তার বাবা মজনু মিয়া। চারজন লোক মিলে তাকে চেপে ধরে আছে। মজনু মিয়া চিৎকার করে ছোটার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। প্রচণ্ড আতঙ্কে সে প্রস্রাব করে ফেলেছে। সেই প্রস্রাব টপটপ করে ঝরে পড়ছে কাঠের বেদি থেকে আড়তের বাঁধানো মেঝেতে।

ফজলু মিয়া সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল বুড়িগঙ্গার কুচকুচে কালো জলে। তারপর বাঁ হাত থেকে রামদা'খানা লুফে নিল ডান হাতে। খুবই অভ্যস্ত সহজ ভঙ্গি। যেন সত্যিকারের কোনো দা নয় এটা। যেন একখানা ঠুনকো কাঠের খেলনা। ফজলু মিয়া দা খানা তার মাথার ওপরে তুলল। দেয়ালে তার সেই ভয়াল দানবীয় ছায়াটাও আরও দানবীয় হয়ে উঠল। আর মাত্র মুহূর্তকাল। তারপরই লোকটার মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে শরীর থেকে। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে সবাই। আর ঠিক তখনই খলিফার হঠাৎ কী হলো! সে চিৎকার দিয়ে ছুটে গেল ফজলু মিয়ার কাছে। যে করেই হোক বাবাকে তার বাঁচাতেই হবে। প্রয়োজনে ফজলু মিয়ার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে সে।

খলিফা অবশ্য ফজলু মিয়া পর্যন্ত যেতে পারল না। তার আগেই দুপাশ থেকে দুজন তাকে ধরে ফেলল। খলিফা ছোটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। ফজলু মিয়ার মধ্যে অবশ্য কোনো তাড়াহুড়া দেখা গেল না। বরং তার ঠোঁটের কোনায় যেন এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। সে সেই হাসিটুকু মুখে ঝুলিয়ে রেখেই খলিফার দিকে এগিয়ে এল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আমারে ডরাস ?'

খলিফা ওপর নিচ মাথা নাড়ল। ফজলু মিয়া আবারও জিজ্ঞেস করল, 'আমারে ডরাস ?'

খলিফা আবারও ওপর নিচ মাথা নাড়ল। সে কাঁদছে। কান্নায় তার গলা-চোখ বুজে আসছে। সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ফজলু মিয়া হঠাৎ কষে চড় বসাল তার গালে। খলিফার মনে হলো, সে তার দুই চোখে ধাঁধা দেখছে। চারপাশের সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেছে। যেন অজস্র জোনাকিপোকা সেই অন্ধকারে তার দিকে ছুটে আসতে লাগল। তাকে ঘিরে এলোমেলো উড়তে লাগল।

কতক্ষণ পর চোখ মেলেছে খলিফা জানে না। তবে সে তাকিয়ে দেখল বেদির ওপর লোকটা এখনো বেঁচে আছে। ফজলু মিয়া তাকে খুন করে নি। বরং লোকটা বসে আছে সেখানে। সেও কাঁদছে। তার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, লোকটা মোটেই তার বাবা নয়। কিন্তু বাবা না হলেই কী, খলিফা এখন জানে, তার বাবাকে কে খুন করেছে। ফজলু মিয়ার কথা অনুসারে, সে তার নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখেছে। উত্তরও পেয়ে গেছে। সে এখন নিশ্চিত, ঠিক এখানে এভাবেই তার বাবাকে খুন করেছে ফজলু মিয়া।

ফজলু মিয়ার হাতে রামদা নেই। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খলিফার দিকে। খলিফাও তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করল। এই লোককে আর ভয় পায় না সে। সে তো তার বাবাকে খুন করেই ফেলেছে! ভয় পেয়ে আর কী হবে ? না হয় তাকেও খুন করে ফেলবে। ফজলু মিয়া আবারও বলল, 'কী, আমারে ডরাস ?'

খলিফা ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, 'না।'



নদীর মনে একটা কু-ডাক দিয়ে গেল। বিষয়টি সে নিজ থেকে ভাবতে চায় নি। কিন্তু তার অবচেতন মন সন্দেহ করছিল। এখন মনে হচ্ছে ঘটনা তা-ই ঘটেছে। সজলের ফোন বন্ধ। তাকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন রুনির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেও। সেই রাত, পরদিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো রুনিকে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। পুলিশেও খবর দেওয়া হলো। লাভ হলো না। রুনি কোথাও নেই! বড় রাস্তার দিকে যাওয়ার কথা থাকলেও, সেদিন বিকেলে সে আসলে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল নদীর ধারে। তার জন্মদিনে পাওয়া উপহারগুলোর বেশির ভাগই সে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামে। দারুণ দারুণ সব উপহার। গাঁয়ের বাচ্চারা সেসব জিনিস আগে কখনো দেখে নি। ফলে সেই খেলনা কিংবা পুতুলগুলো ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য হলেও তারা সারাক্ষণ রুনির চারপাশে ঘুরঘুর করত। পুলিশ বাচ্চাগুলোকে ডাকল। তারপর একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করল।

'তোমরা কখন দেখলে যে রুনি নেই ?'

'আমরা দেখি নাই।'

'কেন, সে তোমাদের সাথে ছিল না ?'

'ছিল।'

'তাহলে বলো।'

'বলতে পারব না।'

'কেন বলতে পারবে না ?'

'দেখি নাই এইজন্য বলতে পারব না।'

'তোমাদের সাথে থাকলে দেখবে না কেন ?'

'দেখি নাই, এইজন্য...।'

বাচ্চাদের বেশির ভাগের বক্তব্যই অসংলগ্ন, এলোমেলো। তবে তাদের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল একটু চটপটে। সে বলল, 'আমরা তো তার খেলনা নিয়াই খেলতে ছিলাম। সে কোন ফাঁকে কই গেল, খেয়াল নাই।'

'তার মানে সে তোমাদের সাথে খেলছিল না ?'

'নাহ।'

'তাহলে ?'

'সে একলা একলা উইঠা গেল।'

'উঠে কই গেল ?'

'বড় রাস্তার দিকে।'

'তোমরা তাকে ডাকলে না ?'

'নাহ।'

'কেন ?'

'তার সাথে সবাইর ঝগড়া লাগছিল।'

'ঝগড়া ?'

'হুম।'

'কেন ? ঝগড়া লাগবে কেন ? সে তো খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

বাচ্চাটা এবার আর জবাব দিল না। পুলিশ অফিসার বললেন, 'বলো, বলো। সে তো তার সব খেলনা দিয়েই তোমাদের খেলতে দিল। তাহলে তার সাথে তোমাদের ঝগড়া লাগবে কেন ?'

'উঁহু, সব খেলনা দেয় নাই।'

'সব দেয় নি ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'তার হাতে একখান পুতুল আছিল। সেইটা সে কাউরেই দিতো না। ওই পুতুল নিয়াই ঝগড়া লাগছিল সবাইর সাথে। তহন সবাই গেল ক্ষেইপা। টানাটানি শুরু করল। সে তখন রাগ কইরা পুতুল নিয়া উইঠা গেল।'

'তারপর আর ফিরে আসে নি ?'

'খেয়াল নাই। আমরা সবাই খেলতেছিলাম। তারপর সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ি চইলা আসলাম।'

পুলিশ অফিসার ঘটনা বুঝলেন না। নদীও তখনই তার সন্দেহের বিষয়ে কিছু বলল না। আগে পুরোপুরি ঘটনাটা বুঝতে চায় সে। পুলিশ চলে গেলে বাচ্চাটাকে আবার ডাকল নদী, 'তুমি ঠিক দেখেছিলে রুনি বড় রাস্তার দিকে গেছে ?'

'হুম।'

'ওইখানে আর কেউ ছিল ?'

'বড় রাস্তায় তো অনেকেই থাকে।'

'না মানে রুনিকে কেউ ডাকছিল ?'

বাচ্চাটা বলতে পারল না। তবে সে একটা তথ্য দিল। তখন বড় রাস্তার ঠিক পাশেই একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে বড় রাস্তা বলতে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠের মাঝখান

দিয়ে বয়ে যাওয়া উঁচু সরু এক রাস্তা। এ এলাকায় সচরাচর গাড়ি দেখা যায় না। মূলত ভ্যান-অটোরিকশাই বাহন। ঠিক ওই সময়টায় ওই সাদা গাড়ির কথা শুনে নদী থমকে গেল। তার তখনই মনে হলো ঘটনা ঘটিয়েছে সজল। সে এই বাড়ি চেনে। মামলায় হেরে গিয়ে এমনিতেই তার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। তার ওপর রুনির জন্মদিনের রাতের ঘটনাও নিশ্চয়ই তাকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

মায়ের সামনে বাবাকে অপছন্দ করার ভান ধরলেও ভেতরে ভেতরে যে রুনি তার বাবাকে অসম্ভব পছন্দ করে, নদী তা জানে। সজল এসে যদি তাকে আড়াল আবডাল থেকে ডাকে, রুনি নির্দ্বিধায় চলে যাবে। নদী বিষয়টা নিশ্চিত হতে চায়। কিন্তু সজলকে এখনই কোনো পুলিশি ঝামেলায়ও ফেলতে চায় না সে। ফলে অনেক ভেবেচিন্তেই ফোনটা করল তাকে। কিন্তু সজলের ফোন বন্ধ। বিষয়টা ভালো ঠেকল না নদীর। রুনির জন্মদিনের সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে চলে যাওয়ার আগে সজল বলেছিল, পরদিন ভোরে সে রুনিকে দেখতে আসবে। কিন্তু আসে নি। শুধু যে আসে নি, তাও না। এরপর আর কখনো ফোনও করে নি। অথচ মেয়ের জন্য সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে সে। তাহলে ?

যত দ্রুতসম্ভব ঢাকায় ফিরে এল নদী। সজলের পুরোনো বাসায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে এই বাসা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। বিচলিত নদী রীতিমতো অসহায় বোধ করতে লাগল। তবে আশার ব্যাপার হলো, চলে আসার সময় বাড়িওয়ালার কাছ থেকে সজলের নতুন বাসার ঠিকানা পাওয়া গেল। নদী সেই বাসাও খুঁজে বের করল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সজল সেখানেও নেই!

এবার সত্যিকার অর্থেই ভীত বোধ করতে লাগল নদী।

সজল বসে আছে রমনা থানায়। তার চোখে মুখে হতচকিত ভাব। যেন পুলিশ কেন তাকে থানায় নিয়ে এসেছে, তার কিছুই সে বুঝতে পারছে না। রমনা থানার ওসি মকবুল হোসেন বললেন, 'আপনি হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন কেন ?'

সজল পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমি গা ঢাকা দিব কেন ?'

'গা ঢাকা না দিলে আপনি আপনার বাসা ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন। আপনার ফোন পর্যন্ত বন্ধ। সেই ফোনেরও কোনো হদিস নেই। ট্র্যাক করতে গিয়ে দেখা গেল সেই ফোন দেশেই নেই। বর্ডার পার হয়ে গেছে।'

'আমার ফোন চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি হয়ে গেছে ?'

'হুম।'

'কবে ?'

'বেশ কিছুদিন আগে। আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল। সে ছিল তার মায়ের বাসায়। সেখান থেকে রাতে ফেরার সময়।'

'ওহ! তা বাসা বদলালেন কেন আপনি ?'

'খুব ঝড়বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। ফেরার পর থেকেই প্রচণ্ড শরীর খারাপ হলো। জ্বরে প্রায় অচেতন ছিলাম কদিন।'

'তারপর ? সেই অচেতন অবস্থায়ই বাসা বদলালেন ?'

'বাসা তো বদলাই নি!'

'বাসা না বদলালে বাসায় আপনাকে পাওয়া যায় না কেন ?

'আমার ইউনিভার্সিটির এক বন্ধু আছে হাবিব। ও থাকে শনির আখড়ায়। আমি একটু সুস্থ হতেই ওর বাসায় চলে গিয়েছিলাম। আমার শরীরের অবস্থা ভালো ছিল না। কাছের লোকদের সাথে থাকা দরকার ছিল কয়েকটা দিন। মানে যারা একটু টেককেয়ার করতে পারে। কিন্তু মেসে তো আর সেই সুযোগ নাই।'

'তো সেখানে এতদিন কী করলেন ? তখন তো আপনি সুস্থই ?'

'উঁহু, পুরোপুরি সুস্থ না। বরং ওখানে গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম।'

'এ কদিন আপনি সেখানেই ছিলেন ? সুস্থ বোধ করার পর আর কোথাও যান নি ?'

'না।'

'আপনার মেডিকেল সার্টিফিকেট আছে ?'

'মেডিকেল সার্টিফিকেট কিসের ?'

'এই যে আপনি দিনের পর দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে থাকলেন, অচেতন হয়ে গেলেন, আপনার মেডিকেল সার্টিফিকেট থাকবে না ?'

সজল হাসল। তাকে আসলেও রুগ্ন লাগছে। ক্লান্তও। সে বলল, 'জ্বরের জন্য আবার কেউ ডাক্তার দেখায় ?'

'দেখায় না ?'

'অন্যদের কথা জানি না। আমি তো কখনো দেখাই নি।'

'হুম।' বলে গম্ভীর হয়ে রইলেন মকবুল হোসেন। তারপর বললেন, 'দেখুন সজল সাহেব। আপনি শিক্ষিত, ভদ্রলোক। তার ওপর শিল্পী মানুষ। আপনার মতো মানুষদের সাথে আমরা কখনোই অভদ্র হতে চাই না। কিন্তু আপনারাই যখন এমন আজেবাজে কাজ করেন, তারপর আবার এমন কাঁচা স্ক্রিপ্ট সাজান, বিষয়টা তখন আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।'

সজল মকবুল হোসেনের কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। তাকে আজ ভোরবেলা শনির আখড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও গ্রেপ্তারের কারণ এখনো কিছুই জানানো হয় নি তাকে। তবে তারা এটাও বলেছে যে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয় নি। যিনি তার নামে অভিযোগ করেছেন, তিনি চান না সজল গ্রেপ্তার হোক। তিনি শুধু চাইছেন যে কারণে সজলকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই কারণটা যেন ঠিকঠাকভাবে সমাধান করা হয়।

সজল বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি দয়া করে আমাকে বলবেন, ঘটনা কী ?'

মকবুল হোসেন ঘটনা খুলে বললেন। সজল হতভম্ব গলায় বলল, 'কী বলছেন আপনি ? রুনিকে পাওয়া যাচ্ছে না ? আমার রুনিকে ?'

'জি।'

সজল তড়াক করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার শরীর কাঁপছে। ভুলফ্রির কাছে ঘাম দেখা যাচ্ছে। তার স্নায়ু যে ভয়াবহ উত্তেজিত, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল সে। বিচলিত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি সিওর রুনিকে পাওয়া যাচ্ছে না ?'

'হুম।'

'এই কথা আপনাকে কে বলেছে ?'

'আপনার স্ত্রী।'

'আমার স্ত্রী ? মানে নদী ?'

'হ্, নদী।' চট করে কথাটা বলেই যেন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন পুলিশ অফিসার। খানিক বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'মানে আপনার প্রাক্তন স্ত্রী। ওনাকে তো সবাই চেনেন। ফলে ওনার অনুরোধেই কোনো মামলা নেওয়া হয় নি। তবে আপনাকে খুঁজে বের করেছি আমরা। তা ছাড়া উনিও চান না যে বিষয়টা মামলা, গ্রেপ্তার, কোর্ট পর্যন্ত গড়াক। আপনাদের নিজেদের মধ্যে যদি কোনো ঝামেলা থেকে থাকে তো সেটা আপনারা নিজেরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলুন না! অযথা কেন বিষয়টাকে এত নোংরা করছেন ?'

'মানে নদী আপনার কাছে অভিযোগ করেছে যে আমি রুনিকে কিডন্যাপ করেছি!' সজলের চোখে মুখে তীব্র হতাশা, বিস্ময়।

'ঠিক কিডন্যাপ না। উনি ভাবছেন, হয়তো আপনি রাগ বা ক্ষোভ থেকে কাজটা করেছেন। তাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। যেহেতু রুনির জন্মদিনের রাতে উনি আপনাকে দেখা করতে দেন নি!'

সজলের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না নদী তার সম্পর্কে এরকম কোনো ধারণা পোষণ করতে পারে! সে একরোখা হতে পারে, তার অসংখ্য দোষ থাকতে পারে, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সে চূড়ান্ত ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু এতকিছুর পরও এতটা নীচ সে নয়। এতদিনে অন্তত এটুকু জানার কথা ছিল নদীর। বিষয়টাতে প্রচণ্ড আহত বোধ করছে সজল। সে দাঁড়াতে গিয়েও আবার ধপ করে বসে পড়ল। তারপর মকবুল হোসেনের চোখে চোখ রেখে স্থির কণ্ঠে বলল, 'আমি বাবা হয়ে আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করব ? আমি কি অসুস্থ ? পাগল আমি ? আপনাদের কি মাথা ঠিক আছে ওসি সাহেব ?'

অন্য কেউ হলে হয়তো রেগে যেতেন মকবুল হোসেন। কিন্তু নদীর সাবেক স্বামী বলেই হয়তো তেমন কিছু বললেন না। তবে খানিক কঠিন স্বরেই বললেন, 'শুনুন

সজল সাহেব, আমরা পুলিশের চাকরি করি, এরচেয়েও নোংরা বাজে ঘটনা দেখার অভ্যাস আমাদের আছে। সুতরাং আপনাদের মাথা ঠিক না থাকতে পারে, আমাদের মাথা ঠিকই আছে।'

সজল দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ কেঁদে ফেলল, 'আমার রুনি! রুনিকে ও কই রেখেছে ? আপনি নদীকে ডাকুন। এক্ষুণি এখানে ডাকুন। ও আমার রুনিকে কী করছে আমি জানতে চাই। শী জাস্ট রুইনড মাই লাইফ। আমি ওর নামে মামলা করব। এক্ষুণি মামলা করব। ঘটনা আমার কাছে এখন পরিষ্কার। সে বিয়ে করার জন্য এই নাটক সাজাচ্ছে। তার কি ধারণা তার বিয়েতে আমি ঝামেলা করব ? তার মতো মেয়ের বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করব আমি ? কখনোই না। আপনি তাকে এখানে ডাকুন। আমি আমার রুনিকে ফেরত চাই। তারপর সে যা ইচ্ছে করুক। আই ডোন্ট কেয়ার। আই জাস্ট ওয়ান্ট ব্যাক মাই চাইল্ড...।'

সজল হঠাৎ দুহাতে মকবুল হোসেনের হাত চেপে ধরল। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল সে। মকবুল হোসেন দীর্ঘক্ষণ সজলকে দেখলেন। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ। এমন অসংখ্য কেস তিনি সমাধান করেছেন। মানুষের মুখ দেখে যে তার ভেতরটা চেনা মুশকিল, এটা তার চেয়ে ভালো আর কে জানে! তারপরও তিনি নদীকে ডাকলেন। নদী আড়ালেই ছিল। সে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাকে দেখে সজল ভয়ানক ক্ষেপে গেল। নিজের চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠেই যাচ্ছিল, একজন কনস্টেবল এসে তাকে থামাল। নদী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সজলের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'রুনি কই ?'

'রুনি কই মানে!' সজল তার চেয়ে কঠিন গলায় উত্তর দিল। 'তুমি আমার রুনিকে কী করেছ বলো ? রুনির কিছু হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব নদী।'

নদী মকবুল হোসেনের দিকে তাকাল, 'দেখলেন তো ? এ আমার রুনিকে কী করেছে, কোথাও রেখেছে আপনি বলতে বলুন। এক্ষুণি বলতে বলুন।' শেষের দিকে এসে নদীর গলা ভেঙে পড়ল। সে কাঁদছে। সজল অবশ্য নদীর কান্নাকে গ্রাহ্য করল না। সে চিৎকার করে বলল, 'রুনির কী হয়েছে তুমি আমাকে বলো। রুনির কী করেছ স্পষ্ট করে বলো আমাকে...।'

নদী অকস্মাৎ দিকভ্রান্তের মতো ছুটে এসে সজলের পা জড়িয়ে ধরল। তারপর নিঃস্ব এক মানুষের মতো কাঁদতে লাগল, 'তুমি যা বলবে, তাই হবে সজল। তুমি যা চাইবে তা-ই...। প্রয়োজনে রুনি এখন থেকে তোমার কাছেই থাকবে। তারপরও তুমি বলো রুনি কোথায় ? তাকে তুমি কোথায় রেখেছ ? প্লিজ সজল...।'

ডিভোর্সের পর থেকে সজলকে আবার আপনি করে বলতে শুরু করেছিল নদী। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে যেন সবকিছু ভুলে গেছে। সজল হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। নদী কান্নাজড়ানো কণ্ঠেই বলতে লাগল, 'তুমি শুধু মাঝে মাঝে রুনিকে একটু আমায়

দেখতে দিয়ো! একটু দেখতে দিয়ো ... তাও তুমি বলো রুনি কোথায়। তুমি তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। সজল... ।'

সজল নদীর হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আবারও চিৎকার করতে লাগল, 'নাটক করছ ? আমাকে ফাঁসাতে এখন নাটক করছ তুমি ? সত্যি সত্যি বলো, রুনি কোথায় ? রুনির কিছু হলে আমি তোমাকে ছাড়ব না নদী!'

সজলের গলার স্বর আরও বাড়তেই লাগল। নদী এবার দুহাত জোড় করে সজলের সামনে উঠে দাঁড়াল, 'সজল, আমি আর কখনো কোনোকিছু নিয়ে তোমার সাথে রাগারাগি করব না, মামলা করব না, কোর্টেও যাব না। রুনির সব জন্মদিনেও সে তোমার সাথেই থাকবে। তুমি যা চাইবে, তা-ই হবে। সব তোমার ইচ্ছেমতো হবে। তুমি শুধু আমায় এইটুকু বলো, আমার রুনিকে তুমি কোথায় রেখেছ... ।'

নদী কাঁদছে। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। চোখ টকটকে লাল। সজল কিছু বলতে গিয়েও বলল না। থমকে গেল। কারণ ওসি মকবুল হোসেন তার চেয়ার থেকে উঠে এসেছেন। নদী আর সজলের পুরো কথোপকথনই তিনি এতক্ষণ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মকবুল হোসেন অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি সেই অভিজ্ঞ চোখেই যেন আঁচ করতে পারলেন, এই ঘটনার আড়ালে অন্য কোনো ঘটনা আছে। তিনি নদীকে বললেন, 'নদী, আপনি কি একটু শান্ত হয়ে বসবেন ? আমার মনে হয় বিষয়টা নিয়ে আমাদের ঠান্ডা মাথায় কথা বলা দরকার!'

তা কথা হলোও। মকবুল হোসেন দুজনের সঙ্গেই কথা বললেন। নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে চাইলেন। কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হলো না। বরং খানিক বাদে আবারও তারা পরস্পরকেই দোষারোপ করতে লাগল। অভিযোগ করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত খুবই বিরক্ত হলেন ওসি মকবুল হোসেন। তিনি কোনোভাবেই বোঝাতে পারলেন না যে, এখানে অন্য কোনো ঘটনাও থাকতে পারে। অন্য বড় কোনো ঘটনা।



বেশ কিছুদিন থেকেই ফজলু মিয়ার মেজাজ খারাপ। ফলে তার আশপাশে কেউ ভেড়ে না। মাঝেমধ্যে কেবল হেলালকে দেখা যায়। আজ অবশ্য সঙ্গে খলিফাও আছে। ফজলু মিয়া বলল, 'এই রকম হইলে তো ব্যবসাপাতি চালানো মুশকিল হইয়া যাইবোরে হেলাল।'

'জে মিয়াভাই। অবস্থা তো দেখতাছি বেগতিক।'

'পুলিশ তো পুরা পাগলা কুত্তা হইয়া গেছে!'

'জি মিয়াভাই। এমপি সাব বিষয়টা ভালোভাবে নেয় নাই।'

'হুম।' বলে গম্ভীর হয়ে গেল ফজলু মিয়া। তারপর খানিক নীরব থেকে বলল, 'এই অঞ্চলে এই যে এত ব্যবসা করি, কেউ কইতে পারবো কোনোদিন কাউরে তার ন্যায্য হিস্যা না দিয়া আমি ব্যবসা করছি ? যে যতটুকু সুবিধা দিছে, তারে ততটুকু ফেরত দিছি আমি। আমি ফজলু মিয়া কারও ঋণ বাকি রাখি না। নগদে উসুল করি।'

'তা রাখেন না মিয়াভাই'।

'সে যহন ইলেকশনে খাড়াইলো, কম ট্যাকা পয়সা দিছি ?'

'না মিয়াভাই। আমাগো চাইতে ট্যাকা আর বেশি কে দিছে ?'

'তারপর ভোটও তো কম পায় নাই আমাগো দিক থিকা। তাইলে ? তাইলে সে আমার দিকটা দেখবো না ?'

হেলাল কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'গত কয় বছরে কম যন্ত্রণা তো সে আমারে দেয় নাই! উপকারীর চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার কইরা ছাইড়া দিছে। এখন তার লোকজন যদি আমার ব্যবসায় হাত ঢুকায়, আমার লোকজনের ক্ষতি করে, সেইটা কি আমি ফজলু মিয়া সহ্য করব ? তারে তো আমি খোঁচাই নাই কখনো। সহযোগিতা করছি। তাইলে তার লোক আমারে খোঁচাইতে আইলে সেইটা দেখনের দায়িত্ব তার না ?'

হেলাল কথা বলল না। ফজলু মিয়াও না। একটা থমথমে অস্বস্তিকর নীরবতা। তারা দিনের ঝলমলে আলোয় বসে আছে জটা পাগলার মাজারের পাশের সরু নদীর ধারে। এখান থেকে হাঁটা দূরত্বে মাজার। ফুরফুরে হাওয়ায় নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আসছে। ফজলু মিয়া সিগারেট ধরাল। সিগারেটের গলগলে ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে আছে তার মুখ। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'মাজারের এইবারের বার্ষিক উরসের ব্যবস্থা কমপ্লিট করছস ?'

হেলাল কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'একটু সমস্যা আছে মিয়াভাই।'

'আবার কী সমস্যা ? তুই তো দেহি আইজকাল সমস্যার দোকান খুইল্যা বইছস। কী সমস্যা ক ?'

'প্রথম সমস্যা হইছে টাকার। দশ হাজার মানুষের উরস হইবো। টাকাপয়সা তো কম লাগবো না। আমরা তো আর মাজারে কোনো দানখয়রাত নেই না। উল্টা বছর ভইরা যত পারি দানখয়রাত করি।'

'হুম। আর কী সমস্যা ?'

'এমপি সাবে মনে হয় এইবার উরস করতে দিবো না। এইপারের প্রশাসন দিয়া আটকাইবো। তার মতিগতি ভালো ঠেকতেছে না।'

'হুম।' বলে চুপ করে রইল ফজলু মিয়া। হেলাল কোনো কথা বলল না। তাদের থেকে সামান্য দূরে খলিফা বসা। সে আঙুলে পেঁচিয়ে ঘাস তুলে নিয়ে দাঁতের ডগায় কাটছে। ফজলু মিয়া বলল, 'টাকাপয়সার ব্যবস্থা কী ? চালান তো সব মাঠেই ধরা খাইতেছে।'

'এইটা নিয়াও খুব পেরেশানিতে আছি মিয়াভাই।'

'উরস কিন্তু বন্ধ করন যাইবো না।'

'জে না মিয়াভাই। এই মাজার আপনের মা-বাপ। আপনের জীবনমরণ।'

'হুম। মাঠে এহন কী কী চালান আছে ?'

'কিছু মিনি সাইজ মাল আছিল। কিন্তু পুলিশের ঝামেলা বাইরা যাওনের কারণে সেইগুলানও এইখানে সেইখানে ছড়াই ছিটাই আছে। আগের মতো জিনিসপত্র লইয়া যহন তহন মুভ করন যায় না। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওনের লাইগা নানান ফন্দি-ফিকির করতে হয়।'

ফজলু মিয়া আবারও চুপ করে রইল। দীর্ঘক্ষণ। তার চোখে মুখে চিন্তার রেখা। সে গম্ভীর মুখে বলল, 'নারায়ণগঞ্জের কী এক লোক না মাল বর্ডারে পৌঁছানোর কাম করতো ? ওর ধারে ছোট কয়ডা মাল আছিল, ওইগুলানের খবর কী ?'

'বহুদিন তো তার কোনো খোঁজখবর নাই, মিয়াভাই।'

'এমনে হইলে তো হইবো না হেলাল। খবর রাখতে হইবো। তোর তো দেহি বয়স হইয়া যাইতেছে!'

'জে না মিয়াভাই। আমি খবর লইতেছি।'

'আর ইন্দুরডার খবরও নিস।'

বলেই উঠে ফজলু মিয়া। তারপর খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যেতে লাগল মাজারের দিকে। তার পরনে ধবধবে সাদা লুঙ্গি। গায়ে সাদা শার্ট। দুই হাতের থামের মতো আঙুল ভর্তি নানান রঙের পাথরের আংটি। কব্জিতে লোহার বালা। গলায় কালো মোটা দানার

মালা। সূর্যের বিপরীতে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যেতে থাকা মানুষটাকে দেখে আবারও ভয় হতে লাগল খলিফার। সে জানে না এই মানুষটার ভেতর কী আছে! কিন্তু সে এটা জানে, যখন তখন গা ছমছমে এক অনুভূতি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এই মানুষটার আছে। না হলে এই ভরদুপুরে ওই খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা মানুষটার ছায়ামূর্তির মতো অবয়ব দেখেও কেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে তার ?

ফজলু মিয়া চলে যেতেই খলিফা বলল, 'ঘটনা কী হেলাল ভাই ?'

'কী ঘটনা ?'

'মিয়াভাইরে খুব চিন্তিত মনে হইল।'

'চিন্তিত হইবো না ? চাইরদিকে ঝামেলা।'

'কিয়ের ঝামেলা ?'

'সব কথা তোর হুনন লাগতো না। সময় হইলে মিয়াভাই-ই তোরে কইবো।'

'আমারে কইবো কেন ?'

'সেইডা সে-ই জানে। তার মনের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'এই মাজারের ঘটনাডা কী ?'

'কী ঘটনা ?'

'মিয়াভাই এইহানে কয়দিন পরপরই আহে। আরও কীসব জানি করে। কোনো একটা ব্যাপার তো আছেই।'

হেলাল হাসল। রহস্যময় হাসি। কিন্তু জবাব দিল না। খলিফা বলল, 'কথা কন না কেন হেলাল ভাই ?'

হেলাল আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'ওস্তাদের কাছেরতনই শুনিস।'

'না, আপনে কন।' খলিফা নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে হেলালকে ধরল। হেলাল অবশেষে বলল, 'সত্যমিথ্যা জানি না, অনেকেই বলাবলি করে ওস্তাদের নাকি বাল্যবয়সে গুটিবসন্ত রোগ হইছিল। দেহস না, তার মুখভর্তি বড় বড় গুটিবসন্তের দাগ ?'

'হ।'

'তারপর গুটিবসন্তে সে মইরা গেল।'

'মইরা গেল মানে ?'

'মইরা গেল মানে মইরা গেল। দম টম বন্ধ। তহন খুব বন্যা। চাইরদিকে মাঠ-ঘাট, রাস্তা-বাড়ি সব ডুইবা গেছে। তার মায় তহন তারে ভাসাই দিল গাঙ্গে। সে ভাসতে ভাসতে আইলো এই ঘাটে। ফজরের আজানের সময়। এই অঞ্চলে তখন এক পাগল খুব ঘোরাফেরা করতো। তার মাথাভর্তি জটাচুল। এইজন্য সবাই তারে কইতো জটাপাগলা।

সেই জটাপাগলা মিয়াভাইরে গাঙ্গেরতন উঠাইলো। তারপর কইতে লাগলো, এই পোলা তো মরে নাই, এই পোলা তো বাঁইচ্যা আছে। এরে গাঙ্গে ভাসাই দিছে কেডা ?'

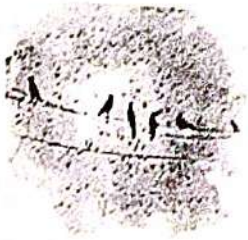
'তারপর মিয়াভাই বাঁইচা উঠল ?'

'বাঁইচা না উঠলে উনি কেডা ?'

খলিফা ঠোঁট উল্টে বলল, 'ঘ্যাট! এইরকম সেইম কাহিনি আমি আমার মায়ের ধারে কত হুনছি! সেইম একই কাহিনি, খালি লোক আলাদা। আপনে এই আজব কাহিনি বিশ্বাস করেন ?'

হেলাল এই প্রশ্নের জবাব দিল না। খলিফা বলল, 'এই কাহিনি আপনেরে কে কইছে ? মিয়াভাই নিজে ?'

হেলাল এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে দূরে। সেখানে পতপত করে পতাকা উড়ছে। লাল তেকোণা পতাকা। পতাকার গায়ে বড় বড় করে লেখা 'জটাপাগলার মাজার'।



নদীদের বাসায় চোর এসেছিল রাতে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো চোর কিছু চুরি করে নি। শায়লা বেগম সকাল থেকেই সবকিছু হিসেব করে দেখেছেন, একটা সুতাও খোয়া যায় নি ঘর থেকে। অথচ ঘরের প্রায় সবকিছুই ওলটপালট করা। চোর যতটা সম্ভব তন্নতন্ন করে ঘরের জিনিসপত্র ঘেঁটেছে। কিন্তু কিছুই নেয় নি সে। বিষয়টা খুবই রহস্যজনক। নদী পুলিশে খবর দিয়েছে। ঘটনা শোনার পর থেকে ওসি মকবুল হোসেনকে খুব চিন্তিত লাগছে।

তিনি এক এক করে নদীদের প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞেস করলেন, কারও কিছু চুরি গিয়েছে কি না। সবাই একযোগে বলল, না। তাদের কারোই কিছু খোয়া যায় নি। এই বিষয়ে তারা নিশ্চিত। বিষয়টা মকবুল হোসেনকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। তিনি পরদিন আবারও থানায় ডাকলেন নদীকে। সঙ্গে সজলকেও। তবে সজলের আসতে সামান্য দেরি হলো। মকবুল হোসেন ততক্ষণে নদীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করছেন, 'বিষয়টা আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে না ? বাড়িতে চোর এল। সব জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে রেখে গেল। অথচ কিছুই নিল না। একটা সুতোও না!'

নদী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'ঠেকুক অদ্ভুত। আমার কিছু যায় আসে না। বাড়ির সবকিছু নিয়ে গেলেও না। আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই।'

মকবুল হোসেন বললেন, 'যদি এমন হয় যে এই চোরের ঘটনার সাথে আপনার মেয়ের ঘটনারও কোনো সম্পর্ক আছে!'

'এই ঘটনার সাথে আমার মেয়ের কী সম্পর্ক ? রুনিকে পাওয়া যাচ্ছে না মানিকগঞ্জ থেকে। আর এটা ঘটেছে ঢাকায় আমার বাসায়।'

'হুম, কিন্তু বিষয়টা অস্বাভাবিক না ? চোর এল অথচ কিছুই চুরি করল না!'

'চোর মনে হয় বেশিক্ষণ সুযোগ পায় নি। মা এশার নামাজ না পড়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। তো সেই নামাজ পড়তে উঠতেই দেখেন কেউ একজন ঘরে। সাথে সাথেই চিৎকার করে মা। এইজন্যই চোর হয়তো খুব একটা সময় পায় নি।'

'কিন্তু যতটুকু সময় সে পেয়েছিল, ওই সময়টুকুতে কিন্তু নেওয়ার মতো দামি অনেক কিছুই ছিল ঘরে, ছিল না ?'

'তা ছিল।' নদী চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

'তাহলে ?'

নদী ভাবল। কিন্তু যতসই কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। মকবুল হোসেন বললেন, 'আপনার কথাই হয়তো ঠিক, চোর পর্যাপ্ত সময় পায় নি। তার আগেই আপনার মা জেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টা তো এমনও হতে পারে যে সে যেই জিনিসটি চুরি করতে এসেছিল ঠিক সেই জিনিসটি খুঁজে পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় সে পায় নি ?'

নদী এবার ভ্রু কুঁচকে তাকাল, 'কী এমন জিনিস আছে আমাদের ঘরে যে চোর কেবল সেটা নিতেই আসবে ? বিদেশে শুনেছি দামি পেইন্টিং চুরি হয়। ইন্ডিয়াতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘরে অমন অ্যান্টিক কিছু নেই যে চোর কেবল সেটা চুরি করতেই আসবে!'

মকবুল হোসেন বললেন, 'এক মিনিট। রুনি ঠিক কীভাবে উধাও হয়েছিল, আমাকে একটু ডিটেলস বলবেন প্লিজ ?'

নদী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই চলে এল সজল। মকবুল হোসেন ইশারায় তাকে নদীর পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। নদী বলল, 'বাড়ির বাইরে বাচ্চাদের সাথে খেলছিল রুনি। হঠাৎ ঝগড়া লেগে গেল তাদের সাথে। তারপর উঠে চলে গেল সে।'

'বাচ্চারা কেউ ওর সাথে গেল না ?'

'নাহ।'

'কেউ খেয়ালও করল না ও কোথায় গেল ?'

সজল মাঝখান থেকে ফোঁড়ন কাটল, 'মা-ই যদি খেয়াল না রাখে, তো অন্যদের খেয়াল রাখার কী দায় পড়েছে ?'

নদী কিছু বলতে গিয়েও মকবুল হোসেনের ইশারায় থেমে গেল। সজলকে আর প্রত্যুত্তর করল না সে। আবার ঘটনা বলতে শুরু করল, 'আসলে হয়েছে কী, তার কদিন আগেই রুনির বার্থডে গেল। অনেক খেলনা টেলনা গিফট পেয়েছিল সে। সেগুলো সাথে নিয়েই গ্রামে গিয়েছিল। তো গ্রামের বাচ্চারা তো কখনো এগুলো দেখে নি। ফলে সারাক্ষণ রুনির চারপাশে ঘুরঘুর করত তারা। ওই খেলনা নিয়েই তো তাদের সাথে ঝগড়া লেগে গেল রুনির। সে ওদের সব খেলনা নিয়েই খেলতে দিবে, কিন্তু তার বাবা যে পুতুলটা তাকে দিয়েছিল, ওটা সে কাউকেই দিবে না।' বলেই আড়চোখে একবার সজলকে দেখে নিল নদী। তারপর আবার বলল, 'সেই পুতুল নিয়েই ঝগড়া। সবাই তার হাত থেকে পুতুলটা জোর করে নেওয়ার জন্য খুব টানা-হ্যাঁচড়া করছিল। আর তখন রাগ করে পুতুলটা হাতে নিয়ে উঠে চলে গেল সে।'

'পুতুল ?' কপাল কোঁচকালেন অফিসার।

'হুম।' বলে আবারও সজলের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল নদী। তারপর বলল, 'এমন আহামরি কিছু তো আর না! কিসের পুতুল কে জানে ? ওইটুকু একরত্তি এক পুতুল কিন্তু ওজনে খুব ভারী। তুলতেও কষ্ট হতো তার। কিন্তু ওই যে, বাবা দিয়েছে বলে ওটাকেই সে সারাক্ষণ নিজের কাছে আগলে রাখত।'

সজল যেন আচমকা সতর্ক হয়ে উঠল, 'তুমি সিওর, ওই পুতুল তখন রুনির কাছে ছিল ?'

'হুম। বাচ্চাগুলো তো তাই বলেছিল।' বলে সজলের দিকে তাকাল নদী, 'কেন ?'

সজল এবার আর কথা বলল না। তাকে খুব চিন্তিত, বিচলিত লাগছে। মকবুল হোসেন বললেন, 'কোনো সমস্যা সজল সাহেব ?'

সজল মকবুল হোসেনের প্রশ্নের উত্তর দিল না। তবে সে নদীকে জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা পুতুল কই ?'

'আরেকটা পুতুল ? কিসের ?' নদী অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল।

'রুনির জন্মদিনের সেই রাতে আমি দুটো পুতুল দিয়ে এসেছিলাম। দুটো প্যাকেটে দুটো পুতুল...!'

'দুটো ?' ভ্রু কুঁচকে বলল নদী। 'আমি জানি না। মা হয়তো বলতে পারবে। আমি ওসব ছুঁয়েও দেখি নি।'

'উনাকে এখনই ফোন করো। জিজ্ঞেস করো অন্য পুতুলটা কোথায় ?' বলে থামল সজল। সে ঘামছে। টেবিল থেকে জগটা নিয়ে গ্লাসে পানি ঢালল সে। তারপর ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। পানি খাওয়া শেষে গ্লাসটা আবার রেখে দিল টেবিলেই। তারপর চাপা, উত্তেজিত গলায় বলল সে, 'আমার মনে হয় আমরা কোনো বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি নদী!'

নদী কম্পিত হাতে ব্যাগ থেকে ফোন বের করতে করতে বলল, 'বড় কী ঝামেলা ? কী করেছ তুমি ?' তার চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব। সজলের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে মাকে ফোন করল। শায়লা বেগম জানালেন দুটো প্যাকেটই তিনি গ্রামে যাওয়ার সময় গাড়িতে তুলেছিলেন। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আরেকটি প্যাকেট আর খুঁজে পান নি। হতে পারে সেটা ভুলে গাড়িতেই রয়ে গিয়েছিল। শুনে মকবুল হোসেন বললেন, 'গাড়িতে খুঁজে দেখেছেন ? প্যাকেটটা গাড়িতে নেই ?'

নদী অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'ওটা রেন্ট-এ-কারের গাড়ি ছিল। আমরা গ্রামে গিয়েই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঢাকায় ফেরার সময়ে আবার অন্য ভাড়া গাড়িতে এসেছি আমরা।'

সজল যেন কিছুই শুনছে না। সে দুহাতে মাথা চেপে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মকবুল হোসেন এবার তার দিকে ফিরলেন। তারপর বললেন, 'পুতুলের ঘটনা কী সজল সাহেব ?'

সজল খানিক চুপ থেকে ভাঙা গলায় বলল, 'আমি একটা বড় ভুল করে ফেলেছি ওসি সাহেব। বড় ভুল।'

'কী ভুল ?'

'আমার ব্যবসা খুব খারাপ যাচ্ছিল। এর মধ্যে এক সন্ধ্যাবেলা শশধর ভৌমিক নামের এক লোক এল আমার কাছে। সে কিছু মূর্তি কিনে নিল। সাথে আরও কিছু অর্ডারও করে গেল।'

'তারপর ?'

'ওনার সাথে আমার কিছু বিজনেস ডিলও হলো। আমি নিয়মিত উনাকে নানারকম শোপিস সাইজের মূর্তি বানিয়ে দিব, উনি সেগুলো বিক্রি করবেন নারায়ণগঞ্জ নিয়ে। ওখানে ওনার দোকান আছে। তো একদিন গভীর রাতে উনি খুব বিধ্বস্ত অবস্থায় আমার মেসে এলেন। তারপর অনেকগুলো ব্যাগ দিয়ে গেলেন আমার কাছে। বললেন, ওই ব্যাগগুলো যেন আমি খুব যত্ন করে রাখি। ওগুলোতে কিছু রেপ্লিকা আছে। ক্লায়েন্ট অর্ডার কনফার্ম করলে আমাকে ঠিক ওরকম করেই বানাতে হবে।'

'কী ছিল ভেতরে ?'

'আমি তো খুলে দেখি নি কী ছিল! তা ছাড়া উনি আমাকে তখন দেখতেও বলেন নি। বলেছিলেন আগে ক্লায়েন্টের সাথে আমাকে বসতে হবে। তারপর যদি তারা অর্ডার কনফার্ম করেন, তখন বানানোর বিষয়ে, খরচাদির বিষয়ে আলাপ হবে।'

'সেখানে কী এই পুতুলগুলোই ছিল ?'

সজল ঢোক গিয়ে বলল, 'বলছি। আসলে আমার হাতে তখন কোনো টাকাপয়সা ছিল না। এদিকে রুনির অভিভাবকত্ব মামলার রায়ের তারিখও চলে এসেছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে শশধর তো আসবেই। সে এলেই আমার টাকার চিন্তাটা ঘুচবে। কিন্তু শশধর আর এল না। ওই দিনটাই আমার জন্য ভয়ংকর খারাপ গেল। মামলার রায় গেল আমার বিপক্ষে। আর ঠিক ওইদিনই ছিল রুনির বার্থডে। সেটাও ভুলে গিয়েছিলাম আমি, বুঝতেই পারছেন মানসিক অবস্থা।' আবারও থামল সজল। তারপর বলল, 'সবার সামনে নদীও খুব খারাপ ব্যবহার করল আমার সাথে। সবকিছু মিলিয়ে খুবই খারাপ একটা দিন। তারমধ্যে শরীরটাও ভালো ছিল না। জ্বরজ্বর লাগছিল। সাথে আরও কিছু বিষয় মিলিয়ে পুরোপুরি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। সময় যত বাড়ছিল, ততই অস্থির লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ইশ মেয়েটার জন্মদিন, অথচ কিছুই করতে পারব না আমি ?'

'আর তখনই শশধরের রেখে যাওয়া ব্যাগ থেকে পুতুল দুটি নিলেন আপনি ?'

'নাহ, তখনই না। বিকেলের দিকে বের হলাম। পকেটে অল্প যে কটা টাকা ছিল, তা দিয়ে ছোটখাটো দুটো গিফট কিনলাম রুনির জন্য। তারপর আবার বাসায় ফিরে গেলাম। কারণ সেদিন আকাশে খুব মেঘ ছিল। বৃষ্টিবাদলাও হচ্ছিল। ভাবছিলাম বৃষ্টি থামলেই বের হব। কিন্তু বৃষ্টি তো আর থামলই না। বরং উল্টো ঝড় শুরু হলো। ইলেক্ট্রিসিটিও চলে গেল। রাত এগারোটা নাগাদ বুঝতে পারলাম বৃষ্টি আর থামবে না। যেতে হলে ওই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই যেতে হবে আমাকে। তখন সেই রাতে ওই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেলাম।'

'তারপর ?'

'আমার তখন মাথা কাজ করছিল না। শরীর প্রচণ্ড খারাপ। এদিকে নদী গেটও খুলছে না। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। আমার মানসিক অবস্থা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি প্যাকেট দুটা দারোয়ানের কাছে রেখে চলে আসি। নীতু সম্ভবত নিচে এসে নিয়ে যায়।

ঠিক মনে নেই। ভয়ানক খারাপ অবস্থা ছিল আমার! ওই অবস্থায় বাসায় ফিরে বুঝতে পারি, একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। রুনির জন্য যে গিফটের প্যাকেট কিনেছিলাম, সেগুলো আমার টেবিলেই পড়ে আছে। অন্ধকারে ভুল করে আমি শশধরের রেখে যাওয়া প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। রাতে গা কাঁপিয়ে জ্বর এল। টানা তিন দিন তিন রাত জ্বরে প্রায় অচেতন হয়ে ছিলাম আমি। নদীদের বাসা থেকে ফেরার পথে ফোনটাও ছিনতাই হয়ে গিয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে খুবই বাজে অবস্থা।'

'তার মানে, আপনি সন্দেহ করছেন যে ওই পুতুলের জন্যই শশধর রুনিকে কিডন্যাপ করেছে ?'

'আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এ ছাড়া আর কী হতে পারে ? আর কোনো কারণ তো আমি খুঁজে পাই না। তা ছাড়া, রুনি যখন উধাও হয়, তখন তার হাতে ওই দুটো পুতুলের একটা ছিল। আর আরেকটার খোঁজেই সম্ভবত নদীদের বাসায় চোর এসেছিল।'

'হুম।' গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন ওসি। 'আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু... শশধর কী করে জানবে যে আপনি তার মূর্তি রুনিকে দিয়েছেন ?'

'এটা সম্ভবত তাকে জাহেদ বলেছে।'

'জাহেদ কে ?'

'আমার মেসের রুমমেট।'

'সে জানল কী করে ?'

'তাকে আমিই বলেছিলাম। আমি তো আর তখন জানতাম না যে ওই প্যাকেটে কী ছিল। দিন তিনেক পরে যখন মেস ছেড়ে আমি আমার বন্ধুর বাসায় চলে যাই, তখন জাহেদের কাছে শশধরের বাকি প্যাকেটগুলো দিয়ে গিয়েছিলাম। আর তাকে বলে গিয়েছিলাম যে, শশধর যদি কোনো কারণে তার মালগুলো ফেরত নিতে আসে, তাহলে জাহেদ যেন তাকে দিয়ে দেয়। আর এটাও যেন বলে দেয় যে, ভুল করে ওখান থেকে দুটো প্যাকেট আমি রুনিকে দিয়ে এসেছি। একটু সুস্থ হয়ে ফিরে এসেই ওগুলো আবার রুনির থেকে ফেরত এনে শশধরকে দিয়ে দিব আমি।'

'ওহফ!' উত্তজিত ভঙ্গিতে বললেন মকবুল হোসেন।

সজল বলল, 'আমার ধারণা শশধর আমার ফোন বন্ধ পেয়েই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল আমি ওগুলো নিয়ে পালিয়েছি বা কিছু। ফলে ও আর দেরি করতে চায় নি। তা ছাড়া আমি চলে আসার পরদিনই ও মেসে গিয়েছিল। গিয়ে আমাকে পেল না। জাহেদের কাছে ঘটনা শুনে নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ও তো আর আমার সাথে কোনো যোগাযোগই করতে পারে নি!'

মকবুল হোসেন খানিক তাকিয়ে রইলেন সজলের দিকে। তারপর ভারী গলায় বললেন, 'আমার ধারণা, নিজের অজান্তেই বড় কোনো মূর্তি পাচারকারী দলের সাথে আপনি জড়িয়ে পড়েছেন সজল সাহেব।'

সজল কথা বলল না। সে নিজেও এখন বিপদটা আঁচ করতে পারছে। মকবুল হোসেন একটা ফাইল টেনে নিতে নিতে বললেন, 'এমন অনেক হয়। এটা পাচারকারীদের একটা কৌশল। ধরেন, এমনিতেই তো দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অনেক মাটির তৈরি পুতুল, শো-পিস, খেলনা, হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি যায়। শত শত পিস। আর এই সুযোগে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য সেগুলোর মধ্যে দামি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাচার করে তারা। আপনি খালি চোখে চট করে আলাদা করতে পারবেন না, কোনটা কষ্টিপাথর বা দামি কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, আর কোনটি মাটির তৈরি সাধারণ কোনো মূর্তি!'

বলে থামলেন অফিসার। ফাইল থেকে এমন কিছু কেসের ছবিও দেখালেন। সজলের নিজেকে খুব অপরাধী আর অসহায় লাগছে। কেন সে-ই বারবার ভুল করে ? ইচ্ছেয় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, ভুল করা যেন অভ্যাস হয়ে গেছে তার। কিংবা এটাই তার নিয়তি।

মকবুল হোসেন বললেন, 'আমি নিশ্চিত, শশধর আপনাকে ওই মূর্তি পাচারের ট্রানজিট হিসেবেই ব্যবহার করছিল। সেদিন রাতে সে সম্ভবত কোনো পুলিশি ঝামেলায় পড়েছিল। আর তখন কোনো উপায়ান্তর না দেখে সে পাচারের জন্য আনা দামি কিছু মূর্তিই আপনার কাছে রেখে গিয়েছিল। কারণ আপনাকে তো কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু ভুলক্রমে সেই মূর্তি আপনি দিয়ে এসেছিলেন আপনার মেয়েকে। আর বিপদ ডেকে আনলেন তার।'

সামান্য থামলেন মকবুল হোসেন। তারপর বললেন, 'এখন কিন্তু বিষয়টা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রুনির কাছে দুটি মূর্তির একটি ছিল বলেই তাকে নিয়ে গিয়েছে ওরা। দুটোই পেয়ে গেলে হয়তো আর নিত না। কারণ অন্য মূর্তিটাও তাদের দরকার। তারা রুনির কাছ থেকে অন্য মূর্তিটার কথাও জানতে চাইবে। অথবা তাকে আটকে রেখে আপনাদের ব্ল্যাকমেইল করতে চাইবে। অ্যান্ড দ্যা থিং ইজ ওয়ার্স্ট নাও।'

সজল আর নদী পরস্পরের দিকে তাকাল। বহু বছর পর তারা যেন একে অন্যের চোখে চোখ রাখল। কিন্তু সেখানে দেখা গেল দুজন অসহায়, ভীত, শঙ্কিত মানুষ!



শশধরের সামনে বসে আছে রুনি। শশধর তাকে কোনো অযত্ন করে নি। বরং যতটা সম্ভব আদর-আপ্যায়ন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রুনি তাতে শান্ত হয় নি। সে ক্রমাগত কাঁদছে, 'আমি মায়ের কাছে যাব। আমাকে মায়ের কাছে রেখে এসো।'

শশধর বলল, 'তোমাকে আমি অবশ্যই মায়ের কাছে রেখে আসব। কিন্তু সেজন্য আগে আমার অন্য পুতুলটা চাই। তুমি আমাকে ঠিকঠাক বলো অন্য পুতুলটা কই ?'

'আমি তো বলেছি আমি জানি না। আর কত বলব ?'

'তোমাকে তোমার বাবা দুটো পুতুলই দেয় নি ?'

'হু।'

'তারপর ?'

'বলেছি তো! নানুমনি আমাকে শুধু একটাই দিয়েছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর কী ?'

'তারপর আরেকটা পুতুলের কী হলো ?'

'আমি জানি না। আমি তো আরেকটা দেখিই নি।'

'কিন্তু তুমিই তো বললে তোমার বাবা দুটো পুতুলই দিয়েছিল!'

'উফ!' রুনির ভারি বিরক্ত লাগছে। এই একই প্রশ্নের উত্তর সে হাজারবার দিয়েছে। অথচ তারপরও লোকটা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে। সে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে। রুনি বলল, 'কিন্তু নানুমনি তো আমাকে একটাই দিয়েছিল!'

'গ্রামে একটিই নিয়ে গিয়েছিলে ?'

'আমি জানি না।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল রুনি। 'নানুমনি সব খেলনা গাড়িতে তুলেছিল। আমি তো দেখি নি।'

'ওখানে গিয়ে তোমাকে একটাই দিয়েছিল ?'

'হুম।'

প্রথম দুদিন খুবই খারাপ লেগেছিল রুনির। এখনো যে লাগছে না তা নয়। তবে লোকটা ভালো। সে তাকে দারুণ দারুণ খেলনা দিচ্ছে। পুতুল দিচ্ছে। খুব ভালো ব্যবহার করছে। তার সঙ্গে খেলেও। রুনি বলে, 'তোমাকে আমি কী বলে ডাকব ?'

'কী বলে ডাকতে চাও ?'

'চোর বলে। তুমি তো চোর। আমাকে চুরি করে এনেছ।' শশধরের এত মায়া হয়! মনে হয়, এখনই গিয়ে রুনিকে ফেরত দিয়ে আসে। কিন্তু সে জানে, ফেরত দিয়ে আসতে খুব কষ্ট হবে তার।

রুনির দিনটা ভালোই কাটে। কেবল রাত হলেই তার কান্না পায়। আগে তার মনে হতো, সে বাবাকে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু মায়ের ভয়ে বলতে পারে না। তবে এখানে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে, সে মাকেই বেশি ভালোবাসে।

শশধর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, অন্য পুতুলটা তোমাদের ঢাকার বাসায়ই রয়ে গেছে ? নাকি সেটা গ্রামেই রেখে এসেছ ?'

'আমি জানি না।'

'আমি তোমার ঢাকার বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে পুতুলটা পাই নি। যদিও ঠিকঠাক খুঁজে দেখার সুযোগ হয় নি।'

'তুমি আমাদের বাসায় গিয়েছিলে!' রুনি খুব অবাক হলো। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'মার সাথে কথা হয়েছে ?'

'উঁহু।'

'কেন ? মায়েরা এখনো ফেরে নি ?'

'ফিরেছে।'

'তাহলে ?'

শশধর হাল ছেড়ে দিল। এর কাছ থেকে আর কোনো তথ্য সে পাবে না। কিন্তু যে করেই হোক আরেকটা পুতুল তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। না হলে ভয়ানক বিপদ। এই বিপদ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সে কি মেয়েটাকে খানিক ভয় দেখাবে ? কিন্তু ভয় দেখিয়েও কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং চিৎকার চেঁচামেচি করবে। বিপদ আরও বাড়বে। সজলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভাবছিল সে। কিন্তু যে কদিনই তাকে অনুসরণ করেছে, তার প্রায় প্রতিদিনই তাকে থানায় যেতে দেখেছে শশধর। এই মুহূর্তে সজলের কাছাকাছি যাওয়া বোকামি। তার নতুন কোনো ফোন নম্বরও তার কাছে নেই। এই লোকের কারণে যে তার এমন ভয়াবহ দুরবস্থা হবে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি শশধর। সে ভেবেছিল পুলিশের এই সতর্ক নজরদারির সময় সজল বরং তার জন্য দারুণ একটা ট্র্যানজিট পয়েন্ট হতে পারে। তা হয়েও ছিল। সজলের অজান্তেই তাকে ব্যবহার করে কিছু ছোটখাটো কাজও সে সেরে ফেলেছিল। কিন্তু সেই রাতে পুলিশের তাড়া থেকে বাঁচার জন্য সজলের কাছে জিনিসগুলো রেখে এসেছিল সে। তখন কে জানত, নিরাপদে রেখে আসা পুতুলগুলো নিয়ে এমন ভয়ানক বিপদে সে পড়বে!

শশধর জানে ওই পুতুল খুঁজে বের করতে না পারলে তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ এক ভয়ানক চোরাবালি। এখানে একবার ঢুকে পড়লে বের হওয়া কঠিন। যে

করেই হোক ওই পুতুল তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা কাজ অবশ্য করা যায়, সেটা হচ্ছে রুনির মুক্তিপণ হিসেবেও পুতুলটা চাওয়া যেতে পারে নদীর কাছে। কিন্তু শশধর মনে মনে শঙ্কিত। এরমধ্যেই অনেক বড় ঝুঁকি সে নিয়ে ফেলেছে। এই যে সে পুতুল হারিয়ে ফেলেছে এবং তার জের ধরে একটা শিশুকে অবধি তুলে এনেছে, এ কথা এখনো দলের আর কেউ জানে না। সে চেয়েছে কাউকে না জানিয়ে একা একাই এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে রুনিকে তুলে নিয়ে এসে বড়সড় ভুল করে ফেলেছে সে। এমনিতেই পুলিশের নানাবিধ তৎপরতায় ইদানীং কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তার ওপর এখন যদি রুনির বিষয়টা বিশাল আকার ধারণ করে, তবে তা পুরো দলের জন্যই নতুন বিপদ বয়ে আনবে। আর এ জন্য পুরোপুরি দায়ী থাকবে সে নিজে। কারণ সে কারও সঙ্গে কোনো ধরনের পরামর্শ ছাড়াই কাজটি করেছে। একটা কাজ অবশ্য করা যায়, রুনিকে চুপচাপ ফিরিয়ে দেওয়া যায়। যদিও তাতে তার সমস্যার সমাধান হয় না। তাকে যে করেই হোক মূর্তিটি খুঁজে পেতেই হবে।

শশধর জানে সজলের কাছে তার ফোন নম্বর কিংবা ঠিকানা কোনোটিই নেই। সুতরাং তাকে খুঁজে পাওয়াও তার পক্ষে সহজ হবে না। কিন্তু যে করেই হোক নদীর সঙ্গে তার যোগাযোগ করতেই হবে। কিন্তু সেটি ফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে করা যাবে না। করতে হবে সরাসরি। পুলিশের জন্য সূত্র থেকে যায় এমন কিছুই সে করতে চায় না। সে চায় না তার ভুলের জন্য পুরো দলই বিপদে পড়ুক।

মকবুল হোসেনের কথা শুনে নদীর হাত-পা কাঁপছে। সজলের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। একই সঙ্গে মায়াও হচ্ছে। যেন তার কারণেই সেই রাতে ওই ভুলটা করেছে সজল। এমনিতেই মামলার রায়টা বিপক্ষে যাওয়ায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিল সে। তার ওপর নদীর আচরণটাও নিতে পারে নি। সবকিছু মিলিয়ে কোনোভাবেই স্বাভাবিক ছিল না তার অবস্থা। তা ছাড়া ওই রাতে যদি সে সজলকে বাড়িতে ঢুকতে দিত, তাহলে হয়তো এই সমস্যাটা হতো না। সজল বাসায় ঢুকে নিশ্চয়ই প্যাকেটটা দেখত। কিংবা সেটি খুলে রুনিকে দেখাতে গেলেই তার ভুলটাও ধরা পড়ে যেত। তখন এই বিপদও আর হতো না। কিন্তু এখন কী করবে তারা ?

সজলও পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। তার ভুলের জন্য রুনি এত বড় বিপদে পড়বে এটা সে মেনে নিতে পারছে না। নিজেকে ভয়াবহ অপরাধী মনে হচ্ছে তার। মকবুল হোসেন বললেন, 'আপনারা ভয় পাবেন না। যতক্ষণ না পর্যন্ত শশধর বাকি মূর্তিটা ফেরত পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রুনির কোনো ক্ষতি সে করবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাকি মূর্তিটা কই ?'

'ওই রেন্ট-এ-কারের গাড়িটাতে তো খোঁজ নেওয়া যায়।' নদী বলল।

'তা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রেন্ট-এ-কারের গাড়ি তো আর গ্যারেজে বসে থাকে না। সেগুলো প্রতিদিনই এখানে সেখানে যায়। একেকদিন একেক ড্রাইভার চালায়।

সমান ধরনের প্যাসেঞ্জার ওঠে-নামে। এমনও তো হতে পারে যে আপনাদের মানিকগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার পথে অন্য কোনো যাত্রী নিয়ে এসেছে ড্রাইভার ?'

'হুম।' চিন্তিত মুখে বলল নদী।

'বিষয়টা কোনোভাবেই সহজ নয়। তারপরও আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করব।'

মকবুল হোসেন সজল আর নদীর দিকে তাকালেন। তাদের দুজনের হাতই টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা। সেই হাত দুজোড়া কাঁপছে। পাশাপাশি বসা মানুষ দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য। তিনি কী মনে করে হঠাৎ দুহাতে দুজনের হাত ছুঁয়ে দিলেন। তারপর শক্ত করে ধরে বললেন, 'আপনারা শান্ত থাকুন। ভয় পাবেন না। আমার বিশ্বাস শশধর রুনির কোনো ক্ষতি করবে না। আর এসময় নিজেদের শক্ত থাকাটা জরুরি। আমরা এসময় একে অন্যকে দোষারোপ করব না, অভিযোগ করব না। বরং সাহস জোগাব। আর আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।'

নদী আর সজল বহুকাল পর পাশাপাশি চুপচাপ বসে থেকেও যেন পরস্পরকে স্পর্শ করে যেতে লাগল। যেন উপলব্ধি করতে পারল তাদের অনুভূতিগুলো কোথাও না কোথাও এক ও অভিন্ন। প্রবল ঘৃণার আড়ালেও কোথায় যেন তারা পরস্পরের জন্য লুকিয়ে রেখেছে খানিক মায়া। খানিক ছায়া। সেই ছায়া আর মায়াটুকু হয়তো তাদের আগলে রাখতে পারত। কিন্তু তারা তা সরিয়ে দিয়েছে দূরে। ফলে খরতাপ দহনের দিনে তাদের এখন হেঁটে যেতে হচ্ছে ছায়াহীন দীর্ঘ মরুপথ।

থানা থেকে বেরিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল বাইরের খোলা চত্বরে। মেঘলা আকাশ। খানিক হাওয়া। সেই হাওয়ায় মাথার ওপরের নাম-না-জানা গাছটার হলুদ পাতা উড়ে এসে পড়ল তাদের পায়ের কাছে। দুজনই সেই পাতার দিকে দীর্ঘসময় অকারণ তাকিয়ে রইল। তাদের কি পরস্পরকে খুব জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে ? তারপর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব ? বলতে ইচ্ছে করছে, রুনির এই বিপদের জন্য আমরা দুজনই সমান দায়ী ? তাকে আমরা ঠিকঠাক আগলে রাখতে পারি নি ? কাউকে আগলে রাখতে হলে হাতগুলো সব এক হতে হয়। কিন্তু আমরা দুজন তো বিচ্ছিন্ন মানুষ। দুজন বিচ্ছিন্ন বিপন্ন মানুষ কী করে অন্য একজনকে আগলে রাখবে ?

তবে তারা কেউ কিছু বলল না। থানার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা সিএনজি। নদী ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে সেই সিএনজিতে উঠল। সজল অবশ্য কোথাও গেল না। সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। তার খুব ইচ্ছে করছিল নদীর সঙ্গে ওই সিএনজিতে গিয়ে উঠতে। তার পাশে গিয়ে বসতে। তারপর হাতের মুঠোয় হাতটা নিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে। কিন্তু তার কিছুই করা হলো না সজলের। সে এলোমেলো পায়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল।

সিএনজিটা হঠাৎ শক্ত ব্রেক কষল। এতক্ষণ খেয়াল করে নি নদী। রুনির চিন্তায় বুঁদ হয়ে ছিল সে। কিন্তু এ তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে ? চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল সে! আশপাশে কোথাও কোনো মানুষ নেই। নির্জন রাস্তায় হুশহাশ গাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পথচারী দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ভাট্টাও নেই। সে চট করে তাকাতেই সিএনজি চালক হাতের ইশারায় তাকে আশ্বস্ত করল, 'ভয় নেই আপা। ভয় পাবেন না।'

'কে আপনি ? কী চান ?' নদী ভয়ার্ত গলায় বলল।

'আমার নাম শশধর আপা। আপনার কন্যা রুনি আমার কাছে আছে। সে ভালো আছে। কিন্তু আপা, আমার মূর্তিটা খুব দরকার। মূর্তিটা পাওয়ামাত্র আমি রুনিকে ছেড়ে দিব।' শশধর শান্ত ও নরম গলায় কথাগুলো বলল। নদী অবশ্য শান্ত থাকতে পারল না। সে হাত জোড় করে কেঁদে ফেলল, 'আমার মেয়েটাকে আপনি আমাকে দিয়ে দেন ভাই। আমি কসম কেটে বলছি, যেভাবেই হোক ওই মূর্তি আমি আপনাকে ফেরত দিবই। আজ হোক, কাল হোক। আমি দিবই। এমনকি পুলিশকেও কিছু জানাব না। আমার মেয়েটাকে আপনি আমাকে ফেরত দেন ভাই। ভাই...। মূর্তিটা আমার কাছে থাকলে আমি আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতাম। কিন্তু ভাই, মূর্তিটা আমার কাছে নাই।'

নদী কাঁদছে। শশধর হঠাৎ ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মূর্তি আপনার কাছে নাই মানে কী ? মূর্তি কই গেছে ?'

'আমার মা ভুল করে রেন্ট-এ-কারের গাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন ভাই, ওটা আমরা খুঁজে বের করবই। যে করেই হোক। খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব ওটা। আপনি আমার মেয়েটাকে ফেরত দেন ভাই। ও ভাই...।'

শশধরের মাথার ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল। মনে হলো সে তার চোখের সামনে নিজের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। ভয়ংকর শাস্তির মৃত্যু। সে বলল, 'কোন রেন্ট-এ-কার ?'

নদী হড়বড় করে কিছু একটা বলল। শশধর আর কথা বলল না। সিএনজির দরজা খুলে নদীকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনল। তারপর হিসহিস করে বলল, 'ওই মূর্তি যদি আমি না পাই... যদি না পাই... আমি যে কী করব...।'

সে তার কথা শেষ করল না। এই রাস্তার ধারে এভাবে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। চট করে সিএনজিতে উঠে বসল সে। হতবিহ্বল নদী সিএনজির নম্বর প্লেটটা মুখস্থ করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, নম্বর প্লেটটা একটা সাদা কাগজ দিয়ে ঢাকা!



হেলাল বলল, 'আপনার লগে এলাকার কমিশনার সাবে দেখা করতে চায়। এমপি সাব নাকি কইছে।'

ফজলু মিয়া আয়েশি ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়েছিল। সে উঠে বসতে বসতে বলল, 'লগে কি পুলিশও থাকবো নি ?'

হেলাল মাথা নিচু করে বলল, 'জে।'

'তাইলে সেইটা না কইয়া খালি কমিশনারের কথা কস ক্যান ?'

হেলাল এই প্রশ্নের জবাব দিল না। ফজলু মিয়া বলল, 'তাগো জন্য মাজারে খানাপিনার ব্যবস্থা কর।'

'তারা তো মাজারে যাইবো না।'

'যাইবো। তুই ব্যবস্থা কর।'

বলে উঠে দাঁড়াল ফজলু মিয়া। তার ঘাড়ের কাছটা কেন যেন শিরশির করছে। এই শিরশিরানি ভালো কোনো লক্ষণ নয়।

মাজারের পেছনে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরে ফজলু মিয়া এসে মাঝেমধ্যে থাকে। সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিশনার আলী আজম বললেন, 'আপনার সাথে এমপি সাহেবের হঠাৎ ঝামেলা কী নিয়ে ?'

ফজলু মিয়া হাসল, 'আমি ঝামেলার লোক না। আমার লগে কারও কোনো ঝামেলা নাই।'

'এমপি সাহেবের খাস লোক ছিল আরিফুল। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বহুদিন।'

'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিছে ? বিজ্ঞাপন দিতে কন।'

'পত্রিকায় কী বিজ্ঞাপন দিবে ?'

ফজলু মিয়া শান্ত গলায় বলল, 'মানুষ হারাই গেলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। মাইকিং করতে হয়। আমার কাছে আসতে হয় না। আমি তো আর পত্রিকার লোক না।'

এতক্ষণে কথা বললেন ওসি মোফাসসেল। তিনি বললেন, 'আপনার নামে কিন্তু কেউ কোনো অভিযোগ করছে না। কিন্তু ধরেন কিছু জিনিস তো মাথায় রাখতে হয়। হয় না ? আপনি আপনার মতো কাজ করেন, কেউ তো ঝামেলা করছে না। কিন্তু এখন...।'

ফজলু মিয়া ওসির কথা শেষ করতে দিল না। তার আগেই তার প্লেটে মাছের বড় মাথাটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'মাছ কেমন হইছে ওসি সাব ?'

'জি ভালো।'

'কম ভালো, না বেশি ভালো ?'

'জি, বেশি ভালো।'

'এত ভালো কেন জানেন ?'

'নদীর মাছ, এইজন্য।'

'নদীর মাছের এত টেস্ট ক্যান জানেন ?'

'ফ্রি চলাচলতি করতে পারে।'

'আরও একটা ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার ?'

'খানাখাদ্য ভালো পায়। নদী হইছে খানাখাদ্যের জায়গা। তো ভালো মাছ খাইতে হইলে নদীরেও তো খাওন দিতে হয়। হয় না ?'

'জি হয়।' বলেই থমকে গেলেন ওসি মোফাসসেল হোসেন। যেন ফজলু মিয়ার কথার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। মোফাসসেল হোসেনের গা শিউরে উঠল। তিনি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ফজলু মিয়া আসলে কী বলতে চেয়েছে! সে আরিফুলকে খুন করে তার লাশ নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেই লাশ পচে এতদিনে মাছের খাদ্য হয়ে গেছে!

মোফাসসেল হোসেনের প্লেটের অর্ধেকজুড়ে বিশাল বড় মাছের মাথা। তিনি সেই মাথার দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে রইলেন। তার হঠাৎ মনে হলো, অত বড় মাথাটা যেন গোল গোল বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাছটার মুখ হা করা। সেই হা করা মুখের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ ধারালো কিছু দাঁত। দাঁতগুলো দেখতে ভয়ংকর! মোফাসসেল হোসেনের আচমকা মনে হলো, মাছটার মুখ থেকে ভক ভক করে পচা মাংসের গন্ধ বের হচ্ছে। সেই গন্ধে তার বমি পেয়ে গেল। তিনি এক হাতে মুখ চেপে ধরে বমি আটকালেন।

ফজলু মিয়া বলল, 'আমার লগে কারও কোনো ঝামেলা নাই। খালি একটা কথা, উল্টাপাল্টা খবর আমার কানে দিয়েন না। ঘাটে একটা পাগলি ঘুরত। ভাত কাপুড় নাই। মাথা ঠিক নাই। সেই পাগলি কেমনে পোয়াতি হয় ? গার্মেন্সের তিনডা মাইয়া হঠাৎ নাই হইয়া গেল। একজনের লাশ পাওয়া গেল ট্যানারির মধ্যে। চাইরজন মিল্যা রেপ করছে। থানার কামডা কী ? ছোট্ট এইটুক এক মাইয়া, বাড়িরতন পলাইয়া আইছে, তারে ভাসতে দেহা গেল বাদামতলী ঘাটে। এইগুলা দেহেন, তাইলে আর আমারে দেহন লাগবো না। মাংসে কি ঝাল বেশি হইছে ?'

'না, ঝাল ঠিক আছে।'

'দই দিব ?' ফজলু মিয়া নিজের হাতে খাবার বেড়ে দিচ্ছে।

'ভাত শেষ হোক।'

'মিষ্টিডাও ভালো। এইহানেই বানায়। টেস্ট কইরা দেহেন।'

'জি দেন।'

'আপনের প্লেট তো খালি কমিশনার সাব।'

'না না, ঠিক আছে।'

'হেলাল ?'

হেলাল এসে দাঁড়াল।

'ওসি সাব আর কমিশনার সাবের উপহারের প্যাকেটগুলা কই ?'

হেলাল দুটো প্যাকেট এনে দিল। ফজলু বলল, 'ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ। আপনারা খুব ঝামেলা করতেছেন। এইজন্য মন ভইরা দিতে পারলাম না। ভবিষ্যতে ভালো হইলে মন ভইরা দিবো। আপনারা আমার আপনা লোক। আপনাগো লগে আমার কোনো হিসাব নাই। আমার আচার ব্যবহারে মনে কষ্ট নিবেন না। একটা বড় ভুল কইরা ফালাইছি। সেই ভুলের জইন্য কয়েক বছর ধইরা মন অস্থির হইয়া আছে। ভুল হইছে এমন এক জিনিস, যার কোনো ক্ষতিপূরণ নাই। প্রায়শ্চিত্ত্য করন যায় না। শাস্তি ভোগ করতেই হয়। আমি সেই শাস্তি ভোগ করতেছি।'

'কী ভুল ?'

'ভুল তো ভুলই। ভুলের কি আর আলাদা চিন-পরিচয় আছে ?'

'কিছু ভুল তো আলাদা ?'

ফজলু এই প্রশ্নের জবাব দিল না। সে বলল, 'আমি আর ভুল করতে চাই না ওসি সাব। আপনাগো কারণে আমার ভুল করন লাগে। আর যাতে ভুল না করন লাগে, সেই ব্যবস্থা কইরেন।'

ওসি মোফাসসেল হোসেন আর কমিশনার আলী আজম কথা বললেন না। তবে তারা যাওয়ার সময় উপহারের ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ফজলু মিয়া তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

ওসি সাহেব কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। তারপর ফজলু মিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার একটু সাবধান হওয়া দরকার।'

ফজলু মিয়া হাসল, 'আমি সাবধানই আছি।'

'না মানে শত্রু তো নানান জায়গায়ই থাকে। আমরা দূরের শত্রু দেখি, কিন্তু কাছের শত্রু কিন্তু দেখি না। কারণ কাছে রাখি বন্ধু। আর বন্ধু শত্রু হলে তাকেও দূরে পাঠিয়ে দেই। এইজন্য ভাবি, শত্রু থাকে দূরে।'

'হুম।'

'আর নৌকা যত বড়ই হোক, ফুটা ছোট থাকলেই হয়! ডুবতে দেরি লাগে না। এইজন্য ফুটা যত ছোটই হোক সময় থাকতে বন্ধ করা দরকার।'



মকবুল হোসেন চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি নম্বর প্লেটটাও দেখেন নি ?'

নদী বলল, 'নম্বর প্লেট সাদা কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল। তবে দেখতে পেলেও মনে হয় না মুখস্থ রাখতে পারতাম, এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

মকবুল হোসেন গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'হুম।' তারপর খানিক সময় নিয়ে বললেন, 'আমি রেন্ট-এ-কারে খোঁজ নিয়েছি। ওরা বলছে ওরকম কোনো প্যাকেট তারা পায় নি। আমার ধারণা ওদের কাছে থাকলে ওরা জানাত। কারণ ওরকম একটা মূর্তি ওদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। এখন সমস্যা হচ্ছে প্যাসেঞ্জার। আমরা চেষ্টা করছি এ কদিনের টোটাল প্যাসেঞ্জার লিস্ট বের করার। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কাজটা কঠিন। আরেকটা কথা...।'

নদী মুখ তুলে তাকাল, 'কী ?'

'আপনি শশধরকে রেন্ট-এ-কারের নাম বলেছিলেন ?'

'জি।'

'হুমমম'। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মকবুল হোসেন। 'বিষয়টা এবার একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে গেল। আপনার কাছে যে মূর্তিটা নেই, এটা জানার পর রুনিকে খানিকটা ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া হলো। তবে আমরা রেন্ট-এ-কারের ওপর নজর রেখেছি। শশধর যদি কোনোভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, উই উইল ক্যাচ হিম। তবে আমার মনে হয় না সে এটা করবে।'

শশধরের ভয়াবহ মেজাজ খারাপ। সে খানিক আগে রুনিকে চড় মেরেছে। এই মেয়েকে এখানে এভাবে পেলেপুষে রাখার আর কোনো মানে হয় না। রাগে তার মাথা দপদপ করছে। একইসঙ্গে ভয়ও হচ্ছে। সে জানে না এই ঘটনা সে কীভাবে সমাধান করবে! তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে রুনির ওপর। সমস্যা হচ্ছে তার চড় খেয়ে রুনি ভয় পাওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়েছে। সে বিস্মিত গলায় বলেছে, 'এই চোর, তুমি আমাকে চড় মারলে কেন ?'

শশধর রুনির কথার জবাব দিল না। সে গম্ভীর মুখে বসে রইল। রুনি বলল, 'তোমার কি মন খারাপ ?'

শশধর জবাব দিল না। রুনি বলল, 'মার মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে আমাকে এভাবে চড় মারত। তখন আমি কী করতাম জানো ?'

শশধর তাকাল। রুনি বলল, 'আমি তখন মাকে টুক করে আদর করে দিতাম। আসো চোর, তোমাকেও আদর করে দেই।'

প্রচণ্ড রাগে কাউকে চড় মারলে সে যদি এমন কথা বলে তখন কী করতে হয় শশধর জানে না। রুনি চুপচাপ খাট থেকে নেমে এসে টুকুস করে তার গালে চুমু খেয়ে বলল, 'এখন তো হাসো! না হাসলে তোমাকে ভল্লুকের মতো লাগে।'

রুনি কথা ভুল বলে নি। শশধরের নিজেরও ধারণা তাকে ভল্লুকের মতো লাগছে। এমনিতেই তার বেঢপ শরীর। তার ওপর গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণবর্ণ শরীর নিয়ে সে দিনের পর দিন বাইরে ঘোরাঘুরি করেছে। খাওয়া কিংবা গোসল করার সময় পর্যন্ত পায় নি। তাকে ভল্লুকের মতো লাগবে না তো কাকে লাগবে ?

শশধর এখন রুনিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। রুনির গাল ফুলে লাল হয়ে গেছে। তার গালে বরফ লাগানো হয়েছে। বরফ লাগাতে গিয়ে রুনি আইসক্রিমের বায়না ধরেছে। শশধর দোকান থেকে একগাদা আইসক্রিম কিনে নিয়ে এসেছে। বলা তো যায় না আবার কখন কোন সময় সে আইসক্রিম খেতে চায়। তখন ঘরে আইসক্রিম না থাকলে আবার বিপদ।

রুনি বলল, 'তুমি তো আমাকে চুরি করে এনেছ, তাই না চোর ?'

'হু।'

'এরপর তুমি যখন আমাকে বাসায় দিয়ে আসবে, তখন আরও একবার এভাবে চুরি করে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে ?'

'হু।' শশধর মেজাজ খারাপ করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

'কেন চুরি করবে জানো ?'

'উঁহু।'

'কারণ মা আমাকে কখনোই আইসক্রিম খেতে দেয় না। বলে আমার সব দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। আমার যখন আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে হবে, তখন আমি তোমাকে লুকিয়ে ফোন করব, আর তুমি গিয়ে আমাকে চুরি করে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, চোর ?'

শশধর এবার আর কথা বলল না। তার নিজের ওপর খুবই রাগ লাগছে। তার ধারণা, তারচেয়ে অথর্ব লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা নেই। যে কাজ যাকে দিয়ে হবে না, তাকে সেই কাজ করতে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। রুনিকে তুলে আনার কাজটা অবশ্য তাকে কেউ দেয় নি। সে নিজ দায়িত্বে করেছে। কিন্তু এই দায়িত্ব কাঁধ থেকে নামাবে কী করে তা সে জানে না। শশধর রেন্ট-এ-কারে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছে। সে জানে, ওখানে যাওয়া মানে এখন নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। তবে তার আর পায়ে কুড়াল মারা নিয়ে চিন্তা করেও লাভ নেই। কুড়াল ইতিমধ্যেই তার গলার কাছাকাছি চলে এসেছে। তার কাছে মূর্তির খবর জানতে চাওয়া হয়েছে। দুয়েকদিনের মধ্যেই তাকে হিসেবনিকেশ নিয়ে দেখা করতে যেতে হবে। কী নিয়ে দেখা করবে সে!

রাতে শশধরের রাগ আরও বাড়ল। রুনি কাঁদছে। তার জ্বর এসেছে। সে মায়ের কাছে যাবে। বিরক্ত শশধরের ইচ্ছে হচ্ছিল কষিয়ে আরেকটা চড় মারতে। কিন্তু সে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বালতিতে করে পানি নিয়ে এসে রুনির মাথার কাছে বসল। তারপর সারা রাত সে রুনির মাথায় মগ ভরে পানি ঢালতে লাগল।

পরদিন সকাল থেকে ফোন বন্ধ করে দিল শশধর। আজই তার মালিকের সঙ্গে দেখা করার শেষ দিন। মালিকের লোক বারবার ফোন করে তাকে দেখা করতে বলেছে। তার কাছে বকেয়া আছে অনেক হিসেবনিকেশ। কিন্তু কী হিসেব দিবে শশধর ? সে জানে তার শাস্তি অবধারিত। সেই শাস্তি মৃত্যুও হতে পারে। এই শাস্তি থেকে পালানোর কোনো পথ তার জানা নেই। তারচেয়ে যে কটা দিন বাঁচে আনন্দ করে বাঁচতে চায় সে। শশধর রুনির মাথাটা কোলে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার ঘুম ঘুম লাগছে। সারা রাত একফোঁটা ঘুমাতে পারে নি সে। কিন্তু জ্বরগ্রস্ত রুনির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার আর ঘুমাতে ইচ্ছে করল না। জেগে থাকতে ইচ্ছে করল। সে আলতো করে রুনির মাথায় হাত বোলাতে লাগল। রুনি ঘুমের মধ্যেই বলে উঠল, 'এই চোর, মাথায় হাত দিয়ো না তো, ব্যথা লাগে। তোমার হাত ইটের মতো শক্ত।'

শশধর তার নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত টিপে টিপে দেখল, আসলেই তার হাত ইটের মতো শক্ত!

শশধর দাঁড়িয়ে আছে ফজলু মিয়ার সামনে। তার চোখে-মুখে মোটা মার্কার পেন দিয়ে নানারকম দাগ আঁকা। কপালে কালো টিপ। ভ্রু, গাল, ঠোঁটজুড়ে কালো রঙের আঁকিবুকি। নাকের নিচে মোট গোঁফ। থুতনিতে কালো কালির দাড়ি। তাকে এই বেশে ধরে এনেছে খলিফা।

ফজলু মিয়া হতাশ গলায় বলল, 'এই গোপাল ভাঁড়টা কে! এরে কি সার্কাস থেইকা ধইরা আনছোস ?'

খলিফা বলল, 'না মিয়াভাই। এর নামই শশধর। এ-ই আমাগো কাজ করতো।'

ফজলু মিয়া হেলালের দিকে তাকাল, 'এই ছাগলরে দলে নিছে কে ? তুই ?'

'জে।'

'এ এইরকম ভূত সাজছে কেন ? পালানোর জন্য ?'

হেলাল কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'তুই একটা রামছাগল, আর দলে বাইছা বাইছা নিছোসও কতগুলা বকরি ছাগল। এইগুলা নিয়া কাজ করলে তো দলের এই অবস্থাই হইবো। ছাগল দিয়া কি কোনোদিন হাল চাষ করন যায় ? শুনছস কোনোদিন ?'

হোসেন চুপ করে রইল। ফজলু মিয়া বলল, 'এর লগে এইটা কে ?'

খলিফা বলল, 'জানি না মিয়াভাই।'

শশধরের হাত গিছমোড়া করে বাঁধা। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুনি। রুনি পেছন থেকে তার বাঁধা হাতের আঙুল ধরে আছে।

ফজলু মিয়া বলল, 'তোর সাথে এই মেয়ে কে ?'

শশধর বলল, 'আমার মেয়ে।'

'মেয়ের মা কই ?'

'মা নাই।'

'কই গেছে ?'

'মারা গেছে।'

'তোর নাক-মুখে এইগুলা কী ?'

'এইগুলা আমার মেয়ে আঁকছে।'

'কেন ?'

শশধর কিছু বলার আগেই খলিফা বলল, 'আমি গিয়া দেখি সে ঘুমাইতেছে। আর এই মাইয়া মোটা একটা কলম দিয়া তার নাক মুখে ছবি আঁকতেছে।'

ফজলু মিয়ার প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ ছিল। এই লোককে অনেক দিন থেকেই খবর দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই দেখা করতে আসে নি। বরং নানান টালবাহানা করছিল। এমনকি শেষের দিকে সে ফোন পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছিল। তার কাছে কতকগুলো দামি মূর্তি ছিল, সেগুলোরও কোনো হিসেব দিচ্ছে না সে। ফজলু মিয়া ভেবেছিল, শশধর তার সামনে এসে দাঁড়ালে রাগে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। খুন করে ফেলবে সে শশধরকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এখন তার হাসি পাচ্ছে। বহু কষ্টে সে তার হাসি চেপে রেখেছে। এই হাসি নির্ভেজাল আনন্দের। এমন হাসি কখনো হাসে নি ফজলু মিয়া। কিন্তু এদের সামনে হাসা যাবে না। সে গম্ভীর মুখে শশধরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে দাঁড়ানো ছোট্ট মেয়েটা দেখতে পরীর মতো সুন্দর। এই আধো অন্ধকারেও মেয়েটা জোছনার ফুলের মতো ফুটে আছে।

খলিফার বলা দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে ফজলু মিয়া। শশধরের মতো একটা হোদল কুতকুত টাইপের মানুষ তার বিশাল ভুঁড়ি উঁচু করে শুয়ে আছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দিয়ে ঘড়াৎ ঘড়াৎ শব্দ হচ্ছে। বিশাল মুখটা কাতল মাছের মুখের মতো হা হয়ে আছে। সেই হা করা মুখের চারপাশে ভনভন করে উড়ছে রাজ্যের মাছি। ওই অবস্থায় তার পাশে পরীর মতো ফুটফুটে এক মেয়ে বসে আছে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে শশধরের মুখে কলম দিয়ে আঁকিবুকি করছে। মেয়েটার চোখে মুখে আনন্দ। দৃশ্যটা সুন্দর। এমন সুন্দর দৃশ্য কখনো দেখে নি ফজলু মিয়া। এমন একটা দৃশ্য দেখার জন্য তার বুকটা হু হু করতে লাগল।

ফজলু মিয়া নিশ্চিত এই মেয়ে শশধরের না। সে বলল, 'এই মেয়ে কার ?'

শশধর এবার আর কথা বলল না। ফজলু মিয়া রুনির দিকে তাকাল, 'এ তোমার কী হয় ?'

'চোর হয়।'

'চোর হয় মানে ?' ফজলু মিয়া আবার জিজ্ঞেস করল।

'সে আমাকে চুরি করে এনেছে, এইজন্য সে আমার চোর হয়। তাই না ?' তার চোখে মুখে কৌতূহল। তবে সেখানে ভয় আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

'সে তোমারে চুরি করে আনছে ?'

রুনি ওপর নিচ মাথা নাড়ল। ফজলু মিয়া বলল, 'এই চোররে এখন কী করা যায় ? তুমিই বলো।'

'আমাকে কোলে নিতে বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে। চোর আমাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।'

ফজলু মিয়া কথা বলল না। হেলালকে বলল, 'এই মেয়েরে আপাতত ওই স্কুলের দোতলা বিল্ডিংয়ের বাচ্চাগো লগে রাইখা আয়। পরে এর বাপ মায়ের কাছে দিয়াসিস।'

হেলাল রুনিকে নিয়ে চলে গেল। রুনি অবশ্য যেতে চাইছিল না। সে চিৎকার করে হাত-পা ছুড়ছিল। ফজলু মিয়া শশধরকে বলল, 'এই মেয়েরে চুরি করছিলি কেন ?'

শশধর জবাব দিল না। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ফজলু মিয়াকে আর ভয় লাগছে না তার। বরং চিন্তা হচ্ছে রুনির জন্য। মৃত্যুর আগে সে নিজে রুনিকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে চায়। আর তার আগে শেষবারের মতো একবার বুকে চেপে ধরে রাখতে চায় রুনিকে। শশধর নিশ্চিত, সে যখন রুনিকে বুকে চেপে ধরবে, তখন তার চোখ বেয়ে দরদর করে পানি নেমে আসবে। সেই কান্না সে লুকানোর চেষ্টা করবে না। রুনি তখন বলবে, 'এই চোর, তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার কি মন খারাপ ?'

শশধর মুখে কথা না বললেও ওপর নিচ মাথা নাড়বে। রুনি তখন বলবে, 'আচ্ছা চোর, আর কেঁদো না, এদিকে আসো, আমি তোমার মন ভালো করে দেই।' বলেই সে টুকুস করে শশধরের গালে একটা চুমু খাবে। তারপর দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চেপে রাখবে। দৃশ্যটা ভাবতেই সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল শশধর। চোখে মুখে উদ্ভট আঁকিবুকি করা বেঢপ সাইজের একজন মানুষ আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দৃশ্যটা দৃষ্টিনন্দন কিছু না। কিন্তু শশধর সেসবের থোড়াই কেয়ার করে। সে কাঁদছে। মৃত্যুর আগে রুনির ওই স্পর্শটুকু সে পেতে চায়। এই জীবনের কাছে তার এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাওয়ার নেই।

ফজলু মিয়া বলল, 'মালগুলা কী করছোস ?'

শশধর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'হারাই ফেলছি।'

'হারাই ফেলছি মানে কী ?'

'গাঙের পানিতে পইড়া ডুইবা গেছে।'

ফজলু মিয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। তারপর খলিফাকে বলল, 'আমার রামদাও-খান দে।'

খলিফা দা-খানা নিয়ে এল। শশধরকে ধরে দাঁড় করানো হলো জলাধারের পাশে। এখনই কাঠের বেদিটার ওপর শুইয়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্তু ফজলু মিয়ার যেন আর তর সইছিল না। হঠাৎ করেই তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে খুনের নেশা। সে অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে তার হাতের দা-খানা মাথার ওপর তুলে ফেলল। সবাই চমকে উঠলেও শশধর শান্ত। সে কাঁদল না। ভয়ে চিৎকারও করল না। ফজলু মিয়ার দা-খানা বিদ্যুদ্‌বেগে বেগে নেমে এল নিচে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সবাই। কেবল তাকিয়ে রইল খলিফা। সে দেখল, তীব্র বেগে নেমে আসা ফজলু মিয়ার দা-খানা ঘচাৎ শব্দে কেটে ফেলল শশধরের হাত বাঁধা মোটা দড়িখানা!



ওসি মকবুল হোসেনের অপেক্ষায় বসে আছে নদী। তার পাশে সজল। তবে সে খানিক দূরে বসে আছে। মকবুল হোসেন তার রুমে জরুরি একটা মিটিংয়ে আছেন। তাঁর বের হতে দেরি হবে। ফলে বাইরে ছোট একটা ঘরে তারা অপেক্ষা করছে। সেখানে বসার জন্য দুখানা লম্বা বেঞ্চি পাতা। নদী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। রাতের পর রাত টানা জেগে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে গেছে সে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে আসছে। যতবারই দেয়ালে হেলান দেওয়া তার মাথাটা বাঁ দিকে ঢলে পড়ে, ততবারই সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে চোখ মেলে তাকায় নদী। তারপর জেগে সোজা হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না। আবার ঢলে পড়ে ঘুমে। বিষয়টা লক্ষ করেছে সজল। কিন্তু কী করবে কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে। সামান্য যে ক' মিনিট তন্দ্রার মতো চোখ লেগে এসেছিল নদীর, প্রতিবারই ওইটুকু ঘুমের মধ্যেই তীব্র ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছে সে। সজল আড়চোখে বেশ খানিক্ষণ তাকিয়ে রইল। মাত্র কদিনেই কেমন বিবর্ণ আর রোগা হয়ে গেছে নদী। মাথায় রুক্ষ চুল। প্রসাধনীবিহীন মুখ। পরনে আটপৌরে শাড়ি। সজলের হঠাৎ মনে হলো, তাদের সময় চলে যাচ্ছে। জীবন কখন কোন অগোচরে তাদের এক অর্থহীন যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে চুপে চুপে সটকে পড়ছে, তা তারা কেউ টেরই পায় নি। এই তো সেদিন নদীর সঙ্গে তার পরিচয়। প্রবল প্রেম। পরিণয়। কী অদ্ভুত ঘোরলাগা সময়! অথচ মাত্র ক বছরেই এ কোথায় দাঁড়িয়ে তারা ? এই পলাতক জীবনের কাছে কেন তারা এভাবে হেরে যাচ্ছে ?

সজল উঠে দাঁড়াল। তারপর খুব সন্তর্পণে নদীর পাশে গিয়ে বসল। নদী টের পেল কি না বোঝা গেল না। তবে পরেরবার তার মাথাটা ঢলে পড়তেই কাঁধ বাড়িয়ে দিল সে। নদীও তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। যেন অচেতন এক মানুষ সে। যেন কোথায় আছে, কী করছে, কিছুই আর তার ভাবনায় নেই। বসে থাকা নদী আরও খানিক কাত হয়ে ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ টানটান করে পা তুলে দিল বেঞ্চিতে। প্রায় আধশোয়া ভঙ্গিতে হেলে গেল সজলের দিকে। সরে খানিক জায়গা করে দিল সজল। নদী ঢলে পড়ল আরও। প্রবল ঘুমে প্রায় সংজ্ঞাহীন সে। সজল আলগোছে তার মাথাটা কোলের ওপর রাখল। নদী ঘুমাচ্ছে। হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করে শুয়ে আছে বেঞ্চিতে। তার ক্লান্ত, ফ্যাকাশে মুখখানা দেখে সজলের বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে উঠল। এই জীবনে এই মানুষটার কাছে তার ঋণের অন্ত নেই। কিন্তু বিনিময়ে তাকে কী দিয়েছে সে ? নিজের খেয়ালি জীবন আর অর্বাচীন ভাবনায় প্রবল যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই না।

একজীবনের সবটা জুড়ে কেবল যুদ্ধই করে গেছে মানুষটা। সেই যুদ্ধে সে একাই যোদ্ধা। তার হাত ধরবার কেউ নেই। পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। দিন শেষে একটা মানুষ

অবধি নেই যার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারে। তার জন্যই যেন কেবল অন্যের জন্য। কারও প্রিয়জন নয়, যেন কেবল প্রয়োজন হতেই তার জন্ম।

নদী খানিক ঘুরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সজল তার হাতটা আলতো করে নদীর চোখের ওপর মেলে ধরল। যাতে আড়াল করে রাখা যায় আলো থেকে। নদী উঠল তারও বেশ কিছুক্ষণ পর। কাঠের বেঞ্চির ওপর এক কাত হয়ে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকার কারণে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল শরীর। সে অন্য পাশে কাত হতে গিয়ে হঠাৎই যেন সংবিত ফিরে পেল। চমকে চোখ মেলে তাকাল। তার ঠিক মুখের ওপর ওই মুখটা কার ? বার কয়েক চোখের পলক ফেলল নদী। যেন ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে নিতে চাইছে। তারপর বড় বড় চোখে তাকাল। সজল ? সজলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে ? নদীর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বিহ্বল চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিল। এ কোথায় শুয়ে আছে সে ? যেন জায়গা, সময়, পরিস্থিতি কিছুই ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারছে না। তারপর হঠাৎ তড়িঘড়ি করে উঠে পড়তে চাইল। চোখে মুখে রাজ্যের সঙ্কোচ। জড়তা। কিন্তু উঠতে পারল না। সজল শক্ত হাতে তাকে আটকে রাখল। নদী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যেন সজলকে বাধা দেওয়ার শক্তি তার নেই। সজল এক হাতে নদীর এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগল মুখের ওপর থেকে। নদী চকিতে তার চোখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে। সজলের চোখে যেন চোখ রাখতে পারছে না। তবে কেন যেন খুব কান্না পাচ্ছে তার। হয়তো যন্ত্রণার এই জীবনটাকে আর বয়ে নিতে পারছে না সে। হয়তো একা ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। নদী তার চোখ জোড়া সজলের কাছ থেকে আড়াল করে রাখল। সেই চোখে ক্রমশই জমে উঠতে লাগল টলমলে জল। সে চায় না এই জলের কথা সজল জানুক। কিন্তু কী করবে সে ? হাত বাড়িয়ে মুছে ফেলবে ? কিন্তু মুছতে গেলেও তো দেখে ফেলবে সজল! তার চেয়ে এমনই নিশ্চুপ, নিঃসাড় শুয়ে থাকবে সে। এই চোখের জল আর কাউকে দেখাতে চায় না নদী।

থানা থেকে বের হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল তাদের। শশধরের এখনো কোনো খোঁজ বের করতে পারে নি পুলিশ। তবে মকবুল হোসেন বলেছেন, খুব শীঘ্রই তারা শশধরকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। সমস্যা হচ্ছে, গ্রেপ্তারের আগে রুনির অবস্থা জানার কোনো উপায়ই নেই।

থানা চত্বরের বাইরে বেরিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছিল নদী। অকস্মাৎ ডাকল সজল, 'নদী ?'

নদী থমকে দাঁড়াল। তবে কথা বলল না।

সজল বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। একা যেতে পারবে তুমি ?'

'আমার একা চলারই অভ্যেস। আমাকে একাই যেতে হয়।'

কথাটা বুকের কোথায় যেন খুব লাগল সজলের। সে বলল, 'কিন্তু এই সময়টা খুব রিস্কি। সেদিন সিএনজিতে অমন হলো!'

'হলে তো ভালোই। তাতেও যদি আবার রুনির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়।'

সজল কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই নদী প্রায় ভাঙা গলায় বলল, 'আমার রুনিকে আর কখনো ফিরে পাব না সজল ? তুমি যে করেই হোক আমার রুনিকে আমার ফিরিয়ে দাও...।'

নদী কাঁদছে। সজলের খুব ইচ্ছে হচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু আশপাশে অনেক মানুষ। তারা যদি কিছু বলে ? কিংবা নদী ? নদী যদি কিছু বলে ? খানিক আগে না হয় কিছু বলার সুযোগ পায় নি সে। বা চট করে ওভাবে ঘুম ভেঙে তার কর্তব্যও ঠিক করতে পারে নি। কিন্তু এখন তো তা নয়। ওই খোলা আকাশের নিচে, রাস্তার ধারে দুপা এগিয়েও আবার বিব্রত ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল সজল। তার হাত ছোঁয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে নদী। তারপরও নদীকে ছুঁতে পারল না সে। যেন এইটুকু দূরত্বের মাঝখানে বিশাল বিচ্ছিন্নতার অনতিক্রম্য একরোখা এক রেখা টেনে দিয়েছে তারা দুজন।

আকিবের ফোনটা এল পরদিন ভোরে। নীতু ভেবেছিল সে অনেক দিন স্কুলে যায় না, এ কারণেই ফোন করেছে আকিব। কিন্তু তার পক্ষে এই অবস্থায় কোনোভাবেই স্কুলে যাওয়া সম্ভব না। রুনির খোঁজ না পাওয়ার আগ অবধি কোথাও যেতে পারবে না সে। তার ওপর শায়লা বেগম পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। নদী সারাক্ষণ রুনির খোঁজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। আর তাকে থাকতে হয় মায়ের কাছে ঘরে। আকিব ফোন করেই হড়বড় করে বলল, 'তুমি কি কিছু শুনেছ ?'

'কী শুনব ?'

'তার আগে বলো তুমি কই ?'

'বাসায়।'

'সব ঠিক তো ?'

নীতু কপাল কোঁচকাল, 'কী হয়েছে বলো তো ?'

'তোমাদের বাসায় কোনো পুলিশ যায় নি তো ?'

'পুলিশ কেন আমাদের বাসায় আসবে ?'

আকিব বলল, 'তুমি এখনই বাসা থেকে কোথাও চলে যাও। যাতে পুলিশ তোমাকে না পায়।'

'মানে কী ?' নীতু কিছুই বুঝতে পারছে না। 'পুলিশ কেন আমাকে পাবে ? কী করেছি আমি ?'

'পথপুষ্প স্কুলটা আজ সিলগালা করে দিয়েছে পুলিশ। এখন এই স্কুলের সাথে যুক্ত সবাইকে খুঁজছে তারা।'

'হোয়াট ?' যেন আকাশ থেকে পড়ল নীতু। 'কী বলছ তুমি ? কী হয়েছে ?'

'কারা নাকি অভিযোগ করেছে, এখানে স্কুলের আড়ালে চাইল্ড ট্রাফিকিং হয়। স্কুলের আবাসিক ভবনের বাচ্চাদের থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।'

নীতুর মাথা কাজ করছে না। সে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আকিব। কী বলছ এসব ? তুমি পুলিশের সাথে কথা বলো নি ?'

'আমি তো তা জানি না। আজ ওখানে একটা নতুন বাচ্চাও পাওয়া গেছে। যার নাম, পরিচয়, ঠিকানা, কিছুই আমাদের কাছে নিবন্ধন করা নেই। এমনকি সে নিজেই পুলিশকে বলেছে যে, তাকে চুরি করে আনা হয়েছে। তা ছাড়া...।'

'তা ছাড়া কী ?'

'এই স্কুলের যিনি ফান্ডিং করতেন, পুলিশ বলছে উনি নাকি ড্রাগস, মার্ডার, স্মাগলিং এইসবের সঙ্গে যুক্ত। উনার নামে অসংখ্য মামলা আছে থানায়।'

'মাই গুডনেস!' আঁতকে ওঠা গলায় বলল নীতু।

'হুম।'

'তুমি এসব জানতে না ?'

'একদম না। বিশ্বাস করো, কখনোই না। এমনকি আমি তাকে কখনো দেখিই নি।'

নীতু কথা বলল না। ভয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

তার কিছুক্ষণ পরই নদীকে ফোন করলেন ওসি মকবুল হোসেন। তিনি বললেন, 'কেমন আছেন, নদী ?'

'জি, আছি।' নদী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল। তার গলা ভার। চোখ ফোলা। সে সারা রাত ঘুমাতে পারে নি। ওসি বললেন, 'আমি এখন যে কথাটা বলব তা শোনার পর আপনি চিৎকার-চেচামেচি করবেন না। খুব শান্ত হয়ে শুনবেন। খবরটা আপনার জন্য ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে।'

নদীর বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই থম মেরে গেল। রক্ত হিম হয়ে এল। তার মনে হচ্ছে হঠাৎ ঘন হয়ে গেছে বাতাস। দম নিতে পারছে না সে। মকবুল হোসেন বললেন, 'গতকাল সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পথশিশুদের নিয়ে পরিচালিত একটা স্কুলে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের ধারণা সেখানে স্কুলের আড়ালে বড়সড় একটি শিশুপাচার চক্র কাজ করছিল। সেখান থেকে কিছু শিশুকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।'

'ওখানে রুনি আছে ? রুনি ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল নদী।

'একটা মেয়ে বাচ্চাকে সেখানে পাওয়া গেছে। সে তার নাম বলেছে রুনি। কিন্তু আমি এখনো তাকে দেখি নি। তবে আশা করছি এই রুনিই আমাদের রুনি। আমি এখন ওই থানায় যাচ্ছি।'

মকবুল হোসেন আরও কী কী যেন সব বললেন। কিন্তু তার কিছুই মাথায় ঢুকল না নদীর। সে তার হাতের ফোনটা যেন ধরে রাখতে পারছে না। যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে তার শরীর। সে কোনোমতে কেবল বলতে পারল, 'মা, রুনিকে পাওয়া গেছে।'

থানায় মকবুল হোসেনের সামনে বসে আছে নদী আর সজল। তারা বসে আছে গা ঘেঁষাঘেষি করে। কারণ তাদের দুজনের কোলে দুই পা দিয়ে বসে আছে রুনি। সে আয়েশি ভঙ্গিতে পা নাড়াচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব একটা ভীত নয়। বরং অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে এতটা সময় একসঙ্গে কাটাতে পেরে খুবই আনন্দিত সে। সজল তাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। নদী বসে আছে গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে। যেন রুনির প্রতি ইঞ্চি স্পর্শ শুষে নিতে চায় তারা। মকবুল হোসেন বললেন, 'কান্নাকাটি পর্ব বাড়িতে গিয়ে। এখন কিছু লিগ্যাল ইস্যুজ আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে।'

'কী লিগ্যাল ইস্যুজ ?' নদী জানতে চাইল।

মকবুল হোসেন বললেন, 'আপনাকে একটা মামলা করতে হবে।'

'মামলা ?' কপাল কোঁচকাল নদী। 'কার বিরুদ্ধে ?'

'ফজলু মিয়া।'

'কোন ফজলু মিয়া ?'

'গতকাল পথপুষ্প নামের একটি স্কুলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আসে পুলিশের কাছে। অভিযোগ করেন প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতা। সাংসদও তিনি। তিনি জানান, পুরান ঢাকার এক মাছ ব্যবসায়ী ফজলু মিয়া এই স্কুলটি চালায়। কিন্তু সে মূলত এই স্কুলের আড়ালে চাইল্ড ট্র্যাফিকিং করে। তার অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযানটা পরিচালিত হয়। ওখান থেকে বেশ কিছু শিশুকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিন্তু স্কুলের বেশির ভাগ বাচ্চারই বিস্তারিত তথ্য স্কুলে রয়েছে। শুধু রুনিরই নেই। সেহেতু আমরা চাই রুনির অভিভাবক হিসেবে আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।'

নদী ফজলু মিয়ার নাম শুনে চমকে গেছে। একটা প্রচণ্ড ভীতি আঁকড়ে ধরেছে তাকে। তবে ফজলু মিয়া লোকটাকে সে অপছন্দ করে, এটা যেমন সত্যি—তেমনি এটাও সত্যি যে সেই অপছন্দের কোথায় যেন খানিক ফাঁকও রয়ে গেছে। একটা দ্বিধার দোলাচল প্রায়ই তাকে নাড়া দিয়ে যায়। মনে হয়, কোথাও তাকে বুঝতে কোনো ভুল হয় নি তো তার! আজ এই মুহূর্তেও তেমনই হচ্ছে। কারণ, পথপুষ্প স্কুলের নাম সে আগেও শুনেছে। নীতু সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে কাজ করছে। সে প্রায়ই এই স্কুল নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এমনকি তার বিপর্যস্ত, বিবর্ণ জীবনে এই স্কুলটাই যেন খানিক রং নিয়ে এসেছিল। সেখানে এমন কাজ চলছিল, তা যেন কোনোমতেই বিশ্বাস হচ্ছে না নদীর। একটা প্রবল দ্বিধা তার মধ্যে। সে আগে নীতুর সঙ্গে কথা বলে নিতে চায়।

নদী বলল, 'আমি কি আপনার কাছ থেকে একটা দিন সময় পেতে পারি ওসি সাহেব ? আমি ঘটনার কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমি।'

মকবুল হোসেন বিষয়টা বুঝলেন। তা ছাড়া অভিনেত্রী হিসেবে নদীর বিশেষ ভক্ত তিনি। হয়তো এ কারণেই এই সুযোগটা তাকে দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা। আমি আপনাকে কাল ফোন করব।'



নদীকে রাতে ফোন করল রায়হান। রায়হানের ফোন দেখে খুবই অবাক হলো সে। ধরবে না ধরবে না করেও ফোনটা ধরল। রায়হান বলল, 'রুনি ঠিক আছে তো ?'

'হুম।'

'কোনো সমস্যা হয় নি তো ওর ?'

'নাহ।'

'তোমার সাথে খুব জরুরি একটা কথা আছে নদী।'

'কী কথা ?'

'কথাটা আমি তোমাকে সামনাসামনি বলতে চাই। খুব জরুরি।'

'কিন্তু কাল খুব সকালে আমাকে থানায় যেতে হবে। থানা থেকে এসে তারপর কথা বলি ?'

'নাহ। থানায় যাওয়ার আগেই।'

'কেন ?'

'কারণ কথাটা থানায় যাওয়ার আগেই বলতে হবে।'

'কী এমন জরুরি কথা যে সেটা থানায় যাওয়ার আগেই বলতে হবে ?'

'আগে আমি আসি, কথা বলি, তাহলেই বুঝবে। তার আগে রুনিকে বলো, তার সাথে দেখা করতে শশধর নামের একজনও আসবে।'

'শশধর! কোন শশধর ?' চমকে ওঠা গলায় বলল নদী। 'তুমি তাকে চেনো কীভাবে ?'

রায়হান হাসল, 'আমি যেহেতু ফজলু মিয়াকে চিনি, সেহেতু আরও অনেককেই আমার চেনার কথা। তাই না ?'

'ফজলু মিয়া ?' নদী জানে না কেন, তবে মানুষটার নাম শুনলেই বুকটা কেঁপে ওঠে তার। সে বলল, 'রুনিকে কিডন্যাপের পেছনে সত্যি সত্যিই সে ছিল ?'

'কাল আমি আসি, অনেক কিছুই জানতে পারবে। আমি আসার আগে থানায় যেয়ো না প্লিজ।'

নদী আর কথা বলল না। তবে একইসঙ্গে তার তীব্র কৌতূহল আর দুশ্চিন্তা হতে লাগল। শশধর সম্পর্কে নানান গল্প সে রুনির কাছেই শুনেছে। শুনে বিস্মিত হয়েছে। লোকটার প্রতি যে তীব্র ঘৃণা ও রাগ সে পুষে রেখেছিল, সেসব ক্রমশই ফিকে হয়েছে রুনির কাছ থেকে শোনা নানান গল্পে। লোকটাকে খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছেও হচ্ছে

তার। আগামীকাল শশধর বাসায় আসবে, এই খবর রুনিকে জানাতেই সে আনন্দে রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল। উত্তেজনায় রাতভর ঘুমাতেই পারল না।

রায়হান বসে আছে নদীর সামনে। তার মুখ গম্ভীর, থমথমে, দ্বিধাগ্রস্ত। যেন কীভাবে কথা শুরু করবে বুঝতেই পারছে না সে। নদী বলল, 'কী হয়েছে ?'

রায়হান বলতে গিয়েও থমকাল। ঢোক গিলল বার দুয়েক। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, 'বলছি। তবে তার আগে তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে।'

'আমাকে ?' নদী পাল্টা প্রশ্ন করল। 'কেন ?'

'হুম। কারণ, আমি যে কথাগুলো তোমাকে বলব, সেগুলো প্রথমে তোমার বিশ্বাস হবে না। মনে হবে আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি। আর তারপর তুমি ভেঙে পড়বে। ফলে তোমার একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার।'

নদী ভেবেছিল, রুনিকে পেয়ে যাওয়ার পর তার আর কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। কিন্তু রায়হানের কথা শুনে তার সেই ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলো। ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ অনুভব করতে লাগল সে। শশধরের সঙ্গে রায়হানের যোগসূত্রতাও তাকে চিন্তিত করেছে। তবে রুনি খুব খুশি। সে শশধরকে দেখামাত্র তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অবাক ব্যাপার হলো, রুনি জড়িয়ে ধরামাত্র শশধর কাঁদতে শুরু করেছে।

রায়হান আর নদী বসে আছে বারান্দায়। তাদের আশপাশে কেউ নেই। কাউকে আসতেও বারণ করা হয়েছে। নদী বলল, 'বলুন।'

'তোমার বাবার নাম আদিবুর রহমান, তাই না ?'

'হুম।'

'উনি মারা গেছেন ক বছর ?'

'এই ধরুন ছ বছর। কেন বলুন তো ?'

'মারা যাওয়ার আগে উনি বেশ কিছুদিন ঘরে পড়ে ছিলেন। তাই না ?' রায়হান নদীর প্রশ্নের জবাব দিল না।

'হুম। মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন প্রচণ্ড। সেই থেকেই অনেকটা কোমার মতো পরিস্থিতি ছিল তার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওরকমই ছিলেন।'

'উনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন কীভাবে ?'

'অফিসের কাজে বরিশাল যাওয়ার কথা ছিল লঞ্চে। কিন্তু লঞ্চে উঠতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে যান। লোহার পন্টুনের সাথে বাড়ি খেয়ে মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। সেই থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ। মাস ছয়েক হাসতালেও ছিলেন। কিন্তু ডাক্তাররা খুব বেশি কিছু করতে পারেন নি।'

'হুম।' বলে থামল রায়হান। তারপর বলল, 'রাজিয়া নামে তোমাদের বাসায় কোনো কাজের বুয়া কাজ করত ?'

'উমমম...'। যেন খানিক চিন্তা করল সে। তারপর বলল, 'ছিল। কিন্তু সে তো বহু আগের কথা! আট-ন বছর তো হবেই। তখন আমরা অন্য বাসায় ছিলাম। পুরান ঢাকার দিকে।'

'হুম। তার একটা মেয়ে ছিল, আফিয়া নাম। ষোলো-সতেরো বছর বয়স ছিল তখন। চিনতে?'

'উমমম।' ভেবে বলল নদী। 'হুমমম। সম্ভবত। মানে একবার দুবার হয়তো দেখেছিলাম। কেন বলুন তো?'

রায়হান এই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল, 'তোমার বাবা তো গার্মেন্টসে চাকরি করতেন, রাইট?'

'হুম। কিন্তু আপনি এতকিছু জানলেন কী করে? আর এত কিছু জিজ্ঞেসই বা কেন করছেন?'

'বলছি।' বলে থামল রায়হান। তারপর বলল, 'রাজিয়ার অনুরোধে তার মেয়ে আফিয়াকে গার্মেন্টসে চাকরি দিয়েছিলেন তোমার বাবা।'

'বাবা?' ভ্রু কুঁচকে তাকাল নদী। 'কী বলছেন?'

'হুম।'

'কিন্তু আমি তো কখনো শুনি নি!'

'শোনার কথাও না।'

'কেন?'

'কারণ, চাকরি দেওয়ার শর্তই ছিল এমন যে, তোমাদের বাসার কাউকে কিছু বলা যাবে না।'

'মানে কী!' খুবই অবাক হলো নদী। 'আমরা জানলে কী সমস্যা?'

'সমস্যা...।' বলে আবারও থামল রায়হান। কথা শেষ করল না।

নদী বলল, 'বলুন, আমরা জানলে কী সমস্যা?'

'আসলে তোমার বাবা বেছে বেছে টার্গেট করে এমন অল্প বয়সী অনেকে মেয়েকেই গার্মেন্টসে ছোটখাটো চাকরি দিতেন। আর তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা...।'

রায়হান কথা শেষ করার আগেই নদী হাতের ইশারায় তাকে থামাল। তারপর কঠিন গলায় বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি কী বলছেন?'

'হুম। পারছি।'

'কী পারছেন?' প্রচণ্ড রাগে নদীর গ্রীবা ফুলে ফুলে উঠছে।

রায়হান শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কী বলছি, সেটা আমি বুঝতে পারছি। আমি যা বলছি, তা জেনে-শুনে, ভেবে-বুঝে তারপর বলছি।'

'না। বলছেন না।' নদী ঝট করে উঠে দাঁড়াল। 'আপনি একজন মৃত মানুষ সম্পর্কে তার সন্তানের সামনে আজগুবি, জঘন্য নোংরা সব কথা বলছেন। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে আপনার সাথে খুব বাজে কিছু হয়ে যেত। কিন্তু আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলতে চাই যে, আমি আর আপনার সাথে কথা বলতে চাইছি না। এক মুহূর্তও না।'

রায়হান তাড়াহুড়া করল না। নদী বলল, 'আপনি দয়া করে আসুন রায়হান ভাই। আই ক্যান্ট টেক ইউ এনি মোর। প্লিজ।'

রায়হান উঠল না। বসেই রইল। নদী প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে, অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'হি ইজ মাই ফাদার। এবং তিনি এখন জীবিত নেই। ইউ ক্যান্ট...।'

রায়হানও এবার উঠে দাঁড়াল। নদীর মুখোমুখি। তারপর বলল, 'আমি সব জানি নদী। সব।'

'স্টপ ইট। প্লিজ। স্টপ ইট।' নদী এবার চিৎকার করে উঠল।

রায়হান চট করে বলল, 'তোমার মনে আছে ? আজ থেকে ঠিক ছ-সাত বছর আগে, তোমাকে একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়ে শুনিয়েছিলাম আমি ? মনে আছে ? এক ভদ্রলোক লঞ্চের কেবিনে গার্মেন্টসের মেয়েদের নিয়ে রাত কাটায়। মনে আছে তোমার ?'

নদী জবাব না দিলেও ফিরে তাকাল। তার চোখে মুখে দ্বিধা, কৌতূহল, বিষাদ।

'গল্পটা মনে আছে তোমার ?' দ্বিরুক্তি করল রায়হান। 'আমরা একটি গার্মেন্টসে শুটিং করতে গিয়েছিলাম ? কিন্তু তোমার কিছু সমস্যা থাকায় তুমি স্ক্রিপ্টটি পড়তে পারো নি ? পরে আমি তোমাকে গল্পটা পড়ে শোনালাম। মনে নেই ? এক ভদ্রলোক গার্মেন্টসে চাকুরি করতেন বড় পজিশনে। তিনি নানান দরিদ্র মেয়েদের সেখানে চাকরি দিতেন। এবং প্রায়ই নানান বাহানায় তাদের লঞ্চের কেবিনে নিয়ে যেতে চাইতেন। ঢাকা টু বরিশাল বা পটুয়াখালী নানান ট্যুরের কথা বলে ? মনে আছে ?'

'হু।' এবার অস্ফুটে জবাব দিল নদী।

'ওই গল্পটা বানানো কোনো গল্প ছিল না নদী। গল্পের সেই গৃহকর্তা লোকটাই তোমার বাবা। তিনিই গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। ওই জঘন্য নোংরা কাজটিও তিনিই করতেন।' বলে আবারও থামল রায়হান। তারপর নরম গলায় বলল, 'আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। পৃথিবীর সব সন্তানের কাছেই তার বাবা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এটাও তো সত্য, যে মধ্যবয়স্ক লোকটা রেপ করে, সেও কারও না কারও বাবা ? যে বয়স্ক লোকটা বাসের ভিড়ে তার কন্যার সমবয়সী কোনো মেয়ের শরীরে হাত দেয়, সেও তো কারও না কারও বাবা ? তাই না ?'

রায়হান খানিক থামলেও কথা বলল না নদী। তার শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে। রায়হান বলল, 'নিজের কন্যা ছাড়া অন্য সব পিতার কন্যাদের কাছে এমন কিছু বাবাই হয়তো হয়ে ওঠেন জঘন্য কোনো মানুষ, ধর্ষকামী এক পুরুষ!'

নদী বলার জন্য আঁতিপাতি করেও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। যেন সে জানে, রায়হান যা বলছে তা সত্য নয়। তার বাবা মোটেই এমন মানুষ নয়। কিন্তু তারপরও

কোনো এক অব্যাখ্যেয় কারণে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। রায়হান বলল, 'তোমাদের তখনকার সেই কাজের বুয়া রাজিয়ার মেয়ে আফিয়াকে চাকরি দিয়েছিলেন তোমার বাবা। তারপর তার সাথেও ওই একই কাজ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পারেন নি। আর না পারার কারণ ফজলু মিয়া...।'

'ফজলু মিয়া ?' যেন আঁতকে উঠল নদী। 'আপনি কী উদ্ভট এক কল্পকাহিনি বলছেন, বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি।' বলে গম্ভীর মুখেই ম্লান হাসল রায়হান। তারপর বলল, 'ফজলু মিয়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচরের নাম হেলাল। আর হেলালের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল ওই আফিয়ার। আফিয়া রাজি না হওয়ায় একদিন হুট করেই তার মা রাজিয়াকে তোমাদের বাসার কাজ থেকে ছাটাই করে দেন তোমার বাবা। আবার অফিসেও টিকতে দিচ্ছিলেন না তাকে। সারাক্ষণ নানাভাবে উত্যক্ত করতেন। শেষে বাধ্য হয়েই ঘটনাটা হেলালকে জানায় আফিয়া। আর তার কাছ থেকেই জানতে পারেন ফজলু মিয়া। লঞ্চের কেবিনে নিরাপদে দিনের পর দিন তিনি এইসব কাজ করে যাচ্ছেন শুনে বিষয়টা আর নিতে পারেন নি ফজলু মিয়া। তিনি হেলালকে বললেন তোমার বাবার ভয়ংকর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করতে। উনি আসলে লঞ্চের সিঁড়ি থেকে পড়ে যান নি। অন্ধকারে লঞ্চের দোতলার রেলিং থেকে উনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল হেলাল।'

নদী কথা বলছে না। সে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রায়হানের দিকে। তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। রায়হান বলল, 'এই একটা জিনিস কখনো ফজলু মিয়া সহ্য করতে পারেন না, মেয়েদের ওপর এক্সপ্লয়টেশন! কিছুতেই নিতে পারেন না তিনি। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, তোমার বাবার ওই শাস্তির কারণে তোমাদের রীতিমতো পথে বসতে হবে। উপার্জনের আর কোনো উপায় তোমাদের নেই।'

'আর সে কারণেই পরপর আপনার অনেকগুলো নাটকে উনিই আমাকে নিতে বলেছিলেন ?' কথা বলল নদী।

'হুম।' রায়হান থামলেও এবার আর কোনো কথা বলতে পারছিল না নদী। প্রচণ্ড অবিশ্বাসে হাঁসফাঁস লাগছিল তার। প্রবল ঘৃণায় গা রি রি করছিল। রায়হান বলল, 'কারণ ফজলু মিয়া জানতেন, তোমার বাবা অপরাধী ছিলেন, কিন্তু তোমরা নও।'

নদী যেন স্থানুর মতো গেড়ে রইল। অনড়, অবশ, স্থির। তার কান দিয়ে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে নদীর, রাজিয়াকে জোর করে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল বাবা। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছিল। হয়তো মাও কিছু কিছু বিষয় জানতেন বা আঁচ করতে পেরেছিলেন। কারণ বাবা-মায়ের মধ্যে এমন কিছু ঝগড়ার টুকটাক কানেও এসেছিল তার। কিন্তু সঙ্গত কারণেই সেটা সন্তানদের জানতে দেন নি শায়লা বেগম। রায়হান বলল, 'তোমার কি মনে হয়, ফজলু মিয়ার মতো এমন একজন মানুষ পথশিশুদের নিয়ে করা স্কুলের আড়ালে শিশুপাচারের মতো এমন জঘন্য একটি কাজ করবে ? তোমার বিশ্বাস হয় ?'

নদী এবারও কথা বলল না। সে তাকিয়ে আছে রায়হানের দিকে। কিন্তু তার দুচোখে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সবকিছুই অস্পষ্ট, ঝাপসা। রায়হান বলল, 'উনি খুব বিপদে পড়েছেন নদী। বড় বিপদ। খুব প্রভাবশালী একজনের সাথে ভয়ংকর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেছেন। তারা চারপাশ থেকে জাল গুটিয়ে আনছে। এই বিপদে আমি যদি তার এতটুকুও উপকার করতে পারি, তাহলে সারা জীবন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব।' বলে সামান্য থামল রায়হান। তারপর বলল, 'তার মতো মানুষ আর আমি এই জীবনে দেখি নাই নদী। একজনও না। সেদিন সেই রাতের ঘটনায় তুমি তাকে পুরোপুরি ভুল বুঝেছ। উনি একটু অমনই। একটু অদ্ভুত, উদ্ভট, রহস্যময়। হয়তো ভয়ংকরও। কিন্তু উনি...।'

'আমাকে কী করতে হবে ?' রায়হানকে থামিয়ে দিয়ে বলল নদী। তার কণ্ঠ নীরস, প্রাণহীন। সে জানে না কেন সে এই কথাটি বলল!

'তুমি তার বিরুদ্ধে ওই মামলাটা কোরো না, প্লিজ। উনি এসবের কিছুই জানেন না। ওই স্কুলে কোনোদিনও চাইল্ড ট্রাফিকিং হয় নি। কখনো না।'

নদী বিষয়টা নিয়ে গতকালই নীতুর সঙ্গে কথা বলেছে। নীতু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছে, এটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। আকিবও একই কথা বলেছে। তবে তারা নিজেদের নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। নদী অবশ্য বিষয়টার সমাধান করে ফেলেছে। রাতেই সে ফোনে কথা বলেছিল ওসি মকবুল হোসেনের সঙ্গে। তখন তিনিও অবশ্য বলেছিলেন যে, স্কুলের অন্য কারও বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নেই। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তো নয়ই। সুতরাং আকিব বা নীতুরও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সব অভিযোগ মূলত ওই এক ফজলু মিয়ার বিরুদ্ধেই। এবং এই বিষয়ে ওপর মহল থেকে তার ওপর নির্দেশ আছে। যে করেই হোক কঠিন এক জালে আটকে ফেলতে হবে ফজলু মিয়াকে।

রায়হান বলল, 'উনি বিরাট বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছেন। এইটুকুতে হয়তো তেমন কোনো উপকারই হবে না। কিন্তু তারপরও তুমি যদি এই উপকারটুকুও করো, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

রায়হান হাতজোড় করে আছে। তার চোখে পানি। নদীর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, ওরকম ভয়ংকর আচরণের জঘন্যদর্শন একজন মানুষের জন্য রায়হানের মতো শিক্ষিত, ভদ্র, সৃষ্টিশীল একজন মানুষ এমন করে কাঁদতে পারে! এমন করে ভালোবাসতে পারে! অথচ সে ? তার জন্য কি কেউ কখনো এমন করে কাঁদবে ? হাতজোড় করে কারও কাছে করুণা ভিক্ষা চাইবে ? নাকি এই পৃথিবীতে তার জন্য কাঁদার মতো একজন মানুষও নেই ?

নদী কথা বলল না। কথা বলার মতো শক্তি বা সাহস কোনোটাই আর তার নেই।



জটাগাগলার মাজারের উরস হয় নি। না হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে। তবে সেসব কারণ ফজলু মিয়া আর ঘেঁটে দেখতে চায় নি। তার টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ যাচ্ছে। অনেকগুলো চালান ধরা পড়েছে। তা ছাড়া টাকাপয়সার হিসাবনিকাশেও বড় ধরনের কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্কুলের বাচ্চাদের ইস্যুটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত গুরুতর কোনো বিপদে সে পড়ে নি। তবে এর বাইরেও নানাবিধ ঝামেলা যেন একসঙ্গে তাড়া করে আসছে। প্রশাসনিক ঝামেলাও আছে।

ফজলু মিয়ার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেসব অভিযোগের দৃশ্যত কোনো প্রমাণ অবশ্য নেই। তারপরও হঠাৎ করেই যেন চারদিক থেকে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ফজলু মিয়া টের পাচ্ছে, বড় ধরনের সমস্যা শুরু হয়েছে। জটাপাগলার মাজারে যখন সে উরস শুরু করে, তখন তার বয়স ষোলো। এখন ছাপ্পানো। মাঝখানের এই চল্লিশ বছর কখনো উরস বন্ধ হয় নি। এই প্রথম।

ফজলু মিয়ার শরীরটাও খারাপ যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন থেকেই রাতে ঘুমাতে পারছে না সে। শরীরে ভয়ানক জ্বালাপোড়া। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একা একা বসে থাকে। তারপর দীর্ঘক্ষণ সিমেন্টের জলাধারটার ভেতর শরীর ডুবিয়ে মাছের মতো ভাসে। তারপরও মাথা ঝিমঝিম করে। আজও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল ফজলু মিয়ার। সে ঘুম থেকে উঠে দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে রইল। তারপর উঠে সময় নিয়ে গোসল করল। ফজলু মিয়ার ঝাঁঝালো ঘ্রাণ পছন্দ। এইজন্য সে বিশেষ এক ধরনের আঁতর গায়ে মাখে। আজও মাখল। তারপর ধোয়া সাদা ধবধবে জামা-লুঙ্গি পরল।

জামার কলারে, বুকে আঁতর ছেটাল। তারপর অন্ধকারে একা একা বসে রইল। বাইরে নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দে ফজলু মিয়ার আচমকা খুব কান্না পেতে লাগল। তবে সে কাঁদল কি না বোঝা গেল না।

সে হেলালকে ডাকল। হেলাল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর অন্ধকার। ফজলু মিয়া বলল, 'তোর নাম হেলাল ?'

'জে না মিয়াভাই।'

'তোর নাম কী ?'

'নাম জানি না।'

'জানস না কেন ?'

'মনে নাই।' হেলালের গলা কাঁপছে। 'ছোডবেলারতন আপনে মানুষ করছেন। বাপ মায়ের পরিচয় নাই।'

'তোরে কই পাইছিলাম তুই জানস ?'

'জে মিয়াভাই। মিটফোর্ড হাসপাতালের বাইরে।'

'তুই ওসি মোফাসসলের কাছে কী কইছস ?'

'কিছু কই নাই মিয়াভাই।'

'কমিশনার আলী আজমের কাছে ?'

'মিয়াভাই!' হেলালের কণ্ঠ ভেঙে পড়ছে।

'মজনুরে আমি খুন করছি, এই কথা বাইরে সবাইর কাছে কে ছড়াইছে ?'

হেলাল কথা বলল না।

'এমপি সাবের লোক আরিফুলরে আমি খুন করছি, এই কথা এমপি সাবরে কে জানাইছে ?'

'মিয়াভাই!' হেলাল কাঁদছে।

'পথপুষ্প স্কুল নিয়া এই মিথ্যা কথা কে ছড়াইছে ? এমপি সাবরে এই বুদ্ধি কে দিছে ?'

হেলালের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। ফজলু মিয়া বলল, 'তুই নাকি সব সাক্ষী দিবি ? আমি কতগুলা মার্ডার করছি, আরও কী কী করছি ? তুই নাকি সব সাক্ষী দিবি আমার বিরুদ্ধে ? তারপর আমারে ফাঁসিতে ঝুলাবি ?'

হেলাল চুপ।

'এই কাজ তুই কেন করলি ?'

হেলাল কথা বলল না।

'এতগুলান মালের চালান ধরা পড়লো কেমনে ?'

হেলাল কথা বলার চেষ্টা করছে। তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না।

ফজলু মিয়া বলল, 'শশধর যহন কুমিল্লা থেইকা মাল লইয়া আইসা রাইতে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে নামলো, তহন পুলিশ খবর পাইলো কেমনে ?'

হেলাল এবার ফজলু মিয়ার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। ফজলু মিয়া বলল, 'খলিফারে ঠিকঠাকমতো কইছোস যে ওর বাপরে আমি কেমনে খুন করছি ?'

'ওস্তাদ! আমি ভুল করছি। আপনি আমারে মাফ কইরা দেন ওস্তাদ। আপনে আমার মা-বাপ। ও মিয়াভাই। ভাই...।' হেলাল হাউমাউ করে কাঁদছে। যেন হিতাহিত জ্ঞান নেই তার।

ফজলু মিয়া তার মাথার ওপর থেকে ঝোলানো গামছাটা হাতে নিল। তারপর বলল, 'আমি সকালে মাজারে যাব। নৌকা ঠিক করতে ক। সবাইরে রেডি হইতে ক।'

হেলাল যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। ফজলু মিয়া তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সে হাওয়ার বেগে ছুটল। তারপর আবার ফিরে এল। ফজলু মিয়া বলল, 'ভালো কইরা আমার জন্য এক গ্লাস চা বানা।'

হেলাল চা বানিয়ে নিয়ে এল। ফজলু মিয়া সেই চায়ের গ্লাস ছুড়ে ফেলল বুড়িগঙ্গায়। তারপর বলল, 'সর ছাড়া চা বানাই আন।'

হেলাল খুবই অবাক হলো। তবে কথা বলল না। তার বুকের ভেতর যেন অসংখ্য হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছে। সে চা বানিয়ে আনল। ফজলু মিয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'এদিকে আয়।'

'মিয়াভাই!' হেলালের চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে।

'ডরের কিছু নাই। তোর লগে কিছু কথা আছে। কথাগুলা তোর জানা উচিত।'

তারা এসে দাঁড়াল আড়তের শেষ অংশে। জলাধারের প্রান্তে। কাঠের বেদিটার পাশে। ফজলু মিয়া বলল, 'তোর আমার উপর রাগ কেন ?'

হেলাল জবাব দিল না।

ফজলু মিয়া বলল, 'খলিফারে নিয়া ?'

হেলাল এবারও কথা বলল না।

'তুই কি ভাবছিলি তোর বদলে আমি খলিফারে আমার সবকিছু দিয়া যাবো ?'

হেলাল চুপ।

ফজলু মিয়া বলল, 'শোন, আমি খলিফার বাপ মজনুরে খুন করছি ভুলে। ওই পাগলিটার ব্যাপারে আসলেই মজনুর কোনো দোষ আছিলো না। সে পুলিশরে ভয় পাইতো। সেই ভয়েই সে প্রথমবার পালাইছিলো। কারণ সে চুরি চামারি করতো। মদ-গাঞ্জা খাইতো। খারাপ জায়গায় যাইতো। এইজন্য এইহানে কিছু হইলেই পুলিশ ভাবতো মজনু করছে। আর মজনুও কিছু হইলেই ভয়ে পালাইতো। কারণ সে জানতো, সে কিছু করুক আর না করুক, পুলিশ তারেই ধরবো। বাদামতলির ওই ছোট মাইয়াটা, ওইটার বিষয়েও মজনু কিছু জানতো না। কিন্তু আমি ভুল বুইঝা কামডা করছি। বিনা দোষে একটা জান নিয়া নিছি আমি। এই দায় আমি শোধ করমু কেমনে ?'

ফজলু মিয়া একটু থামল। তারপর চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা বুড়িগঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিল সে। তারপর বলল, 'সেই দায় কিছুটা কমানোর লাইগাই আমি খলিফারে এইহানে আনছিলাম। কিন্তু আনার দুই দিনের মাথায় বুঝলাম, সে ডেনজারাস জিনিস। আমার অবর্তমানে যদি কেউ এইসব সামলাইতে পারে, তাইলে সেইটা খলিফাই পারবে। ওরে হাতছাড়া করন যাইবো না। ও এহনো কাদামাটির লাহান। ওরে আমি নিজ হাতে বানাই লইতে চাইছি। কিন্তু এইটাতে তো তোর ক্ষ্যাপার কিছু নাই। তোরে কি আমি কম কিছু দিছি ?'

হেলাল কথা বলল না। ফজলু মিয়া বলল, 'লোভ খুব খারাপ জিনিস রে হেলাল। তবে অযোগ্য মানুষের লোভ খারাপের চাইতেও বেশি খারাপ। তুই মানুষ অযোগ্য। লোভও বেশি। আয় এইদিকে আয়।'

হেলাল গেল। ফজলু মিয়া তাকে জলে টইটম্বুর জলাধারটার একদম গা ঘেঁষে দাঁড় করাল। তারপর বলল, 'তোরে না কইছিলাম ঘরের ইন্দুর বান কাটলে হেই ঘর থাহে

না ? থাহে ?' হেলাল জবাব দিল না। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল ফজলু মিয়া তাকে মাফ করে নি। সে তাকে খুন করবে। হেলাল চিৎকার দিয়ে কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই ফজলু মিয়ার হাতের গামছাটা যেন সাপের মতো তার মাথা গলিয়ে গলায় ছোবল মারল। তারপর ইস্পাতের মতো শক্ত হাতটা চেপে ধরল তার মুখে। হেলাল চেষ্টা করল ছুটতে কিন্তু পারল না। ফজলু মিয়া হেলালের মাথাটা জলাধারের টইটম্বুর পানির তলায় ডুবিয়ে দিল। হেলাল হাত-পা ছুড়ল। মাথা সরাতে চেষ্টা করল। পানিতে কম্পন তৈরি হলো। বুদ্‌বুদ উঠল। কিন্তু অন্ধকারে সেসব কিছুই দেখা গেল না।

তবে পরদিন দেখা গেল হেলালের নিথর শরীরটা জলাধারের ভেতর একটা বিশালাকায় মাছের মতো ভাসছে।

খলিফা জলাধারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে নৌকা সাজানো হয়েছে। নৌকায় মাছ তোলা হয়েছে। মাছের নিচে হেলালের লাশ। লাশটা নিজ হাতে তুলেছে খলিফা। ঠান্ডা কনকনে শরীর। এর আগে কখনো এমন লাশ ছুঁয়ে দেখে নি সে। হেলালের চোখ তখনো খোলা। সেই চোখে যেন রাজ্যের অবিশ্বাস। আতঙ্ক। খলিফার মনে হলো হেলাল তাকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। সে নিজ হাতে হেলালের চোখ বন্ধ করে দিল। তার আর ফজলু মিয়ার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। তারপরও সে ফজলু মিয়ার দিকে তাকাল। ফজলু মিয়ার চোখ লাল। তবে তাকে আশ্চর্য শান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে সে। দীর্ঘ ঘুম। অতিরিক্ত ঘুমের কারণেই তার চোখ টকটকে লাল। চোখে খানিক পানি ছেটালেই ঠিক হয়ে যাবে।

ফজলু মিয়া খলিফার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। স্বাভাবিক, শান্ত, স্নিগ্ধ হাসি। তার গা থেকে ভুরভুর করে আঁতরের গন্ধ আসছে। ইস্ত্রি করা সাদা শার্ট ও লুঙ্গিতে তাকে লাগছে দেবদূতের মতো।

হেলালকে মাটি দেওয়া হয়েছে মাজারের সঙ্গেই। হেলালের জন্য নিজ হাতে কবর খুঁড়েছে ফজলু মিয়া। মোনাজাতের সময় তার চোখের কোল গড়িয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরতে দেখেছে খলিফা। কবরের উপরে শামিয়ানা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই শামিয়ানা সে নিজ হাতে টানিয়েছে। খলিফা পুরো সময়টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মাজারের আশপাশে আরও অনেকগুলো কবর। আচ্ছা, এখানে কোথাও কি তার বাবার কবর রয়েছে ?

নামহীন সেই কবরগুলোর মধ্যে খলিফা মনে মনে তার বাবার কবরটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। সে শুনেছে, তার বাবাকে খুন করার পরপরই ফজলু মিয়া তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। ফলে লাশটা নদীতে ফেলে নি সে। মাটি দিয়েছিল এখানে। কিন্তু খলিফা জানে না, কোন কবরটা তার।



নীতু বলল, 'আপু দুলাভাই এসেছে।'

নদী রাগতে গিয়েও রাগল না। এই কয়েক বছরে সে অনেক বলেছে। কিন্তু লাভ হয় নি। সে বলল, 'গিয়ে বল, আমি বাসায় নেই। রুনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছি।'

'কোন ডাক্তারের কথা বলব ?'

'ডাক্তারের নাম কেন বলতে হবে ?'

'বারে! যদি জিজ্ঞেস করে ?'

'করবে না।'

সজল অবশ্য গেল না। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। নদী এল দীর্ঘ সময় পর। তারপর বলল, 'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার তো কোনো মানে নেই, তাই না ?'

'তা নেই।'

'তাহলে ?'

'তাহলে কী ?'

'তাহলে আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী ?'

'দাঁড়িয়ে থাকার তো কোনো মানে নেই।' সজল মিনমিন করে বলল।

নদীর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। এই বয়সে আর এসব আদিখ্যেতা তার সহ্য হয় না। তা ছাড়া তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে আজ এতগুলো বছর। এরপরও এমন রোজ রোজ বাসায় এলে লোকে কী বলবে! লোকের এই বলা এড়াতেই নদী রোজ বিকেলে রুনিকে নিয়ে বাইরে হাঁটতে বের হয়। সজল দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারে। নদীর চোখে চোখ পড়লেই সুড়ুৎ করে আড়ালে চলে যায়। রুনি অবশ্য মাঝে মাঝে বলে, 'মা, বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে। এটা কি ঠিক ?'

নদী ফিসফিস করে বলে, 'ওদিকে তাকানোর দরকার নেই। এমন ভান করবে যেন আমরা তাকে দেখিই নি।'

'দেখলে কী হবে মা ?'

'তখন কথা বলতে হবে।'

'কেন কথা বলতে হবে ?'

'আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! পরিচিত মানুষের সাথে বাইরে দেখা হলে কথা বলতে হয় না ?'

'তাহলে কথা বলছ না কেন ? বাবা তো আমাদের পরিচিত মানুষই!'

নদী জানে না এই প্রশ্নের উত্তর সে কী দিবে। তবে রুনি হাল ছাড়ে না। সে একই প্রশ্ন বারবার করতেই থাকে। নদী তখন বলে, 'কারণ তোমার বাবাকে আমি পছন্দ করি না।'

'আমি তো পছন্দ করি। আমি তাহলে দেখা করে আসি ?'

নদী কিছু বলার আগেই রুনি ছুটে যাবে। তারপর সজলকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসবে। তারা বসবে ক্রিসেন্ট লেকের লাল ইটের দেয়ালের ওপর। রুনি বলবে, 'বাবা, তুমি ভালো মানুষ হতে পারো না ? যাতে মা তোমাকে পছন্দ করে ?'

'ভালো মানুষ কী করে হব ?'

'মা বানিয়ে দিবে।' বলেই মায়ের দিকে তাকাবে সে। তারপর বলবে, 'মা, তুমি একটু বাবাকে ভালো মানুষ বানিয়ে দাও তো!'

বলেই সে মায়ের হাতের ভেতর বাবার হাতখানা রাখবে। সেই হাত তারা কেউই ছাড়াতে পারবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের দুজনের হাতে হাত রেখে বসে থাকতে হবে। এই সময়ে নদীর খুব লজ্জা লজ্জা লাগে। সে সজলের চোখের দিকে তাকায় না। এদিক সেদিক তাকিয়ে থাকে। নিজেকে তার কিশোরী মেয়েদের মতো মনে হয়। সজলের হাতখানা তার হাতের ভেতর নিথর পড়ে থাকে। যেন প্রবল ভীরুতায়, সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে আছে সেই হাত। নদীর নিজের অজান্তেই রাগ হতে থাকে। সজল কেন তার হাতটা শক্ত করে ধরে না! কিন্তু এই কথা সে সজলকে কী করে বলবে ? মরে গেলেও বলতে পারবে না।

জগতে সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে প্রগাঢ় অনুভূতির কথাই হয়তো কখনো মুখ ফুটে বলা হয় না। ওটা অনুভব করে নিতে হয়। নদীর ধারণা, সজল তা কোনোদিনও পারবে না। আর পারবে না বলেই, সে কেবল তাকে ছুঁয়ে থাকতেই পারবে। শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না কখনো। অথচ মানুষ চায়, তাকে কেউ শক্ত করে ধরে রাখুক। ধরে রাখুক জনম জনম।



নীতুর চাকরি হয়েছে বান্দরবানে। স্কুলে পড়ানোর চাকরি। বাচ্চাদের স্কুল। সে শুনেছে পাহাড়ের ওপর ছবির মতো ছোট্ট এক গ্রাম। সেই গ্রামের এক প্রান্তে ছবির চেয়েও সুন্দর এক স্কুল। সেখানে তার জন্য থাকার ভালো ব্যবস্থাও আছে। শায়লা বেগম শুনে বললেন, 'অতদূর গিয়ে একা একা থাকতে পারবি ?'

নীতু হেসে বলেছিল, 'অভ্যাস করতে হবে না ?'

'কিসের অভ্যাস ?'

'একা থাকার অভ্যাস।'

ওইটুকু কথাতেই কেমন বুক কেঁপে ওঠে শায়লা বেগমের। আর কিছু বলেন না তিনি। যে যেভাবে ভালো থাকতে চায় থাকুক। নদীও অবশ্য কিছু বলে নি। সেও চায় নীতু নীতুর মতোই থাকুক। যেমন তার খুশি।

তবে অন্তটা খুব জ্বালাল। সে সেদিন সোজা বাড়ি চলে এল, 'তুই নাকি বান্দরবান চলে যাচ্ছিস ?'

'হুম।'

'কেন ?'

'ওখানে চাকরি নিয়েছি যে!'

'তাহলে আকিবের কী হবে ?'

'আকিবের আবার কী হলো ?'

'তুই নাকি ওকে বিয়ে করছিস ?'

'তাই নাকি ?'

অন্ত দ্বিধান্বিত গলায় বলল, 'তাই তো শুনলাম!'

নীতু বলল, 'কী জানি! আমি তো শুনি নি।'

'তোদের দুই ফ্যামিলিতে নাকি কথাও হয়েছে ?'

'আমি জানি না!' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল নীতু। 'আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি!'

'তোর মাও না ?'

'নাহ।'

'বললে কী করতি ?'

'এখন যা করছি।'

'তারপরও বান্দরবান চলে যেতি ?'

'হুম।'

'কেন ?'

'এমনি।'

'তুই আমাকে সত্যি সত্যি বলবি, তোর কী হয়েছে ?'

'কী হবে ?'

'কিছু একটা তো হয়েছেই! এতদিন ভাবতাম একদিন না একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর কখনোই কিছু ঠিক হবে না। কী হয়েছে তোর, বলবি আমায় ? প্লিজ ?'

'সব কি বলা যায় ?'

'যায় না ?'

'উঁহু।'

'কেন ? '

'কারণ, কিছু কিছু গল্প কেবল মানুষের একার, নিজের। কিছু কিছু অনুভবও। ওই অনুভব কখনো কাউকে বলতে নেই। কেননা কেউ কারোটা কখনো বুঝবে না। কখনোই না।'

অন্তু আর কথা খুঁজে পায় না। অনেক ভেবে সে সেদিন সন্ধ্যার প্রসঙ্গ তোলে, 'তুই খুব রেগে আছিস না ?'

'কেন ?'

'সেদিন কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না করলাম! অনেক রেগে আছিস ?'

'নাহ! রেগে থাকব কেন ?'

'আমি যে তোকে মারলাম ? কী সব বাজে বাজে কথা বললাম ?'

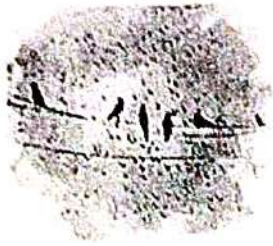
'তাতে কী ?'

'খুব গিল্টি ফিল হচ্ছে।'

'খুব ?'

'হুম।'

নীতু হাসল। ম্লান হাসি। তারপর বলল, 'অন্য কোনোদিন তাহলে ভালো কিছু বলে শোধ করে দিস। আর অন্য কারও সাথে এমন গিল্টি হওয়ার মতো কিছু কখনো করিস না।'



হেলালের ঘটনার পর চুপচাপ হয়ে গেছে ফজলু মিয়া। খলিফাও। দুজনের মধ্যে আর তেমন কথাবার্তা হয় নি। দেখাসাক্ষাৎও না। ফজলু মিয়ার শরীরটা অবশ্য একটু খারাপ। হয়তো এ কারণেই সারাক্ষণ একা একাই থাকে সে। তবে আজ বহুদিন পর খানিক ভালো লাগছে তার। গভীর রাতে সে হঠাৎ খলিফাকে ডাকল। ফজলু মিয়া বলল, 'আমার উপর তোর অনেক রাগ ?'

খলিফা জবাব দিল না। ফজলু মিয়া বলল, 'সুযোগ পাইলে আমারে খুন করতে পারবি ?'

খলিফা এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। ফজলু মিয়া খলিফার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার বিছনার নিচে তিনখান রাম দাও আছে। যা ওইহান থেইকা একখান নিয়া আয়।'

খলিফা গেল না। ফজলু মিয়া বলল, 'তোর চোখের ভাবভঙ্গি ভালো না। চোখভর্তি খুনের নেশা। এই নেশা একবার চাপলে ঘটনা ঘটানোর আগ পর্যন্ত সেই নেশা কাটে না। যা দাও লইয়ায়।'

খলিফা গেল না। ফজলু মিয়া নিজে গিয়ে দা নিয়ে এল। তারপর দা-খানা খলিফার হাতে দিয়ে বলল,'আয়, এই দিকে আয়।'

খলিফার হাত কাঁপছে। তবে তার মাথার পেছন থেকে ঘাড় অবধি শক্ত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে জায়গাটা উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি। সে ফজলু মিয়ার পেছন পেছন গেল। কাঠের সেই বেদিটার ঠিক কাছে। সেখানে সাদা পলিথিনে ঢাকা দীর্ঘাকায় এক দেহ। দেখে মনে হচ্ছে, লম্বালম্বি একটা মানুষ শুয়ে আছে। ফজলু মিয়া খলিফার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'নে, কোপ দে।'

খলিফা নড়ল না। ফজলু মিয়া বলল, 'দে।'

খলিফা তাও নড়ল না। ফজলু মিয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। খলিফা দা-খানা তুলল। সে পলিথিনের নিচে জিনিসটা দেখেতে পেয়েছে। বিশাল একটা মাছ। ওজন কত হবে কে জানে! সে এক কোপে মাছটার মাথা আলাদা করে ফেলল। ফজলু মিয়া বিস্মিত চোখে খলিফার দিকে তাকিয়ে আছে। খলিফাও তাকাল। তার মুখে সামান্য হাসি। তবে সেই হাসি ফজলু মিয়ার চোখ এড়াল না।

খলিফা দ্বিতীয়বারের মতো দা-খানা তুলল। ফজলু মিয়া অবাক চোখে তাকাল। খলিফা বলল, 'আমার আব্বার কবর কোনটা ?'

ফজলু মিয়া হাসল, 'মরণের পর সবার কবরই এক। সাড়ে তিন হাত সাইজ। কবরের আর আলাদা কিছু নাই।'

খলিফা তার হাতের দা-খানা নামিয়ে আনল ফজলু মিয়ার গলা বরাবর। যেন তার মাথাটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু খলিফার কেন যেন মনে হলো, সে দায়ের আগায় ফজলু মিয়ার গলার স্পর্শ পায় নি। যেন হাওয়ায় কোপ মেরেছে সে। ভালো করে তাকাল খলিফা। মেঝেতে খানিক আগের কাটা মাছের মাথাটা পড়ে আছে। ফজলু মিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিংবা দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে ঠাহর করতে পারছে না। কিংবা হঠাৎ তার বিভ্রম হতে লাগল। ইল্যুশন।

মনে হলো, ফজলু মিয়া সাদা লুঙ্গি আর জামা পরে বড় বড় পা ফেলে নদীর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আর কয়েক কদম পেরুলেই সে নদীর ওপারে চলে যাবে। সেখানে জটাপাগলার মাজার। সে কি জটাপাগলার কাছে যাচ্ছে ? তার কি খুব ঘুম পেয়েছে ? কত দিন ঘুমায় না ফজলু মিয়া ?

খলিফার মনে হলো তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে বাস্তব, স্বপ্ন, কল্পনা, সত্যি, বিভ্রম কোনোকিছুই আর আলাদা করতে পারছে না। সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্রবল ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে সেই ঘুম ঘুম চোখে তার বাবা মজনু মিয়াকে দেখতে পাচ্ছে। মজনু মিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে শুয়ে আছে ফজলু মিয়ার ভাঁজ করা দুই হাতের ওপর। ফজলু মিয়া বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার পরনের শুভ্র পোশাক হাওয়ায় উড়ছে। বিশাল হাত দুখানা কোমরের দুই পাশে ভাঁজ করা। সেই হাতে আড়াআড়ি শুয়ে আছে মজনু। মজনুর রক্তে ভিজে যাচ্ছে ফজলু মিয়ার সাদা জামা। সাদা লুঙ্গি। সে আরও দ্রুত হাঁটছে। আরও দ্রুত। তার পায়ের আঘাতে পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ফজলু মিয়া হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর তলিয়ে যেতে লাগল জলের অতলে। তলাতেই থাকল।

খলিফার মনে হলো, ফজলু মিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তলিয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ছুটে আসছে। তারা ঘিরে ধরেছে ফজলু মিয়াকে। ফজলু মিয়া হাত নেড়ে সেই মাছ তাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। মাছগুলো বড় বড় হা করে তাকে গিলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দৃশ্যটা দেখে ফজলু মিয়া হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে কম্পন তৈরি হচ্ছে। সেই কম্পনে জেগে উঠছে জল। জলের তরঙ্গ। খলিফার ধারণা এই জলতরঙ্গে উছলে পড়বে নদী। ভেসে যাবে জীবন ও মৃত্যু।

ফজলু মিয়ার লাশ পড়ে আছে ময়লার ভাগাড়ে। তার বুকের কাছে দুটো ক্ষতচিহ্ন। গুলির দাগ। পুলিশের ক্রসফায়ারে মারা গেছে সে। পুলিশ তার লাশের চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। তারপরও মানুষ সামলানো যাচ্ছে না। অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আছে তার লাশ ঘিরে। তারা কাঁদছে। তবে তাদের সেই কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এই কান্না নিঃশব্দ। কেবল কান পেতে এই কান্নার শব্দ শোনা যায় না। এই কান্নার

শুধু শুনতে হলে বুক পেতে শুনতে হয়। কিন্তু এখানে সবাই ব্যস্ত। কারোই বুক পেতে আহত অনুভব শোনার সময় নেই।

অসংখ্য সাংবাদিক জড়ো হয়েছে। তারা ফজলু মিয়ার লাশের সঙ্গে ছবি তুলছে। পুলিশ সদস্যরা তাদের বাধা দিতে এসে সুযোগ বুঝে নিজেরাও একটা ছবি তুলে নিচ্ছে। এমপি সাহেবের লোকজন উল্লাস করছে। মিষ্টি বিতরণ করছে। তাদের মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাব। সেই উৎসব ভাবের মধ্যেই আকাশে মেঘ করেছে। সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে খলিফা। তার মাথার ওপর আকাশ। আকাশের ওপারে আকাশ। তার ওপারে কী খলিফা জানে না! সে কেবল জানে, তার খুব কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশ ভেঙে প্রবল বৃষ্টি।

সেই বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার স্পর্শ পেতেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল খলিফা। এই জীবনে এমন করে আর কখনো কাঁদে নি সে। তবে তার সেই অশ্রুকে বৃষ্টিধারা থেকে আলাদা করা গেল না। তার সেই কান্নার শব্দও আর আলাদা করা গেল না বৃষ্টির শব্দ থেকে।

মানুষ এমনই, সে তার বুকে পোষা অসংখ্য অনুভব এই জীবনে কখনোই আলাদা করতে পারে না।



নীতু ক্লাস শেষ করে বেরিয়েই থমকে গেল। স্কুলের বারান্দায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার মুখভর্তি দাড়ি। গলা পর্যন্ত ঢাকা সোয়েটার। অনেক শীত পড়েছে এবার। খানিক কুয়াশাও যেন চারদিকে। স্কুলের পিয়ন লোকটা বলল, 'আপনার গেস্ট আসছে আপা।'

নীতু এগিয়ে গেল। তার দীর্ঘসময় লাগল অন্তকে চিনতে। মাত্র এক বছরেই কেমন বদলে গেছে সে। বড় বড় লাগছে তাকে। অন্ত বলল, 'তোর এই স্কুল খুঁজে পেতে আমার জান বেরিয়ে গেছে। প্রায় একই নামের অন্য একটা জায়গায় চলে গিয়েছিলাম আমি!'

নীতু হাসল, 'কেমন আছিস তুই ?'

'ভালো। বড় হয়ে গেছি, না ?'

'একদম।'

'তুই ?'

'আমি...?' বলে যেন খানিক ভাবল নীতু। তারপর বলল, 'যেমন থাকার কথা ছিল।'

'কেমন ?'

'মনে হয় ভালো।' আবারও হাসল নীতু। মৃদু হাসি। তার পরনে আকাশি নীল রঙের শাড়ি। গায়ে কালো চাদর। তাকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। নীতু এমনিতেই সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্যটা এখন যেন বদলে যাচ্ছে। খানিক মায়েদের মতো হয়ে যাচ্ছে সে। সেই ছটফটে, চঞ্চল, ডাকাবুকো নীতুটা আর নেই। কোথায়, কোন ফাঁকে যে হারিয়ে গেল সে, তারপর আর ফিরে এল না। কিন্তু এমন মা মা ব্যাপারটাও তো আগে কখনো ছিল না তার মধ্যে! কথাটা ভাবতেই ম্লান হাসল অন্ত। নীতু বলল, 'হাসছিস যে ?'

'তোকে কেমন মা মা লাগছে।'

'তাই ?'

'হুম।'

নীতু কথা বলল না। তবে হঠাৎই যেন খানিক ম্লান হয়ে গেল সে।

তখনো সন্ধ্যা নামে নি। পাহাড়ের প্রান্তজুড়ে মেঘ। কিংবা কুয়াশা। কিংবা আকাশ। এখানে মেঘ, কুয়াশা আর আকাশকে যেন আলাদা করা যায় না। পাহাড়ের ওপর নিজের এই ছোট্ট থাকার জায়গাটা খুব পছন্দ নীতুর। সামনের এই খোলা জায়গাটাও। একটা

নাম-না-জানা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা। তার নিচে ছোট্ট বসার জায়গা। সেখানে রোজ সন্ধ্যাবেলা নীতু একা বসে থাকে। তারপর একা একা কথা বলে। মেঘের সঙ্গে। জলের সঙ্গে। ঘাসের সঙ্গে। আর না-দেখা এক শিশুর সঙ্গেও। সেই শিশুটা আজকাল তাকে মা বলে ডাকে। নীতু তাই এই সময়টুকুর অপেক্ষায় থাকে খুব। আজও ছিল। বিকেলের দিকে অন্তু কোথায় যেন বেরিয়েছে। এই অবসরে নীতু চুপচাপ এসে বসেছে। তার চারপাশ ঘিরে নীলচে শুভ্র কুয়াশা। শিশুটি যেন বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ অস্ফুটে ডাকল, 'মা ?'

'হ।'

'তোমার মন খারাপ ?'

'হ।'

'কেন মন খারাপ ?'

'জানি না।'

'আমি তোমার মন ভালো করে দিব ?'

'হ।'

'এই যে দেখো মেঘ, এই যে কুয়াশা, তোমাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে—এগুলো সব আমি। তোমার কি মন ভালো হচ্ছে মা ?'

নীতু কথা বলল না। সে জানে এসবই তার কল্পনা। তারপরও তার এমন করে ভাবতে, কথা বলতে ভালো লাগে। রোজ যখন সন্ধ্যা নামে, যখন তার আশপাশে কোথাও কেউ থাকে না, তখন এখানে এই অন্ধকারে একা একা চুপিচুপি ওই অদৃশ্য, অস্তিত্বহীন গোপন মানুষটির সঙ্গে তার কথা বলতে ভালো লাগে। শিশুটি বলল, 'তুমি এমন মন খারাপ করে থেকো না মা।'

নীতু কথা বলল না। তার কাঁধে কেউ হাত রেখেছে। সে ফিরে তাকাল। অন্তু দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'তুই একা একা কার সাথে কথা বলছিস ?'

নীতু হাসার চেষ্টা করল, 'কারও সাথে না।'

অন্তু ঘুরে এসে নীতুর সামনে বসল। তারপর বলল, 'আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি নীতু।'

'কোথায় ?'

'ঢাকায়।'

'কেন ?'

'কেন আবার ? এভাবে জীবন চলে ?'

নীতু কথা বলল না। অন্তু দুহাতে তার মুখ তুলে বলল, 'কী হয়েছে তোর ? আমাকে বল। প্লিজ নীতু। আমি আর পারছি না।'

নীতু অকস্মাৎ কেঁদে ফেলল। তার চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়তে লাগল অন্তর হাতে। অন্ত বলল, 'তুই একা একা কার সাথে কথা বলছিলি আমি জানি। আমি সব শুনেছি।'

নীতু কথা বলল না। অন্ত বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। সব। আমি তোকে কথা দিচ্ছি। সত্যি সত্যি অমন কারও সাথেই কথা বলবি তুই। ঢাকায় ফিরেই আমরা বিয়ে করব।'

নীতু চুপ করেই রইল। অন্ত আরও বার কয়েক নানাভাবে নীতুকে বোঝাল। কতকিছু বলল। কত কত গল্প। কত কত স্বপ্ন। কত কত সম্ভাবনা। কিন্তু সেসব কিছুই যেন ছুঁয়ে গেল না নীতুকে। সে কেবল উঠে দাঁড়াতে চাইল। অন্ত শক্ত করে ধরে রইল তাকে। তারপর বলল, 'বিশ্বাস কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব।'

নীতু হঠাৎ বলল, 'আর কখনোই কিছু ঠিক হবে না অন্ত।'

'কেন ?' অন্তর যেন জেদ চেপে গেছে। সে নীতুকে দুই হাতে চেপে ধরে বলল, 'কেন ঠিক হবে না ?'

নীতু দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমি আর কখনো মা হতে পারব না, অন্ত!'

অন্ত ঝট করে উঠে দাঁড়াল, 'কী বলছিস তুই ?' অন্ত কাঁপছে। তার চোখ মুখ বিস্ফারিত।

'হু।' নীতুও উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রায় ঘোরগ্রস্তের মতন বলল, 'আমি একটা মৃত মানুষ অন্ত। এই যে আমাকে দেখছিস, এই যে আমি বেঁচে আছি, এর পুরোটাই মিথ্যা। আমার কী মনে হয় জানিস ? আমার মনে হয়, আমি একটুকরো তুলো। শুধু ভেসে যাচ্ছি আর ভেসে যাচ্ছি। কোথাও এতটুকু মাটি নেই যেখানে আমি দুদণ্ড দাঁড়াতে পারি।'

অন্ত জড়ানো গলায় বলল, 'কী হয়েছে, আমাকে বল। প্লিজ। প্লিজ।' সে দুহাতে নীতুর কাঁধ খামচে ধরল। নীতু ভেজা, নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, 'সেবার অ্যাবরশনের সময় হঠাৎ করেই খুব কমপ্লিকেশন তৈরি হলো। তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হলো আমাকে। আর তারপর...।'

বলে থামল নীতু। বার দুই ঢোক গিলল যেন। তার চোখে আতঙ্ক। ফ্যাকাশে, শুকনো মুখখানা কাঁপছে। সে নিজেকে খানিক ধাতস্থ করে বলল, 'তারপর... তারপর আমার ইউটেরাসটা ফেলে দিতে হলো। আমার জরায়ুটা কেটে ফেলতে হলো অন্ত। আমি আর কখনো মা হতে পারব না অন্ত। কখনো না, কোনোদিন না।'

নীতু কাঁদছে। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। তার সেই কান্নার জলে ভিজে যাচ্ছে অন্তও। এই এতটা বছর, এই এতটা দিন এই ভয়ংকর সত্যটা কী করে আড়াল করে রেখেছিল নীতু ? কী অন্তহীন দুঃখ সে লুকিয়ে রেখেছিল বুকে! একা। সঙ্গোপনে। অন্ত আর ভাবতে পারছিল না কিছুই।

নীতু ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর হেঁটে যেতে থাকল দূরে। আরও দূরে। যেন ক্রমশই মেঘ আর কুয়াশার ভেতর মিলিয়ে যেতে থাকল সে। অন্তু তাকিয়ে আছে। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে নীতুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু অন্তুর কেন যেন মনে হলো, এই জীবনে নীতুকে আর কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না সে। দূরে তখন ডুবে যাচ্ছে সূর্য। নেমে আসছে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার সেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে নীতুও।

একটুকরো মেঘ, খানিক কুয়াশা, খানিক নরম হাওয়া কোথা থেকে উড়ে এসে জড়িয়ে ধরল নীতুকে। নীতুর হঠাৎ মনে হলো, তার বুকের ভেতর থেকে কেউ ফিসফিস করে বলছে, তোমার এত দুঃখ কেন ? এই যে আমি তোমায় জড়িয়ে রাখছি। এই যে মেঘের মতো, কুয়াশার মতো। আকাশ আর অনুভবের মতো। তুমি আমায় জড়িয়ে রাখবে না মা ?

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সব। সেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে নীতুও। ক্রমশই লীন হয়ে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে।

সেই অন্ধকার থেকে অন্তু আর তাকে আলাদা করতে পারল না। তবু ছুটল সে। জীবনের যতটুকু আলো তার, যতটুকু অন্ধকার, তার সব নীতুর ওই অন্ধকারেই না-হয় সমর্পিত হোক। নীতু অন্তত জানুক, ওই অন্তহীন অন্ধকারেও সে একা নয়...

—